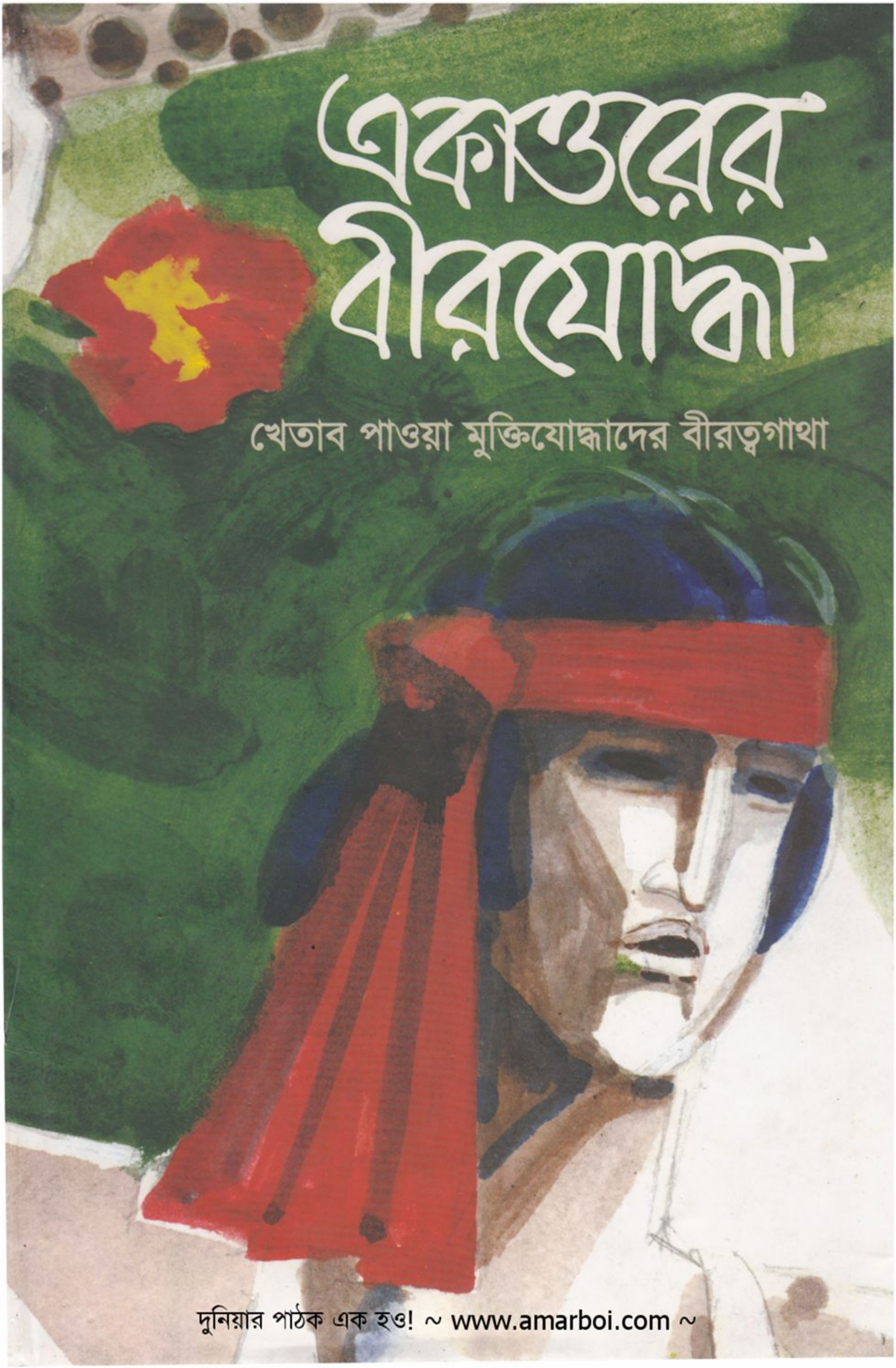

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তির লড়াইয়ে আমাদের বিজয়ের পেছনে ছিল সম্মুখযুদ্ধে বহু মুক্তিযোদ্ধার সাহসিকতাপূর্ণ অংশগ্রহণ। তাই রাষ্ট্রও সেই সোনার সন্তানদের বরণ করে নিয়েছিল বীরত্বসূচক খেতাব দিয়ে। কিন্তু যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ছাড়া এ দেশ কখনো স্বাধীন হতো না, তাঁদের অনেকেই এখনো রয়ে গেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাঁদের অনেকেরই পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত, বীরত্বগাথা অজানা। খেতাব পাওয়া সেই মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বিস্মৃতির গহ্বর থেকে বের করে এনে ভবিষ্যতে সংরক্ষণের বিনীত প্রচেষ্টা হিসেবে প্রকাশিত হলো এই সংকলন। এই খণ্ডে তুলে ধরা হয়েছে খেতাব পাওয়া ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাথা। বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ বই আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবে, ইতিহাসের চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর উপাদানের সন্ধান দেবে আর পাঠকের মধ্যে সঞ্চার করবে মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোর উদ্দীপনা।

প্রথম আলো HSBC

ISBN 978 984 33 3888 4

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ নামের এই রাষ্ট্র। মুক্তির লড়াইয়ে আমাদের বিজয়ের পেছনে ছিল সম্মুখযুদ্ধে বহু মুক্তিযোদ্ধার সাহসিকতাপূর্ণ অংশগ্রহণ। তাই রাষ্ট্রও সেই সোনার সন্তানদের বরণ করে নিয়েছিল বীরত্বসূচক খেতাব দিয়ে। চার স্তরের সেই খেতাবের শীর্ষে রয়েছে 'বীরশ্রেষ্ঠ'। এরপর যথাক্রমে 'বীর উত্তম', 'বীর বিক্রম' ও 'বীর প্রতীক'। যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ছাড়া এ দেশ কখনো স্বাধীন হতো না, তাঁদের অনেকেই এখনো রয়ে গেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাঁদের অনেকেরই পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত, বীরত্বগাথা অজানা। স্বাধীনতার ৪০ বছর উপলক্ষে নিবিড় যত্নে তাঁদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে *প্রথম আলো* তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকে। খেতাব পাওয়া সেই মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বিস্মৃতির গহ্বর থেকে বের করে এনে ভবিষ্যতে সংরক্ষণের বিনীত প্রচেষ্টা হিসেবে প্রকাশিত হলো 'একাত্তরের বীরযোদ্ধা : খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা' প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে তুলে ধরা হয়েছে খেতাব পাওয়া ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাথা। বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ বই আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবে, ইতিহাসের চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর উপাদানের সন্ধান দেবে আর পাঠকের মধ্যে সঞ্চার করবে মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোর উদ্দীপনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিউর রহমান

জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯৪৬।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর। সাপ্তাহিক *একতার* ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক (১৯৭০-১৯৭৩) ও সম্পাদক (১৯৭৪-১৯৯১) ছিলেন। পরে দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৯৯২-১৯৯৮)। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর থেকে *প্রথম আলোর* সম্পাদক।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *কার রাজনীতি কীসের রাজনীতি, ইতিহাসের সত্য সন্ধানে: বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি*।
ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে 'সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সৃজনশীল যোগাযোগ'-এ ২০০৫ সালে পেয়েছেন র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার।

রাশেদুর রহমান

জন্ম ১৯৫৮, বগুড়ায়।
পৈতৃক নিবাস বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার চককাতুলী গ্রামে।
পড়াশোনা বগুড়া ও ঢাকায়।
পেশা: মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণা ও সাংবাদিকতা। বর্তমানে *প্রথম আলোয়* কর্মরত।
যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন *রাজশাহী ১৯৭১: অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*।

প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্তরের বীরযোদ্ধা

খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা

প্রথম আলো HSBC
উদ্যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্তরের বীরযোদ্ধা

খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

মতিউর রহমান

সংগ্রহ ও গ্রন্থনা

রাশেদুর রহমান

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

বীর উত্তম

আনোয়ার হোসেন ১৫
আফজাল মিয়া ১৬
আফতাবুল কাদের ১৭
আবদুল মান্নান ১৯
আবদুস সাত্তার ২০
এ টি এম হায়দার ২১
এরশাদ আলী ২২
এস এম ইমদাদুল হক ২৩
খাজা নিজামউদ্দীন ভূঁইয়া ২৪
নূরুল হক ২৫
ফজলুর রহমান খন্দকার ২৬
ফয়েজ আহমদ ২৭
বদরুল আলম ২৮
বদিউল আলম ২৯
মঈনুল হোসেন ৩১
মজিবুর রহমান ৩২
মতিউর রহমান ৩৩
মো. জালাল উদ্দীন ৩৪
মো. শাহ আলম ৩৫
মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন ৩৭
শফিকউদ্দিন চৌধুরী ৩৮
শরফুদ্দীন আহমেদ ৩৯
শামসুজ্জামান ৪০
শাহে আলম ৪১
সাফিল মিয়া ৪২
সালাহ্‌উদ্দীন মমতাজ ৪৩
সাহাবউদ্দিন আহমেদ ৪৪
সিরাজুল মওলা ৪৬
হাবিবুর রহমান ৪৭

বীর বিক্রম

আজিজুল হক ৫১
আতাহার আলী মল্লিক ৫২
আবদুর রউফ ৫৩
আবদুর রকিব মিয়া ৫৪
আবদুর রহমান চৌধুরী ৫৫
আবদুর রহিম ৫৬
আবদুল আজিজ ৫৭
আবদুল ওহাব ৫৭
আবদুল খালেক ৫৯
আবদুল বারিক ৬০
আবদুল মজিদ ৬১
আবদুল মালেক ৬২
আবদুল মালেক চৌধুরী ৬৩
আবদুল মোতালেব ৬৪
আবদুল হক ভূঁইয়া ৬৫
আবদুল হাকিম ৬৬
আবদুল হালিম চৌধুরী ৬৭
আবদুস সবুর খান ৬৮
আবদুস সালাম ৬৯
আবদুস সালাম ৭০
আবু ইউসুফ ৭০
আবুল কালাম আজাদ ৭১
আবুল কালাম আজাদ ৭৩
আবুল খায়ের ৭৪
আবুল বাশার ৭৫
আমানউল্লাহ কবির ৭৬
আরব আলী ৭৭
আলতাফ হোসেন ৭৮
ইউ কে চিং মারমা ৭৯
ইয়ামিন চৌধুরী ৮০
এম এ মান্নান ৮১
এয়ার আহমদ ৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাহী বক্স পাটোয়ারী ৮৩
এস আই এম নূরুন্নবী খান ৮৪
ওয়ালী উল্লাহ ৮৫
খন্দকার আজিজুল ইসলাম ৮৬
খন্দকার নাজমুল হুদা ৮৭
খবিরুজ্জামান ৮৮
খালেদ সাইফুদ্দীন আহমেদ ৮৯
খিজির আলী ৯০
গোলাম মোস্তফা ৯১
গোলাম রসুল ৯২
জগৎজ্যোতি দাস ৯৩
জিল্লুর রহমান ৯৪
তমিজউদ্দীন প্রামাণিক ৯৫
তরিকউল্লাহ ৯৬
তারা উদ্দিন ৯৭
তাহের আলী ৯৮
তৌহিদউল্লাহ ৯৯
দেলোয়ার হোসেন ১০০
নীলমণি বিশ্বাস ১০১
নূরুজ্জামান ১০২
নূরুল ইসলাম ১০৩
নূরুল ইসলাম ১০৪
নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া ১০৫
নূরুল ইসলাম শিকদার ১০৬
ভুলু মিয়া ১০৭
মজিবুর রহমান ১০৮
মতিউর রহমান ১০৯
মনিরুজ্জামান খান ১১০
মহসীন উদ্দীন আহমেদ ১১১
মেজবাহউদ্দীন আহমেদ ১১২
মো. আবদুল মান্নান ১১৩
মো. আবদুল হক ১১৪
মো. আবুল হাসেম ১১৫
মো. আমানউল্লাহ ১১৬
মো. জামালউদ্দীন ১১৭
মো. শাহজাহান ১১৮
মো. হায়দার আলী ১১৯
মোতাসিম বিল্লাহ ১২০
মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান ১২১
মোহাম্মদ ইব্রাহিম ১২২
রমজান আলী ১২৩
রমিজ উদ্দীন ১২৪
রুহুল আমিন ১২৫
শাহ আলী আকন্দ ১২৬
শাহজাহান সিদ্দিকী ১২৭
শিকদার আফজাল হোসেন ১২৮
সহিদউল্লাহ ভূঁইয়া ১২৯
সাফায়াত জামিল ১৩০
সিরাজুল ইসলাম ১৩১
সিরাজুল হক ১৩২
সুলতান আহমেদ ১৩৩
সৈয়দ আমীরুজ্জামান ১৩৪
হাবিবুর রহমান ১৩৫

বীর প্রতীক

অলিক কুমারগুপ্ত ১৩৯
আখতার আহমেদ ১৪০
আজিজুল হক ১৪১
আনিসুল হক আকন্দ ১৪১
আবদুর রউফ মজুমদার ১৪২
আবদুর রহমান ১৪৩
আবদুর রাজ্জাক ১৪৪
আবদুল আউয়াল ১৪৫
আবদুল ওয়াহিদ ১৪৬
আবদুল ওহাব ১৪৭
আবদুল খালেক ১৪৮
আবদুল গফুর ১৪৯
আবদুল গফুর ১৫০
আবদুল জব্বার খান ১৫১
আবদুল জব্বার মিস্ত্রি ১৫২
আবদুল জলিল ১৫৩
আবদুল জলিল শিকদার ১৫৫
আবদুল নূর ১৫৬
আবদুল বাসেত ১৫৭
আবদুল মজিদ ১৫৮
আবদুল মান্নান ১৫৯
আবদুল মালেক ১৬০
আবদুল হক ১৬১
আবদুল হাই ১৬২
আবদুল হাই সরকার ১৬৩
আবদুল হালিম ১৬৪
আবদুল্লাহ-আল-মাহমুদ ১৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সোবহান	১৬৬	জাকির হোসেন	২০৭
আবুল কালাম	১৬৭	জালাল আহম্মেদ	২০৮
আবুল কালাম	১৬৮	তোফায়েল আহমেদ	২০৯
আবুল বশর	১৬৯	দেলোয়ার হোসেন	২১০
আবুল হাসেম	১৭০	নজরুল ইসলাম	২১১
আবুল হোসেন	১৭১	নজরুল হক	২১২
আবুল হোসেন	১৭২	নান্নু মিয়া	২১২
আয়েজউদ্দিন আহমদ	১৭৩	নুরুল হুদা	২১৩
আলমগীর করিম	১৭৪	নূর মোহাম্মদ	২১৪
আলী আকবর মিজি	১৭৬	নূর হামিম রিজভী	২১৫
আলী আহমেদ খান	১৭৬	নূরুল আজিম চৌধুরী	২১৬
আলী নেওয়াজ	১৭৭	নূরুল ইসলাম খান পাঠান	২১৭
আলী হোসেন	১৭৮	নূরুল হক	২১৮
আশরাফ আলী খান	১৭৯	ফখরুদ্দীন চৌধুরী	২১৯
ইনামুল হক চৌধুরী	১৮০	ফয়েজুর রহমান	২২০
এ এম মো. ইসহাক	১৮১	ফারুক-ই-আজম	২২১
এ কে এম ইসহাক	১৮২	ফারুক লস্কর	২২২
এ কে এম জয়নুল আবেদীন খান	১৮৩	ফোরকান উদ্দিন	২২৩
এ কে এম রফিকুল হক	১৮৪	বজলুল মাহমুদ	২২৪
এ টি এম খালেদ	১৮৫	বদিউজ্জামান টুনু	২২৫
এম এ হালিম	১৮৬	বশির আহমেদ	২২৬
এম মিজানুর রহমান	১৮৭	বাদশা মিয়া	২২৭
এস এম নুরুল হক	১৮৮	বাহার উদ্দিন	২২৮
ওয়াকার হাসান	১৮৯	মকবুল আলী	২২৯
ওয়াজিউল্লাহ	১৯০	মকবুল হোসেন	২৩০
ওয়াজেদ আলী মিয়া	১৯১	মঞ্জুর আহমেদ	২৩১
কাজী জয়নুল আবেদীন	১৯২	মতিউর রহমান	২৩৩
কে এস এ মহিউদ্দিন মানিক	১৯৩	মতিউর রহমান	২৩৩
খন্দকার সাইদুর রহমান	১৯৪	মতিউর রহমান	২৩৪
খলিলুর রহমান	১৯৫	মনির আহমেদ	২৩৫
খসরু মিয়া	১৯৬	মফিজুর রহমান	২৩৬
খায়রুল জাহান	১৯৬	মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী	২৩৭
খোরশেদ আলম	১৯৭	মহসীন আলী সরদার	২৩৮
খোরশেদ আলম তালুকদার	১৯৮	মাসুদুর রহমান	২৩৯
গাজী আবদুল ওয়াহেদ	১৯৯	মাহতাব আলী সরকার	২৪০
গাজী আবদুস সালাম ভূঁইয়া	২০০	মাহাবুব এলাহী রঞ্জু	২৪১
গাজী রহমতউল্লাহ	২০১	মিজানুর রহমান খান	২৪২
গোলাম আজাদ	২০২	মুনসুরুল আলম দুলাল	২৪৩
গোলাম মোস্তফা	২০৩	মো. আজাদ আলী	২৪৩
জহিরুল হক খান	২০৪	মো. আতাউর রহমান	২৪৪
জহুরুল হক মুন্সী	২০৬	মো. আনোয়ার হোসেন	২৪৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল গনি ২৪৬
মো. আবদুল মজিদ ২৪৭
মো. আবদুল হাকিম ২৪৮
মো. আবদুল্লাহিল বাকী ২৪৯
মো. আবু সালেক ২৪৯
মো. আমিন উল্লাহ ২৫০
মো. আমীর হোসেন ২৫১
মো. ইদ্রিস ২৫২
মো. ইদ্রিস আলী ২৫৩
মো. ইদ্রিস মিয়া ২৫৪
মো. ইয়াকুব আলী ২৫৫
মো. ইসহাক ২৫৬
মো. এনায়েত হোসেন ২৫৭
মো. গোলাম ইয়াকুব ২৫৮
মো. নজরুল ইসলাম ২৫৯
মো. নূর ইসলাম ২৬০
মো. নোয়াব মিয়া ২৬১
মো. বজলুল গনি পাটোয়ারী ২৬২
মো. মোস্তফা কামাল ২৬৩
মো. রফিকুল ইসলাম ২৬৪
মো. রুস্তম আলী ২৬৪
মো. শহীদুল ইসলাম ২৬৫
মো. শহীদুল্লাহ ২৬৬
মো. শহীদুল্লাহ ২৬৮
মো. সাইফউদ্দীন ২৬৯
মো. হেলালুজ্জামান ২৭০
মোজাফ্ফর আহম্মদ ২৭১
মোজাম্মেল হক ২৭২
মোদাসসের হোসেন খান ২৭৩
মোসলেহউদ্দিন আহমেদ ২৭৪
মোস্তফা কামাল ২৭৫
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ২৭৬
মোহাম্মদ আলী ২৭৭
মোহাম্মদ রবিউল্লাহ ২৭৮
মোহাম্মদ লোকমান ২৭৯
মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ ২৮০
মোহাম্মদ সেলিম ২৮১
মোহাম্মদ সোলায়মান ২৮২
মোহাম্মদ হোসেন ২৮৩
রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া ২৮৪
রস্তন আলী শরীফ ২৮৫
রফিকুল আহসান ২৮৬
রফিকুল ইসলাম ২৮৭
রফিকুল ইসলাম ২৮৯
রশিদ আলী ২৯০
রাসিব আলী ২৯১
রুহুল আমিন ২৯২
রেজাউল করিম মানিক ২৯৩
লুৎফর রহমান ২৯৪
শওকত আলী ২৯৫
শফিকউদ্দীন আহমেদ ২৯৬
শহীদুল ইসলাম ২৯৭
শাহজালাল আহম্মদ ২৯৯
শাহজাহান কবীর ৩০০
শেখ আজিজুর রহমান ৩০১
শেখ আবদুল মান্নান ৩০২
শেখ মোক্তার আলী ৩০৩
সামসুল হক ৩০৪
সামসুল হক ৩০৫
সাহাব উদ্দিন ৩০৬
সাহেব মিয়া ৩০৭
সিকান্দার আহমেদ ৩০৮
সিতারা বেগম ৩০৯
সিরাজউদ্দীন আহমেদ ৩১০
সিরাজুল ইসলাম ৩১১
সোনা মিয়া ৩১২
সৈয়দ খান ৩১৩
সৈয়দ রফিকুল ইসলাম ৩১৪
সৈয়দ রেজওয়ান আলী ৩১৫
হযরত আলী ৩১৬
হাবিবুর রহমান ৩১৭
হাবিবুর রহমান ৩১৮
হারুন-উর রশিদ ৩১৯
হারুনুর রশিদ ৩২০
হারেছ উদ্দীন সরকার ৩২১
হাসানউদ্দিন আহমেদ ৩২২
হোসেন আলী তালুকদার ৩২৩

সংকেতের ব্যাখ্যা ৩২৫
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৩২৫
গ্রন্থপঞ্জি, পত্রিকা, পোস্টার ৩২৬
কৃতজ্ঞতা ৩২৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, অগণিত শহীদের রক্ত এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ শুরু হওয়ার পরপরই এ দেশের সব শ্রেণী-পেশার মানুষ মিলিত হয়েছিলাম মুক্তির অভিন্ন মোহনায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে মাত্র নয় মাসের মধ্যে আমরা দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলাম।

যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পালন করেছিলেন অবিস্মরণীয় ভূমিকা। কিন্তু স্বাধীনতার পর তাঁদের সেই দেশপ্রেম, সাহস ও বীরত্বের কথা আমরা যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারিনি। এই বীরদের মুখে বা কাগজে-কলমে স্বীকৃতি দিলেও তাঁদের কথা আমরা মনে রাখিনি। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্ম জানতেই পারেনি তাঁরা কত বড় বীর! দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে তাদের সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের সেই উজ্জ্বল আত্মত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস তুলে ধরা ছিল একটা জাতীয় কর্তব্য।

বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগণিত সাধারণ মানুষের অসাধারণ যোদ্ধায় পরিণত হওয়ার রুদ্ধশ্বাস কাহিনি। ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ও পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই দেশের ডাকে শত্রুর বিরুদ্ধে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। ১৯৭১ সালে তাঁরা সুশৃঙ্খল ও অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, তা অবিশ্বাস্য। অনেক ঘটনা গল্প-কাহিনির চেয়েও রোমাঞ্চকর।

যুদ্ধে বীরত্বের জন্য পৃথিবীতে খেতাব দেওয়ার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মানবসভ্যতার প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই বীরদের সম্মান জানানো হয়ে আসছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা ও সেনাধ্যক্ষদের সাহস ও বীরত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার রাষ্ট্রীয় রেওয়াজ ও আনুষ্ঠানিকতা ইতিহাসের আধুনিক কালপর্বে জন্ম নেওয়া দেশগুলোতে একটা বহুল প্রচলিত রীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, বিশেষত মিত্রবাহিনীর সাধারণ সেনাসদস্য থেকে শুরু করে সেনাধ্যক্ষদের বীরত্বের জন্য প্রচুর খেতাব দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। মোট খেতাব দেওয়া হয় ৬৭৬টি। এই খেতাব ছিল চার স্তরের—বীরশ্রেষ্ঠ ৭, বীর উত্তম ৬৮, বীর বিক্রম ১৭৫ ও বীর প্রতীক ৪২৬। কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা একই সঙ্গে দুটি খেতাব পেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতাব পাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগই ১৯৯২ সালের আগ পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নাম ও তাঁদের বীরত্বের কথা জানতেন দেশের মানুষ। অন্যদের নাম ও বীরত্বের কথা তাঁরা জানতেন না। ১৯৭৩ সালে গেজেটের মাধ্যমে তাঁদের নাম প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তাতে খেতাব পাওয়া বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার ঠিকানা ছিল না। উল্লেখ ছিল না অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্যের। ১৯৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর সরকার প্রথম খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিকভাবে পদক প্রদান করে। তথ্যের অভাবে এ অনুষ্ঠানে সব মুক্তিযোদ্ধাকে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁদের পদক ও সনদও দেওয়া যায়নি। এঁদের মধ্যে কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে সরকার পদক ও সনদ প্রদান করে। কিন্তু কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁদের পরিবারের হাতে আজ পর্যন্ত পদক ও সনদ দেওয়া সম্ভব হয়নি সঠিক তথ্যের অভাবে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা জানতেই পারেননি যে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য তাঁরা খেতাব পেয়েছেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধার পরিবারও তাঁদের স্বজনের খেতাব পাওয়ার বিষয়ে জানতে পারেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গোটা জাতির পরম অর্জন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন বহুমাত্রিক ও ব্যাপক পরিসরে গবেষণা। সে প্রচেষ্টারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস *প্রথম আলোর* বছরব্যাপী প্রতিদিনের এই প্রতিবেদন। সেই উদ্যোগের পরিণতি *একাত্তরের বীরযোদ্ধা : খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা* প্রথম খণ্ড। এ বই পাঠকদের মধ্যে সঞ্চার করবে ইতিহাসের সেই উত্তাল দিনগুলোর হৃৎস্পন্দন।

১৯৭৩ সালে খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলেও বিষয়টি খুব প্রচার পায়নি। ১৯৯২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পদক প্রদানের পর এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ জানতে শুরু করে। দুঃখের বিষয়, খেতাব পাওয়া কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে এখনো প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য আমাদের অজানা রয়ে গেছে। আমরা *প্রথম আলোতে* ৩০০ জন খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিছু নতুন তথ্যও যোগ করা গেছে। আবার অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি, পরের সংস্করণে আমরা আরও কিছু তথ্য যোগ করতে পারব; কিছু ত্রুটিও সংশোধন করার সুযোগ পাব। এ বইয়ের কোনো ভুল তথ্যের ব্যাপারে কোনো পাঠক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমরা উপকৃত হব।

স্বাধীনতার ৪০ বছর উপলক্ষে *প্রথম আলো* কী করতে পারে, কী করবে—এ রকম এক আলোচনায় *প্রথম আলোর* উপসম্পাদক আনিসুল হক এ কাজটি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ২০১১ সালের ২৭ মার্চ *প্রথম আলো* প্রকাশ করতে শুরু করে ধারাবাহিক প্রতিবেদন। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল, এ কাজ তেমন কঠিন হবে না। আমাদের এ ধারণা ছিল ভুল। স্বাধীনতার ৪০ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি সংগ্রহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। ৪০ বছরে অনেক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। অনেক খেতাবধারীকে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্বীকৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষা না করেই তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গেছেন।

আমরা এই সুকঠিন কাজটির দায়িত্ব দিই *প্রথম আলোর* কর্মী বন্ধু রাশেদুর রহমানকে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। এ কাজটি তাঁর গভীর আগ্রহ ও কঠিন পরিশ্রমের ফসল।

এই দুরূহ কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে *প্রথম আলোর* প্রতিনিধিদের সহযোগিতার ফলে। তাঁরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। তাঁদের সহযোগিতা ও পাঠানো প্রতিবেদন ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব হতো না।

মুক্তিযুদ্ধ যেমন শোক ও বেদনার, তেমনি বীরত্ব ও গৌরবের। এই ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। খেতাবধারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বকাহিনির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এসব ব্যক্তিগত আখ্যান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল। এর মাধ্যমে আমরা কেবল যুদ্ধের ঘটনাক্রমই জানতে পারব না, ইতিহাসের চমকপ্রদ নানা উপাদানও পাব।

মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে *প্রথম আলোর* সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রথমা প্রকাশনের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আমরা বিভিন্নজনের ১১টি গবেষণাধর্মী বই প্রকাশসহ নানা আয়োজন সম্পন্ন করেছি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে *প্রথম আলো* নিরন্তর কাজ করে যেতে চায়।

এই সংকলনের প্রথম খণ্ডে কোনো বীরশ্রেষ্ঠ অন্তর্ভুক্ত হননি। *প্রথম আলোর* এই উদ্যোগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, তাঁদের যুদ্ধগাথা আগে প্রকাশ করা। এ কারণে *প্রথম আলোয়* সাত বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার কারও বীরত্বের কাহিনি এখনো ছাপা হয়নি। পাঠক লক্ষ করবেন, খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা খুবই পরিচিত, তাঁদের কথা কমই ছাপা হয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ এবং খেতাব পাওয়া বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনি ছাপা হবে এই সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে।

এই খণ্ডে থাকছে ২৯ জন বীর উত্তম, ৮৫ জন বীর বিক্রম ও ১৮৬ জন বীর প্রতীকের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ। এসব বীরত্বগাথা সাজানো হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের নামের বর্ণানুক্রমে।

বইটির কাজের শুরু থেকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, উপসম্পাদক আনিসুল হক, সহকারী সম্পাদক অরুণ বসু, গবেষণা ও আর্কাইভ-উপদেষ্টা মুহাম্মদ লুৎফুল হক, প্রথমা প্রকাশনের প্রধান নির্বাহী জাফর আহমদ রাশেদ, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক আখতার হুসেন প্রমুখ। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী চমৎকার একটি প্রচ্ছদ এঁকেছেন। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বইটির ভেতরের অঙ্গসজ্জা শিল্পী অশোক কর্মকারের। যাঁরা তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের নাম এবং যেসব বই থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে, সেসব বইয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে বইয়ের শেষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেই বলেছি, তথ্যের দিক থেকে এ বইয়ে কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। অনেকের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের বিবরণের শুরুতে ছবি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু সবার ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধার ছবি নেই। যাঁদের ছবি নেই, তাঁদের ছবির জায়গায় ১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত শিল্পী নিতুন কুন্ডুর আঁকা 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' পোস্টারটির আংশিক ব্যবহৃত হয়েছে। শুরুতে যেসব তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এর মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে।

এ সংকলনের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য এইচএসবিসি (দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড) কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

মতিউর রহমান
৮ এপ্রিল ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীর উত্তম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

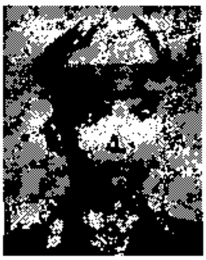

আনোয়ার হোসেন, বীর উত্তম

গ্রাম সোনাইমুড়ি, শাহরাস্তি, চাঁদপুর।
বাবা আবদুল হক, মা নূরজাহান বেগম।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৭।
শহীদ মার্চ ১৯৭১।

১৯৭১ সালের মার্চে মো. আনোয়ার হোসেন প্রশিক্ষণে ছিলেন। ফলে দেশের পরিস্থিতির খবর সময়মতো পেতেন না। প্রত্যন্ত এলাকায় থেকেও চেষ্টা করতেন দেশের খবর জানার। ১৪ মার্চ তাঁর আত্মীয় ওয়াকার হাসান (বীর প্রতীক) গিয়েছিলেন যশোরে। আনোয়ার হোসেন প্রশিক্ষণ থেকে এক দিনের ছুটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আলাপচারিতায় তিনি ওয়াকার হাসানকে বলেন, দেশের যে পরিস্থিতি, কখন কী হয়, বলা যায় না। যদি কিছু হয় তবে দেশের জন্য লড়াই করবেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশ নেন এবং শহীদ হন।

ছোটবেলা থেকেই আনোয়ার হোসেনের ইচ্ছা ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করার। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার্স কোর্সে কোনো বাঙালি যোগ দিলে তাঁকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে দেওয়া হবে, এর নিশ্চয়তা ছিল না। কোর্সে যাঁরা সবচেয়ে ভালো করতেন, তাঁদেরই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয়োগ দেওয়া হতো। আনোয়ার হোসেন এইচএসসি পাস করে ১৯৬[illegible] সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৩ অফিসার্স শর্ট কোর্সে যোগ দেন এবং উত্তীর্ণ হয়ে কমিশন পান। ১৯৭০ সালে তাঁকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে।

প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। এ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন বাঙালি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেজাউল জলিল। অফিসারদের মধ্যে ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন (বীর বিক্রম, পরে মেজর) এবং লে. মো. আনোয়ার হোসেন ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন পাকিস্তানি। ১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকে। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের রেডিও শোনা নিষিদ্ধ করা হয়। এ সময় আবার এই ব্যাটালিয়নের অর্ধেক সেনা ছিলেন প্রশিক্ষণের জন্য যশোরের প্রত্যন্ত এলাকায়, অর্ধেক ছুটিতে। ২৫ মার্চ মো. আনোয়ার হোসেনও ছিলেন প্রশিক্ষণস্থলে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের খবর তাঁরা সময়মতো পাননি। এদিকে ২৮ বা ২৯ মার্চ অধিনায়ক রেজাউল জলিল তাঁদের অবিলম্বে সেনানিবাসে ফেরার নির্দেশ দেন। সেদিনই তাঁরা সেনানিবাসে আসেন। সেনানিবাসে আসার পর রেজাউল জলিল সবাইকে অস্ত্রাগারে অস্ত্র জমা দিতে বলেন। তাঁর নির্দেশে তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্ত্র জমা দেন। সেদিন তাঁরা বেশির ভাগ সেনা ছিলেন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এ জন্য তাঁরা রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। গভীর রাতে যশোর সেনানিবাসে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট ও ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এফএফ) তাঁদের আক্রমণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরস্ত্র সেনাদের কয়েকজন ঘুমন্ত অবস্থায়ই শহীদ হন। বেঁচে যাওয়া সেনারা অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ শুরু করেন। সেনারা অধিনায়ক রেজাউল জলিলকে অনুরোধ জানান বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লে. আনোয়ার সেনাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় একাত্মতা প্রকাশ করেন। তাঁদের নেতৃত্বে সেনারা পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লে. আনোয়ার এই অসম যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁদের সাহস ও বীরত্বে প্রতিরোধযোদ্ধাদেরও মনোবল বেড়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। এর মধ্যে প্রতিরোধযোদ্ধাদের অনেকে শহীদ ও অনেকে আহত হন। একপর্যায়ে তাঁদের গোলাগুলিও কমে আসতে থাকে। এ অবস্থায় হাফিজ ও আনোয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সেনানিবাস এলাকা ছেড়ে চৌগাছায় একত্র হবেন। এরপর তাঁরা ফায়ার অ্যান্ড মুভ পদ্ধতিতে খোলা মাঠ দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকেন। আনোয়ারও সেভাবে পশ্চিম দিকের খোলা মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া গুলি এসে লাগে তাঁর কোমর ও পিঠে। তিনি শহীদ হন। প্রতিরোধযোদ্ধারা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে স্থানীয় জনগণ তাঁকে নজরুল ইসলাম কলেজের সামনে সমাহিত করেন।

আফ[illegible] মিয়া, বীর উত্তম

গ্রাম [illegible]কুল, সদর, গাজীপুর।
বাবা জমির উদ্দিন, মা জহুরা খাতুন।
স্ত্রী মরিয়ম আফজাল। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫২। মৃত্যু ১৯৯১।

আফজাল মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধাদের গানবোট দুপুরের মধ্যেই নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল রূপসা নদীতে, খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি। ওই গানবোটের সঙ্গে আছে আরও দুটি জাহাজ। তিনটির মধ্যে দুটি মুক্তিবাহিনীর, অপরটি ভারতীয় নৌবাহিনীর। মুক্তিবাহিনীর জাহাজের নাম 'পদ্মা' ও 'পলাশ', ভারতীয় জাহাজের নাম 'আইএনএস প্যানভেল'। মুক্তিযোদ্ধারা জাহাজে করে যাচ্ছেন খুলনায় পাকিস্তানি নৌঘাঁটি দখলের জন্য। এই অপারেশনের সাংকেতিক নাম 'অপারেশন হটপ্যান্টস'। বহরের সামনে প্যানভেল, মাঝে কিছুটা দূরত্বে পদ্মা, পেছনে পলাশ। কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজগুলো। আফজাল মিয়া পদ্মা জাহাজের আর্টিফিশার। সেদিন তিনি ইঞ্জিনরুমে নিজের কাজে ব্যস্ত। এ সময় গোটা জাহাজ কেঁপে উঠে ইঞ্জিনরুমে আগুন ধরে গেল। তিনি ছিটকে পড়লেন। যখন হুঁশ হলো তখন কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। ক্ষতবিক্ষত আফজাল মিয়া অনেক কষ্টে ইঞ্জিনরুম থেকে বেরিয়ে এলেন ডেকে। সেখানে এক করুণ দৃশ্য—চিৎকার, চেঁচামেচি, দৌড়াদৌড়ি। নিহত সহযোদ্ধাদের লাশের পর লাশ পড়ে আছে। আহত সহযোদ্ধারা কাতরাচ্ছেন। অক্ষত সহযোদ্ধারা ছোটাছুটি করছেন পানিতে লাফিয়ে পড়ার জন্য। যে যেভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছেন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন জীবন বাঁচাতে। আহত আফজাল মিয়ার মুখমণ্ডল ও হাত-পা রক্তাক্ত। এরপর তিনি কীভাবে কখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, নিজেও জানেন না। পরনে লাইফ জ্যাকেট থাকায় ভাসতে থাকলেন। তখনো ঠিকমতো দেখতে পারছেন না। অনেকক্ষণ পর দেখেন, তিনি নদীর তীরে। সেখানে এক রাজাকার তাঁকে আটক করে। এর পরের ঘটনা—সে আরেক কাহিনি।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরের। ঘটেছিল খুলনার রূপসা নদীতে। সেদিন ভারতীয় জঙ্গি বিমান ভুলক্রমে মুক্তিবাহিনীর এ দুই জাহাজে বোমাবর্ষণ করে। এতে জাহাজ দুটি বিধ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীর নৌ উইংয়ের অনেকে শহীদ ও আহত হন। এ বিমান হামলায় আফজাল মিয়াসহ কয়েকজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। সেদিন দুপুরে তিনটি জঙ্গি বিমান তাঁদের জাহাজের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরের দিকে উড়ে যায়। জাহাজের নৌসেনারা বিমানগুলোকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মনে করে সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলায় ক্যাপ্টেনের কাছে অনুমতি চাইলেও তিনি সে অনুমতি দেননি। ক্যাপ্টেন ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, ঘটনার ওখানেই শেষ। কিন্তু তাঁর সেই ধারণা ছিল ভুল। পরে বিমানগুলো আবার পেছন দিক থেকে জাহাজ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে। খুব নিচু দিয়ে উড়ে এসে কোনো রকম সতর্কসংকেত না দেখিয়েই পদ্মা ও পলাশে বোমাবর্ষণ করে। প্রথম হামলাতেই বিধ্বস্ত পদ্মা। একটি গোলা এসে পড়ে পদ্মার ইঞ্জিনরুমে। পলাশেও বোমা পড়ে, তবে সেটি সচল ছিল। ওই অবস্থায় পলাশ এগিয়ে যেতে থাকে। একটু পর বিমানগুলো ফিরে এসে আবার পলাশে বোমাবর্ষণ করে। ভারতীয় জঙ্গি বিমান প্যানভেল জাহাজে বোমাবর্ষণ করেনি। পরে প্যানভেলের নাবিকেরা আফজাল মিয়াসহ কয়েকজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠান। আফজাল মিয়ার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

আফজাল মিয়া পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। পরে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর নৌ উইংয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১২ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর নৌ উইং গঠিত হয়। এ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তিনি দুটি অপারেশনে অংশ নেন।

AMARBOI.COM

আফতাবুল কাদের, বীর উত্তম

গ্রাম পিউরি, ইউনিয়ন ভোলাকোট, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।
বাবা আবদুল কাদের, মা রওশন আরা বেগম। স্ত্রী জুঁই।
খেতাবের সনদ নম্বর ২২।
শহীদ ২৭ এপ্রিল ১৯৭১।

খালাতো বোন জুঁইয়ের সঙ্গে প্রেম, দুজনে বিয়ে করবেন কিন্তু নানা জটিলতা, বিশেষত সেনা চাকরির কারণে আফতাবুল কাদের সময় ও সুযোগ করে উঠতে পারছিলেন না। চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দরাবাদে ফিল্ড রেজিমেন্টে। সুযোগ এল ১৯৭১ সালে। তিনি ছুটি নিয়ে ঢাকায় আসেন। ২০ মার্চ চট্টগ্রামে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয় তাঁদের। সংসার শুরু করবেন তাঁরা, এল ২৫ মার্চের কালরাত। সেদিন তিনি ঢাকার ফরিদাবাদের বাসায়।

একদিকে নতুন জীবনের হাতছানি, অন্যদিকে দেশের ডাক। আফতাবুল কাদের বেছে নিলেন দেশকেই। ঢাকার বাসায় মা-বাবাসহ তিন দিন অবরুদ্ধ ছিলেন। ২৮ মার্চ বেরিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। প্রথমে যান চট্টগ্রামে। সেখান থেকে রামগড়ে। দেখা হয় জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) সঙ্গে। আফতাবুলকে তিনি মহালছড়ি এলাকায় অবস্থানরত প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেন। এরপর তিনি সেখানে যান।

২৭ এপ্রিল সকাল থেকে মহালছড়ির চারদিকে থমথমে অবস্থা। প্রতিরোধযোদ্ধারা খবর পেয়েছেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানি তাঁদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রতিরোধযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্বে আছেন ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদের। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল সেনা তাঁর অধীনে। সকাল নয়টার দিকে ঝোড়োগতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো দল তাঁদের অবস্থানে আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণ এতটা শক্তিশালী হবে তাঁরা কল্পনাও করেননি। দেখা গেল, পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বিদ্রোহী মিজোরাও আছে। ১৯৭১ সালে মিজোরা পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষাবলম্বন করে। তারাও সংখ্যায় কয়েক শ। এদিকে এক কোম্পানি পাকিস্তানি কমান্ডো আগেই ছদ্মবেশে মিজোদের সঙ্গে মিশে ছিল। এসব প্রতিরোধযোদ্ধাদের ধারণার বাইরে ছিল।

দুই কোম্পানি পাকিস্তানি কমান্ডো ও শত শত প্রশিক্ষিত বিদ্রোহী মিজো প্রতিরোধযোদ্ধাদের তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। প্রতিরোধযোদ্ধারা অসীম সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো ও মিজোদের মোকাবিলা করতে থাকেন। প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাঁদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসে। এ অবস্থায় তাঁরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তখন তাঁরা কৌশলগত কারণে পাকিস্তানি ও মিজোদের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সবচেয়ে কার্যকর মেশিনগান অবস্থান থেকে কাভারিং ফায়ার দেওয়া হচ্ছিল, যাতে তাঁরা নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করতে পারেন। হঠাৎ সেই মেশিনগান অকেজো হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা তখন তাঁদের দেড়-দুই শ মিটারের মধ্যে চলে এসেছে।

নতুন এই বিপর্যয়ে ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদের এককভাবে সাহসী ও অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি গোলাগুলির মধ্যেই দৌড়ে গুরুত্বপূর্ণ উঁচু স্থানে অবস্থান নেন। হাতে একটা এলএমজি। তিনি এলএমজি দিয়ে একনাগাড়ে কাভারিং গুলি করতে থাকেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক ভূমিকা ও এলএমজির কার্যকর ফায়ারের কারণে প্রতিরোধযোদ্ধাদের বেশির ভাগই নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হন। কিন্তু চরম মূল্য দিতে হলো আফতাবুলকে। তিন-চারটি গুলি এসে লাগে তাঁর বুকে। গুলি তাঁর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। এর পরও তিনি বেঁচে ছিলেন। অস্ত্র থেকে হাত সরাননি তিনি, মুমূর্ষু অবস্থাতেও গুলি করার চেষ্টা করেন।

শওকত ও ফারুক নামের দুজন স্বেচ্ছাসেবী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আফতাবুল কাদেরকে উঁচু স্থান থেকে নামিয়ে গোলাগুলির মধ্যেই একটি জিপে করে রওনা হন ফিল্ড হাসপাতালে। পথে তিনি শহীদ হন। রামগড় শহরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। সেদিন তাঁর বীরত্বের জন্য প্রায় ৫০০ প্রতিরোধযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবী বেঁচে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান, বীর উত্তম

গ্রাম পশ্চিম ডেকরা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
বাবা আবদুল জব্বার খন্দকার, মা আসকিরের নেছা।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭।
শহীদ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযোদ্ধাদের সফল ফাঁদে (অ্যামবুশ) পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। যারা বেচে গেছে, তাদের বেশির ভাগ আহত। যাদের গায়ে গুলি লাগেনি, তারা পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। ফাঁদের বাইরে থাকা পাকিস্তানি সেনারা অবস্থান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করছিল। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে গোটা এলাকা তখন প্রকম্পিত। মুক্তিযোদ্ধারা বেশ নিরাপদ অবস্থানে থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন গুলি। পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া গুলি তাঁদের ধারেকাছে আসছে না। মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলে ছিলেন আবদুল মান্নান, সাহসী ও অকুতোভয় এক যোদ্ধা। তাঁর গুলিতেই নিহত হয় বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা। নিজের এই সাফল্যে তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা, এ সময় তাঁর অবস্থানের সামনে দিয়ে পালাচ্ছিল এক পাকিস্তানি সেনা। তাকে দেখে আনন্দে আবদুল মান্নান সহযোদ্ধাদের বললেন, একে জীবিত ধরতে হবে এবং তিনি নিজেই তাকে ধরবেন। এ কথা বলে পরিখা থেকে লাফ দিয়ে উঠে গোলাগুলির মধ্যেই 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ওই পাকিস্তানি সেনার দিকে। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য! পাকিস্তানি সেনাকে জীবিত ধরতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে সাহসী যোদ্ধা আবদুল মান্নান শহীদ হন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের। ঘটেছিল হবিগঞ্জ জেলার কালেঙ্গায়।

মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন সিন্দুরখান-কালেঙ্গা রাস্তার পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট টিলার ওপর অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করার জন্য ফাঁদ পাতেন। তাঁরা আগেই খবর পেয়েছিলেন, পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল কালেঙ্গায় টহল দিতে আসবে। দুই দিন আগে পাকিস্তানি সেনারা কালেঙ্গায় ঘাঁটি স্থাপনের জন্য এসেছিল। তখন তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। ফলে পাকিস্তানি সেনারা বেপরোয়াভাবেই এগিয়ে আসছিল। তাদের পুরোভাগে ছিল একদল রাজাকার। রাজাকাররা যখন মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশ করা এলাকার মধ্যে চলে আসে, তখন তাঁরা চুপ করে থাকেন। তাঁরা অপেক্ষায় থাকেন শুধু পাকিস্তানি সেনাদের জন্য। তারা যখন মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁদের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন একযোগে গর্জে ওঠে তাঁদের প্রত্যেকের অস্ত্র। চারদিক থেকে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গুলি শুরু করেন। পাকিস্তানি সেনারা বিস্তীর্ণ এলাকা দিয়ে এগিয়ে আসছিল। ফলে সব পাকিস্তানি সেনা তাঁদের ফাঁদে পড়েনি। যারা ফাঁদের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তাদের বেশির ভাগই মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে নিহত হয়। ফাঁদের বাইরে থাকা পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত অবস্থান নিয়ে বিপদগ্রস্ত সঙ্গীদের বাঁচানোর জন্য পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু এই আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। শুধু আবদুল মান্নান ওই সেনাকে ধরতে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহীদ হন। কয়েকজন আহত হন। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক অফিসারসহ ৪০-৪৫ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর ইউনিটের সঙ্গে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। পরে ৩ নম্বর সেক্টরের আশ্রমবাড়ী/বাঘাইবাড়ী সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন।

আবদুস সাত্তার, বীর উত্তম

গণপাড়া, কাশীপুর, মহানগর, বরিশাল।
বাবা রহমত আলী হাওলাদার, মা আমেনা খাতুন।
স্ত্রী রেহেনা পারভীন। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৯।

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীর কোদালকাটিতে ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। কয়েকটি চরের সমন্বয়ে কোদালকাটি। প্রতিটি চরেই ছিল মুক্তিবাহিনী। একটি চরে ছিলেন আবদুস সাত্তার। তাঁর দলের নেতৃত্বে ছিলেন সুবেদার ওহাব। ৪ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে কোদালকাটির একাংশ দখল করে দেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে রৌমারী থানা সদরে পতাকা উত্তোলন করা। ১৩ আগস্ট বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা গানবোট, লঞ্চ ও বার্জে করে সোনাভরী নদীর মোহনা হয়ে রৌমারীর রাজিবপুরের দিকে অগ্রসর হয়। তখন নটারকান্দি গ্রামে অবস্থানরত আবদুস সাত্তারের দল এবং অন্যান্য চরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের দল পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার জন্য একযোগে আক্রমণ করে। সারা দিন ব্যাপক গোলাগুলি হয়। বিকেলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পিছু হটে তাদের কোদালকাটি ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়।

রাতে আবদুস সাত্তার ও সহযোদ্ধারা অবস্থান নেন হাজীর চরের গোয়ালঘর এলাকায়। কাছেই ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। সেখানে তাদের গানবোট, লঞ্চ ও বার্জ নোঙর করা ছিল। দলনেতা সুবেদার ওহাবের নির্দেশে আবদুস সাত্তার সহযোদ্ধা তরিকুলকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতে নদী সাঁতরে একটি গানবোটের কাছে গিয়ে তাতে মাইন লাগান। কিছুক্ষণ পর বিকট শব্দে মাইন বিস্ফোরিত হয়ে ওই গানবোট ধ্বংস হয়। এটা ছিল আবদুস সাত্তারের প্রথম সফল অপারেশন। তাঁর এই দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে রৌমারীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের পতাকা তুলতে পারেনি।

আবদুস সাত্তার ১৯৭১ সালে রাজশাহী ইপিআর ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন। ২৭ মার্চ তিনি অন্যান্য ইপিআর সদস্যসহ বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে তিনি ভারতে যান। সেখানে অবস্থানকালে তাঁদের বেশির ভাগ সদস্যকে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন আলফা কোম্পানিতে। পরে জেড ব্রিগেডের অধীনে সিলেটের ছাতক ও গোয়াইনঘাটে যুদ্ধ করেন। ১৩ থেকে ১৭ অক্টোবর ছাতকের

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। কয়েক দিন সেখানে যুদ্ধ চলে। ১৪ ও ১৬ অক্টোবর সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই অপারেশনে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানি সেনাদের ক্ষতিই ছিল বেশি। মুক্তিবাহিনীর আরআর গানের গোলার আঘাতে পাকিস্তানি সেনাদের বেশ কয়েকটি বাংকার ধ্বংস হয়। দুটি বাংকার ধ্বংসে আবদুস সাত্তার নেতৃত্ব দেন।

২৩ অক্টোবর আবদুস সাত্তার ও দলের সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়াইনঘাট অবস্থানে আক্রমণের জন্য সেখানে সমবেত হন। তাঁদের অবস্থান ছিল গোয়াইন বাজারের দক্ষিণে নদীর তীরে। ২৪ অক্টোবর, তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা হবে। তাঁরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এ সময় পাকিস্তানি সেনারাই তাঁদের আকস্মিক আক্রমণ করে। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর বেশ কজন শহীদ হন। প্রাথমিক ধকল কাটিয়ে মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ করেন। দিনভর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে সাত্তারের পায়ে গুলি লাগে। পায়ের শিরা ছিঁড়ে গুলি বেরিয়ে যায়। এর পরও যুদ্ধ করতে থাকেন তিনি। একপর্যায়ে নিস্তেজ হয়ে পড়লে সহযোদ্ধারা তাঁকে বাঁশতলায় নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে ভারতের শিলং হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এ টি এম হায়দার, বীর উত্তম

গ্রাম কান্দাইল, ইউনিয়ন জয়কা, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
বাবা মোহাম্মদ ইসরাইল, মা হাকিমুন্নেছা বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬।
১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে নিহত।

AMARBOI.COM

মুক্তিযুদ্ধকালে রাজধানী ঢাকায় অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাবাহিনী গঠন করা হয়। এর মধ্যে ক্র্যাক প্লাটুন ছিল অন্যতম। পাকিস্তানি সেনাদের সর্বক্ষণ ভীতসন্ত্রস্ত ও বিশ্রামহীন রাখা এবং দেশের অভ্যন্তরে সংগ্রামী জনতার মনোভাব দৃঢ় রাখার জন্যই এ বাহিনীর সৃষ্টি। এ বাহিনী গঠনে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তিনি এ টি এম হায়দার। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে ক্র্যাক প্লাটুন গড়ে ওঠে। বেশির ভাগ গেরিলাকে তিনি নিজেই প্রশিক্ষণ দেন। তাঁর বিচক্ষণতায় ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা তখন চোরাগোপ্তা আক্রমণের মাধ্যমে ঢাকার বিভিন্ন অফিস-আদালতসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটান। গেরিলারা যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা অচল করার পাশাপাশি ঢাকার আশপাশে গেরিলাযুদ্ধও চালান। ক্র্যাক প্লাটুন গঠন ও পরিচালনায় এ টি এম হায়দার যে দেশপ্রেম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এ টি এম হায়দার ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের (এসএসজি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো ও প্যারাট্রুপার। ১৯৭০ সালের শেষ দিক থেকে তিনি কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসের ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের চলাচল বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে এ টি এম হায়দার নিজেই দেশের অভ্যন্তরে সেতু ধ্বংসসহ বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। পরে ভারতের মেলাঘরে গণযোদ্ধাদের তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্র, বিস্ফোরক ও গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেন। তাঁদের তিনিই তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর প্রশিক্ষিত গেরিলারা চীন, কিউবা ও ভিয়েতনামের গেরিলাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। ২ নম্বর সেক্টরের গণযুদ্ধে এ টি এম হায়দার আজও একজন প্রবাদপুরুষ। তিনি ছিলেন অধিনায়ক খালেদ মোশাররফের একজন যোগ্য সহযোগী। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে খালেদ মোশাররফ আহত হলে তিনি অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তিনি সাহস ও বীরত্ব দিয়ে এ দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ চূড়ান্ত হলে মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের জিওসি-ইন-সি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, বাংলাদেশ বাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকারের সঙ্গে এ টি এম হায়দারও ঐতিহাসিক রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে উপস্থিত হন। ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে এ কে খন্দকার ও কে এম সফিউল্লাহর সঙ্গে তিনিও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

উল্লেখ্য, বীর প্রতীক ডা. সিতারা বেগম তাঁর বোন।

WWW.AMARBOI.COM

এরশাদ আলী, বীর উত্তম

গ্রাম বৈষ্ণবপুর, সেনবাগ, নোয়াখালী। বাবা আলী মিয়া, মা আসমতের নেছা। স্ত্রী নুরুন নেছা। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৯। শহীদ ২ এপ্রিল ১৯৭১।

২৫ মার্চের পর রংপুর ইপিআর উইংয়ের বাঙালি সদস্যরা অবস্থান নেন কাউনিয়ায়। ৩১ মার্চ রংপুর সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স কাউনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। তখন ইপিআর সেনারা কৌশলগত কারণে পিছু হটে তিস্তা রেলসেতুর কুড়িগ্রাম প্রান্তে অবস্থান নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ছিলেন এরশাদ আলী। এখানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন লালমনিরহাট, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম ও কুড়িগ্রাম থেকে আসা ইপিআর সদস্য, পুলিশ, আনসার ও ছাত্র-জনতা। তাঁরা রেলসেতুর মাঝের স্লিপার খুলে কুড়িগ্রাম প্রান্তে লাইনের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখেন।

১ এপ্রিল কাউনিয়া রেলস্টেশন থেকে একদল পাকিস্তানি সেনা ট্রেনে তিস্তা সেতু অভিমুখে যাত্রা করে। মুক্তিযোদ্ধারা সেতুর কুড়িগ্রাম প্রান্তে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অপেক্ষায় ছিলেন। ট্রেন মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের আওতায় আসামাত্র তাঁরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একযোগে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও পাল্টা আক্রমণ চালায়। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেজর এজাজ মোস্তফা, ১৫ জন সেনা ও কাউনিয়া থানার ওসি নিহত হন। বাকি পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এ ছিল বিরাট সাফল্য। এ সাফল্যে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বহু গুণ বেড়ে যায়।

যুদ্ধের সাফল্যে এরশাদ আলী ও তাঁর সহযোদ্ধারা তখন বেশ উদ্দীপ্ত। তবে আনন্দের আতিশয্যে তাঁরা ভাসছেন না। এ রকম আনন্দের মধ্যেও সবাই তিস্তা রেলসেতুর প্রতিরক্ষা অবস্থানের নিজ নিজ বাংকারে সজাগ-সতর্ক। কারণ, যেকোনো সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর আবারও আক্রমণ করতে পারে। রাতে তাঁরা পালা করে ঘুমালেন।

২ এপ্রিল। সকাল হতেই সত্যি সত্যি এরশাদ আলী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আর্টিলারি গোলাবর্ষণ। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন দল ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রংপুর সেনানিবাস থেকে পরদিন এখানে এসে আবার আক্রমণ চালায়। বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই আক্রমণ পরিচালনায় অংশ নেয়। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন মুক্তিযোদ্ধারা। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। কিন্তু এরশাদ আলী গেলেন না। বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকলেন। তাঁর বীরত্বে উদ্দীপ্ত হলেন আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা নিজ নিজ বাংকার থেকে যুদ্ধ করতে থাকেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে এরশাদ আলীর সহযোদ্ধা আতাহার আলী মল্লিক (বীর বিক্রম) শহীদ হন। কিছুক্ষণ পর এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে এরশাদ আলীর বুকে। ভেঙে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ। বাকি মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান দখল করে নেয়। রক্তে রঞ্জিত বাংকারে পড়ে থাকল এরশাদ আলীর নিথর দেহ।

সহযোদ্ধারা এই অপারেশনে শহীদ দুই মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করতে পারেননি।

এরশাদ আলী চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের রংপুর উইংয়ে।

AMARBOI.COM

এস এম ইমদাদুল হক, বীর উত্তম

গ্রাম মাটলা, সদর, গোপালগঞ্জ।
বাবা আবদুল মালেক, মা রওশন নেছা।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২৬।
শহীদ ৭ নভেম্বর ১৯৭১।

এস এম ইমদাদুল হক ১৯৭১ সালে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। চাকরি করতেন সেনাবাহিনীতে। তিনি তখন লেফটেন্যান্ট। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কয়েকজন বাঙালি সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ করে পালানোর সুযোগ খুঁজতে থাকেন। মে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একদিন তাঁরা ১২ জন একসঙ্গে পালিয়ে ভারতে যান। এস এম ইমদাদুল হককে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি প্রথমে যুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টর এলাকায়, পরে জেড ফোর্সের অধীনে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে। ৭ নভেম্বর মৌলভীবাজারের ধামাই চা-বাগানে এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

ধামাই চা-বাগানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর স্বল্প তৎপরতার কারণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই এলাকায় ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ধামাই চা-বাগানের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য ধামাই সেখানে আক্রমণ করা, চা-বাগানের দখল নেওয়া মুক্তিবাহিনীর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই আক্রমণের দায়িত্ব পড়ে এস এম ইমদাদুল হকের ওপর। ৭ নভেম্বর রাতে তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ১০০ মুক্তিযোদ্ধা সীমান্ত অতিক্রম করে চা-বাগান থেকে দূরে এক স্থানে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অবস্থান নেন। আক্রমণের নির্ধারিত সময় ছিল ভোররাত। আক্রমণ শুরুর আগে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এগিয়ে যান পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান নিজ চোখে দেখার জন্য। এ সময় বাগানে থাকা কয়েকটি কুকুর ডেকে উঠলে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি শুরু করে। তাঁর সঙ্গে থাকা মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা গুলি করেন। তিনি নিজে পাকিস্তানি ক্যাম্প লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়েন। শুরু হয় প্রচণ্ড গোলাগুলি। এর মধ্যে দূরে থাকা সহযোদ্ধারাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ইমদাদুল হক সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন এবং যুদ্ধ করেন। একপর্যায়ে কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে ঢুকে পড়েন পাকিস্তানি অবস্থানের একদম ভেতরে। এ সময় আহত হন তাঁর এক সহযোদ্ধা। তাঁকে উদ্ধার করতে তিনি নিজেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলি এসে লাগে তাঁর বুকে। শহীদ হন এই সাহসী যোদ্ধা। সে যুদ্ধে আরও দুজন শহীদ হন। পরে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর এবং অন্য দুই সহযোদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করে সমাহিত করেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের চল্লিশধন কদমতলায়।

AMARBOI.COM

খাজা নিজামউদ্দীন ভূঁইয়া, বীর উত্তম

গ্রাম মালাপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। বাবা আবদুল লতিফ ভূঁইয়া, মা তাবেন্দা আক্তার। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪। গেজেটে নাম খাজা নিজামউদ্দীন।
শহীদ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা খাজা নিজামউদ্দীন তাঁর দল নিয়ে সিলেট জেলার কানাইঘাটের আটগ্রাম সড়কের বাজারের কাছে বিস্ফোরক দিয়ে একটি সেতু ধ্বংস করেন। সে সময় একদল পাকিস্তানি সেনা সেতুর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছিল। তারা নিজামউদ্দীনের দলের ওপর আক্রমণ করে। তখন পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে তাঁদের সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে তিনি ও তাঁর দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করতে থাকেন। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া গোলার আঘাতে খাজা নিজামউদ্দীন শহীদ এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যুদ্ধ শেষে দলের অন্য মুক্তিযোদ্ধারা খাজা নিজামউদ্দীনের মৃতদেহ এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হন। পরে মুক্তিযোদ্ধারা খাজা নিজামউদ্দীন ভূঁইয়াকে সিলেটের মুকামটিলায় সমাহিত করেন।

খাজা নিজামউদ্দীন ভূঁইয়া ১৯৭০ সালে এমকম পরীক্ষা শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশ বিভাগে এমবিএতে ভর্তি হয়েছিলেন। চাকরিও করতেন ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (পরে শেরাটন, বর্তমানে রূপসী বাংলা)। কন্ট্রোলার অব অ্যাকাউন্টস পদে কর্মরত ছিলেন। চাকরি ও পড়াশোনা দুটোই একসঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৯ এপ্রিল তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে নিজ এলাকা হয়ে ভারতে চলে যান। তখন তাঁর বয়স ছিল ২২।

ভারতে অস্ত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর খাজা নিজামউদ্দীন ভূঁইয়া ৪ নম্বর সেক্টরের অধীন জালালপুর সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন। সিলেট জেলার কানাইঘাট, মস্তানগঞ্জ, ভরামইদ, নক্তিপাড়া ও মণিপুর বাজারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজামউদ্দীন যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

নূরুল হক, বীর উত্তম

গ্রাম ও ইউনিয়ন সিরাজপুর, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।
বাবা আবদুল কাদের, মা শামসুন নাহার। স্ত্রী নূর নেছা।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪০।
শহীদ ২৮ নভেম্বর ১৯৭১।

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার অন্তর্গত রাধানগর। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কয়েক দিন যুদ্ধ হয়। রাধানগরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল বেশ শক্তিশালী। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও টসি ব্যাটালিয়ন। তারা বেশ দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছিল। ২৭ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা এককভাবে রাধানগরে আক্রমণ করেন। তাঁরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাধানগরের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান দখল করে নেন।

মুক্তিবাহিনীর একটি দলে আছেন নূরুল হক। ২৮ নভেম্বর সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর্টিলারি গোলাবর্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নিতে লাগলেন। এ সময় একটি গোলা এসে বিস্ফোরিত হলো নূরুল হকের পাশে। নিমেষে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল নূরুল হকের পুরো দেহ। এ সময় তিনি তাঁর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট এস আই এম নূরুন্নবী খানের (বীর বিক্রম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) পাশেই ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম তাঁর *অপারেশন রাধানগর* বইয়ে এদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, '২৮ নভেম্বর, ১৯৭১। সকাল ৭টা বেজে ১০ মিনিটের মতো হবে। চারদিক দিনের আলোয় উদ্ভাসিত। এ সময় আমি আমার প্রতিটি প্লাটুন এবং সেকশনকে পাকিস্তানি সেনাদের যেকোনো ধরনের প্রতিহামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত করে নির্বাচিত কমান্ডপোস্ট এলাকায় অবস্থান করছিলাম। ৮টার দিকে পাকিস্তানি সেনাদের সেই প্রতীক্ষিত প্রতিহামলা শুরু হয়ে গেল। প্রথমেই প্রায় ১৫ মিনিট ধরে ওরা ব্যাপক আকারে আমাদের অবস্থানের ওপর গোলা নিক্ষেপ করল। পাকিস্তানি সেনারা যেন দেখে দেখে গোলা নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু আমাদের দখলীকৃত পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারগুলো এতই মজবুত ছিল যে আর্টিলারি গোলা ক্ষতি করতে পারছিল না। হঠাৎ একটি গোলা এসে আমার কমান্ডপোস্টের বাঁশঝাড়টির প্রায় সবগুলো বাঁশই টুকরো টুকরো করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলল। সিপাহী নূরুর (নূরুল হক) দেহটি টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল। গুম শব্দে মুহূর্তের মধ্যে আমি ড্রাইভ দিয়ে বাংকারে ঢুকে পড়েছিলাম। নূরু (নূরুল হক) তা করতে সময় পায়নি।'

নূরুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭০ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। নভেম্বরের শেষ দিকে তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ি এসে বিয়ে করেন। এরপর ক্রমেই দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকলে তিনি আর চাকরিতে যোগ দেননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্ত্রীকে রেখে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে। ছাতক, গোয়াইনঘাটসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন তিনি।

WWW.AMARBOI.COM

ফজলুর রহমান খন্দকার, বীর উত্তম

গ্রাম আউলিয়াপুর, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। বাবা খন্দকার আবুল হোসেন, মা আমিরুন্নেছা। স্ত্রী মমতাজ বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৩। শহীদ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। পাশাপাশি চলছে ঝোড়ো বাতাসের দাপট। এর মধ্যেই নৌকাযোগে নদী পার হলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তাঁদের বেশির ভাগই ইপিআর সদস্য। একটি কোম্পানির নেতৃত্বে সুবেদার ফজলুর রহমান খন্দকার। আর তাঁদের সবার নেতৃত্বে সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান।

নদী পার হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পার হতে হলো আরও একটি বড় খাল। খালের ওপারেই পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। সুবেদার ফজলুর রহমান ও তাঁর সঙ্গীরা নিঃশব্দে দ্রুত জায়গামতো অবস্থান নেন। এদিকে দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। সেই আলোয় অদূরে দেখা গেল পাকিস্তানি সেনাদের। তারা কিছু টের পেল না। তাদের লক্ষ্য করে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফায়ার ওপেন করলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ চালালেন। সারা দিন চলল যুদ্ধ। অব্যাহত গোলাগুলির মধ্যে ফজলুর রহমান সন্ধ্যার আগেই তাঁর দলবল নিয়ে এগিয়ে গেলেন পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের খুব কাছাকাছি। আকস্মিক এ ঘটনায় পাকিস্তানি সেনাদের একেবারে দিশেহারা দশা। মুক্তিযোদ্ধাদের ধাবমান এ দলের গতি রোধ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। মুক্তিযোদ্ধারা তখন জোর কদমে সামনের দিকে ধাবমান। এ সময় শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষ থেকে তীব্র গোলাবৃষ্টি। ফজলুর রহমান খুব কষ্টে তাঁর দলকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের বিপুল সমরসজ্জা এবং তাদের জোরদার আক্রমণের সামনে টিকে থাকা তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ল। তার পরও তিনি ও তাঁর অন্য সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে হঠাৎ তিনি পাকিস্তানি সেনাদের নিক্ষিপ্ত গোলার টুকরোর আঘাতে গুরুতর আহত হলেন। তার পরও তিনি লড়াই করে চললেন। কিন্তু একটু পরই নিভে গেল তাঁর জীবনপ্রদীপ। সত্যিকারের একজন বীরের মতো লড়াই করেই শহীদ হলেন তিনি।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের। ঘটেছিল লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায়। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প। তিন দিনের এ যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় পাকিস্তানি সেনাদের। মুক্তিবাহিনীর আরও ছয়জন শহীদ এবং ৩০ জন আহত হন। ফজলুর রহমান খন্দকারসহ অন্য যোদ্ধাদের সমাহিত করা হয় হাতীবান্ধা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে।

ফজলুর রহমান খন্দকার ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রংপুর ইপিআর উইংয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর এবং পরে পাটগ্রাম সাব-সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

ফয়েজ আহমদ, বীর উত্তম

গ্রাম অলকা, পরশুরাম, ফেনী। বাবা জাবেদ আলী।
স্ত্রী জাহানারা বেগম।
তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩০।
শহীদ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় দল সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজসংলগ্ন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানের মুখোমুখি প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ছিল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারটি কোম্পানি—ব্রাভো, ডেলটা, আলফা ও চার্লি। আরও ছিলেন গণবাহিনীর বেশ কিছু সদস্য। ব্রাভো কোম্পানিতে ছিলেন সুবেদার ফয়েজ আহমদ। ডেলটা কোম্পানি প্রথমে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সেনারাও মর্টারের সাহায্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের গোলা শেষ হয়ে যায়। তার পরও তাঁরা কয়েকটি মেশিনগান, হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্র দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। পরে মিত্রবাহিনীর বিমান আকাশ থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে হামলা চালালে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

সেদিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাদের শতাধিক সেনা নিহত এবং অসংখ্য আহত হয়। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্রাভো ও ডেলটা কোম্পানির ২০ জন সদস্য শহীদ এবং ২৪-২৫ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে সুবেদার ফয়েজ আহমদও ছিলেন। তিনি অসীম সাহস ও রণকৌশল দেখিয়ে শহীদ হন।

ফয়েজ আহমদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার ছিলেন। যশোর সেনানিবাসে কর্মরত থাকা অবস্থায় ২৯ মার্চ তাঁদের রেজিমেন্ট পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আক্রান্ত হয়। এরপর তিনি ভারতে চলে যান। অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধে।

বদরুল আলম, বীর উত্তম

১২১ মিরপুর রোড, ঢাকা। বাবা খন্দকার মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, মা মোসনে আরা বেগম। স্ত্রী নাদেরা আলম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬২।

AMARBOI.COM

গভীর রাতে ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা ডিম্যাপুর থেকে উড্ডয়ন করল একটি হেলিকপ্টার। সেটি চালাচ্ছেন বদরুল আলম, সুলতান মাহমুদ (বীর উত্তম) ও সাহাবউদ্দিন আহমেদ (বীর উত্তম)। তাঁদের সঙ্গে আছেন আরও দুজন। তাঁরা অপারেটর। হেলিকপ্টারটি ছোট আকৃতির। নাম অ্যালুয়েট। এতে আছে ১৪টি রকেট ও একটি মেশিনগান। তাঁরা যাচ্ছেন নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল অভিমুখে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বরের ঘটনা এটি।

হেলিকপ্টারটির রাতে ওড়ার ক্ষমতা ছিল না। তার পরও ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা অপারেশনে রওনা হয়েছেন। তাঁদের লক্ষ্য, গোদনাইলের তেলের ডিপো। এই ডিপো থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর স্থল, নৌ ও আকাশযানগুলোর জন্য জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে পাকিস্তানি সেনারা এখানে মজুদ রেখেছিল বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা অনেক চেষ্টা করেও এই ডিপোর ক্ষতিসাধন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, এর নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল অনেক শক্তিশালী।

সেদিন পাকিস্তানি সেনাদের শক্তিশালী নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে সফল হামলা চালান বদরুল আলম ও তাঁর সহযোদ্ধারা। তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে ইলিয়টগঞ্জ থেকে প্রথমে কুমিল্লা-ঢাকা মহাসড়ক লক্ষ্য করে দাউদকান্দির দিকে অগ্রসর হন। পরে ঢাকার ডেমরার কাছে এসে গোদনাইল তেলের ডিপো লক্ষ্য করে দক্ষিণ দিকে মোড় নেন। পাকিস্তানি সেনারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁরা গোদনাইলের তেলের ট্যাংকারের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। মুহূর্তের মধ্যে ট্যাংকারগুলো একের পর এক বিস্ফোরিত হয়। আগুনের লেলিহান শিখা উঠে যায় আকাশে। চারদিক আলোকিত হয়ে পড়ে। আশপাশের মানুষ বিস্ফোরণের শব্দে জেগে উঠে অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে সেই আগুন। গোদনাইল তেলের ডিপোর আগুন জ্বলে পরের দিনও। কয়েক মাইল দূর থেকেও এই আগুন দেখা যায়।

বদরুল আলম পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে ছিলেন। তাঁর পদবি ছিল ফ্লাইং অফিসার। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের সারগোদা বিমানঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন। নিজের ইচ্ছায় বদলি হয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মে মাসের প্রথমার্ধে ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে যান। প্রথম দিকে তিনি মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করেন। মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং গঠিত হলে তিনি এতে যোগ দেন। বিমানবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় বৈমানিক ও এয়ারম্যান রিক্রুট ও তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নভেম্বরে প্রত্যক্ষ অপারেশন শুরু করেন। তিনি গোদনাইল ছাড়াও আখাউড়া, সিলেট, নরসিংদীর রায়পুরাসহ কয়েকটি স্থানে বিমান অপারেশন করেন। এসব হামলার বেশির ভাগ তাঁর কমান্ডেই পরিচালিত হয়।

AMARBOI.COM

বদিউল আলম, বীর উত্তম

গ্রাম রা[illegible], গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা। বর্তমান ঠিকানা ৪৪ [illegible], সেকশন ১১, পল্লবী, ঢাকা। বাবা মোজাম্মেল হক সরকার, মা রাবেয়া খাতুন। স্ত্রী শাহনাজ কাওছার। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে।

খেতাবের সনদ নম্বর ৫৩।

প্রথমে বিকট একটি শব্দ। দুই থেকে তিন মিনিট পর আরেকটি। তারপর একসঙ্গে তিনটি। এরপর শুরু হলো খই ফোটার মতো বিস্ফোরণ। নৌবন্দর থেকে নদীর মোহনা পর্যন্ত এলাকার জলভাগে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেল। বিস্ফোরণের গগনবিদারী শব্দে বন্দরসংলগ্ন শহর কয়েকবার কেঁপে উঠল। সেই শব্দে বন্দর ও জাহাজের ডেকে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল অস্থির ছোটাছুটি, হুলুস্থুল কাণ্ড। একটু পর একে একে ডুবতে থাকল মাইন লাগানো জাহাজ-বার্জগুলো। ডুবন্ত জাহাজের ডেক থেকে ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সেনা ও নাবিকেরা এলোমেলোভাবে গুলি চালাতে চালাতে লাফিয়ে পড়তে থাকল নদীতে। মুহূর্তে কী ঘটে গেল, এখন কী করা উচিত—ভেবে দেখার সময় নেই কারও। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটি জাহাজ-বার্জ প্রচণ্ড শব্দ তুলে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ডুবে গেল।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্টের খুব ভোরের। ঘটেছিল চাঁদপুর নৌবন্দরে।

১৫ আগস্টের গভীর রাত। চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। কোথাও জনমানুষের সাড়া নেই। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চাঁদপুর শহরের কাছে একটি বাড়ি। বাড়ির মালিক করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খান। তাঁর বাড়িতে ১৩ আগস্ট রাত থেকে আত্মগোপন করে আছে মুক্তিবাহিনীর ২০ জনের একটি দল। তাঁদের সবাই নৌ-কমান্ডো। দলনেতার নাম বদিউল আলম। সময়মতো এ বাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা। প্রত্যেকের বুকে বাঁধা লিমপেট মাইন। কোমরে ড্যাগার। তাঁরা এগিয়ে চলেছেন মেঘনা-ডাকাতিয়া নদীর মোহনার দিকে।

তাঁদের টার্গেট ছয়টি জাহাজ, পন্টুন ও বার্জ। সেগুলো মাইন দিয়ে ধ্বংস করে দিতে হবে। দলনেতা বদিউল আলম ১৮ জনকে মোট ছয়টি দলে ভাগ করে প্রতিটি টার্গেটে আঘাত হানার জন্য তিনজনকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। বাকি দুজন নদীর তীরে থাকবেন।

বদিউল আলমের নেতৃত্বে কমান্ডোরা যথাসময়ে নেমে পড়েন বন্দরসংলগ্ন নদীতে। বর্ষাকাল বলে মেঘনার মোহনার তখন ভয়ংকর রূপ। অথই পানি, প্রবল ঢেউ আর স্রোত। এর মধ্যে তাঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে সাঁতরে চলেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানি জাহাজ থেকে অনুসন্ধানী আলো চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে শত্রুর সন্ধান করছে। বিপজ্জনক এক অবস্থা। এর মধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি দল সফলতার সঙ্গে নির্দিষ্ট টার্গেটে মাইন লাগিয়ে ফিরে চলল নিরাপদ স্থানের দিকে। ৪৫ মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরিত হবে মাইনগুলো। এ সময় হঠাৎ দেখা দিল নতুন বিপদ। যেদিক দিয়ে তাঁরা ফিরে যাবেন, সেখানে নোঙর ফেলেছে রকেট স্টিমার সার্ভিসের জাহাজ 'গাজী'। পাকিস্তানি সেনা ও গোলাবারুদ নিয়ে খুলনা থেকে এসেছে জাহাজটি। সেনারা সব জাহাজের ডেকে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাকে অস্ত্র হাতে পাহারারত অবস্থায় দেখা গেল। জাহাজটি অন্ধকারে প্রেতচ্ছায়ার মতো নদীর পাড় ঘেঁষে ভেসে আছে পানির ওপর। এই জাহাজ দেখে তাঁরা চমকে উঠলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। যাওয়ার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাইনের বিস্ফোরণ ঘটবে। রাতও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় প্রথম দলটি দ্রুত একটি বার্জের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। এই বার্জে মাইন লাগানো হয়নি। অন্যরাও তাঁদের মতোই সেখানে লুকিয়ে পড়লেন।

এই অপারেশনে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো বদিউল আলম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭১ সালে বদিউল আলম ফ্রান্সের তুলঁ নৌঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। এই প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তান থেকে গিয়েছিলেন ৫৭ জন সাবমেরিন সেনা। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন ছিলেন বাঙালি। ৩০ মার্চ নয়জন বাঙালি সাবমেরিন সেনা পালিয়ে যান। পরে তাঁদের আটজন ভারতে আসেন। এরপর তাঁরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বদিউল আলম পরে মংলা ও চালনা বন্দর অপারেশনে অংশ নেন।

বদিউল আলম স্বাধীনতার পর ব্রিটিশ হাইকমিশন ও পরে জনতা ব্যাংকে চাকরি করেন। অবসর নেন ২০০৪ সালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঈনুল হোসেন, বীর উত্তম

গ্রাম কুসুমপুর, ইউনিয়ন ভারেল্লা, বুড়িচং, কুমিল্লা।
বাবা কালা মিয়া, মা সুফিয়া খাতুন। স্ত্রী সালেহা খাতুন।
তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩২।
শহীদ ২০ অক্টোবর ১৯৭১।

রমজান মাস। মঈনুল হোসেনসহ আটজন মুক্তিযোদ্ধা রাতে আগেভাগে সেহ্‌রি খেয়ে নিলেন। তারপর নিজেদের গোপন শিবির থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে আছেন মঈনুল হোসেন। পূর্বপরিকল্পনামতো তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক প্রতিরক্ষা অবস্থানে মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ করবেন। তাই রাতের অন্ধকারে দ্রুত এগিয়ে চললেন সেদিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার আগে তাঁরা নিজেরাই পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের মুখে পড়লেন। অতর্কিত প্রচণ্ড মর্টার আক্রমণে থমকে গেল তাঁদের অগ্রযাত্রা। বিপর্যস্ত অবস্থা তাঁদের। প্রাথমিক হকচকিত অবস্থা কাটিয়ে পাল্টা আক্রমণ করার আগেই দুই সহযোদ্ধাসহ মঈনুল হোসেন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়লেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁর চোখের সামনেই দুই সহযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে এবং তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর তাঁর ওপর শুরু হলো নিষ্ঠুর নির্যাতন। সেই নির্যাতনের মুখেও তিনি পাকিস্তানি সেনাদের কোনো তথ্য দিলেন না। পরে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকেও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হত্যা করে।

এ ঘটনা ২০ অক্টোবর ১৯৭১ সালের। ঘটেছিল কাইয়ুমপুরে। কাইয়ুমপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার অন্তর্গত। ক্যাপ্টেন এ এইচ এম আবদুল গাফফারের (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) নির্দেশে তাঁরা সেখানে অপারেশনে গিয়েছিলেন। কিন্তু গুপ্তচরের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ খবর আগেই পেয়ে যায় এবং পাল্টা অ্যামবুশ করে।

AMARBOI.COM

মঈনুল ও তাঁর দুজন সঙ্গীকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে ফেলার পর সুবেদার আম্বিয়া ওয়্যারলেসে ওই বিপর্যয়ের কথা ক্যাপ্টেন এ এইচ এম আবদুল গাফফারকে জানান। ক্যাপ্টেন তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্লাটুন নিয়ে শত্রুদের পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দেন। সুবেদার আম্বিয়া নির্দেশমতো তাঁর প্লাটুন নিয়ে শত্রুদের ধাওয়া করেন। ফলে শত্রুরা সেখানে নায়েক সুবেদার মঈনুলকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেরে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। সহযোদ্ধারা তাঁকে মুক্ত এলাকায় এনে সামরিক রীতিতে সম্মান জানিয়ে সমাহিত করেন।

মঈনুল হোসেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর ইউনিটের সঙ্গে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের মন্দভাগ সাব-সেক্টরে। কয়েকটি গেরিলাযুদ্ধে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য ও বীরত্ব দেখান। সালদা নদী, বুড়িচং ও কসবায় আকস্মিক আক্রমণ ও অ্যামবুশ করে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপুল ক্ষতি সাধন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজিবুর রহমান, বীর উত্তম

গ্রাম পাচুরিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল। বাবা দলিল উদ্দিন সরদার, মা রেকজান বিবি। স্ত্রী জোবেদা খাতুন। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৪।
শহীদ ২৪ এপ্রিল ১৯৭১।

ভোর থেকেই শুরু হয়েছে প্রচণ্ড যুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করেছে। মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী দল পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করছে প্রাণপণে। এ সময় খবর এল, অগ্রবর্তী দলের গোলাবারুদ প্রায় শেষ। সেখানে দ্রুত গোলাবারুদ পৌঁছে দিতে না পারলে তাঁদের বেশির ভাগই মারা পড়বেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অব্যাহত আক্রমণ ও প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে সেখানে গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়াটা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ একটা ব্যাপার। এই কঠিন কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলেন মজিবুর রহমান। গোলাবারুদভর্তি একটি গাড়ি নিয়ে তিনি রওনা হলেন মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের অবস্থানের উদ্দেশে। তাঁর সঙ্গে মাত্র একজন সঙ্গী। অগ্রবর্তী অবস্থানে গিয়ে প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে কয়েকটি বাংকারে পৌঁছে দিলেন গোলাবারুদ। শেষবার একটি মেশিনগান পোস্টে গিয়ে দেখেন, গানম্যান গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছেন। মেশিনগানের পাশেই পড়ে আছে তাঁর নিথর দেহ। রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা। সেখানকার সহযোদ্ধা দুজন নেই। তাঁরা মেশিনগানের লক খুলে তা অকেজো অবস্থায় রেখে চলে গেছেন।

মজিবুর রহমান তাঁর সঙ্গীকে বললেন পাশের বাংকার থেকে একটি লক আনতে। তারপর তিনি নিজেই অবস্থান নিলেন সেই বাংকারে। সঙ্গী ফিরে আসছেন না দেখে আবার উঠে নিজেই গেলেন সেখানে। সঙ্গী ও লকসহ এসে অচল সেই মেশিনগান সচল করলেন। আর ঠিক তখনই গুলি করতে করতে বাংকারের কাছাকাছি এসে পড়ল একদল পাকিস্তানি সেনা। চোখের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলেন তাঁর সঙ্গী। ক্ষিপ্রগতিতে মেশিনগান থেকে গুলি ছোড়া শুরু করলেন তিনি। গুলিতে হতাহত হলো বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল মেশিনগানের গুলি। মেশিনগানের শূন্য বেল্টে গুলি ভরার জন্য প্রয়োজন হয় কমপক্ষে দুজন সাহায্যকারীর। তাঁর কাছে তখন একজন সাহায্যকারীও নেই। এদিকে পাকিস্তানি সেনারা একদম কাছে এসে পড়েছে। এ সময় পেছনে থাকা একজন সহযোদ্ধা তাঁকে বারবার পেছনে চলে যাওয়ার কথা বলতে থাকেন। তখন মজিবুর রহমান ওই সহযোদ্ধাকে বললেন, 'মজিবুর রহমান পিছু হটতে জানে না।' এরপর তিনি কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তল বের করে গুলি করতে থাকেন। একসময় তাঁর পিস্তলের গুলিও শেষ হয়ে যায়। এরপর খালি হাতেই 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন এক পাকিস্তানি সেনার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের এক ঝাঁক গুলি এসে বিদ্ধ হয় তাঁর দেহে। ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাঁর বুক।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিলের। ঘটেছিল যশোরের শার্শা উপজেলার কাগজপুকুরে। মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সদর দপ্তর ছিল কাগজপুকুরের পার্শ্ববর্তী বেনাপোলে। ২৩ এপ্রিল সকালে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাজউদ্দীন আহমদ বেনাপোলে মুক্তিবাহিনীর দপ্তর পরিদর্শনে আসেন। সেখানে ব্রিটিশ এমপি ডগলাসম্যান তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এর পরপরই পাকিস্তানি সেনারা সেখানে আক্রমণ শুরু করে। ২৩ ও ২৪ এপ্রিল বেনাপোল ও কাগজপুকুরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুক্তিবাহিনীর মজিবুর রহমানসহ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন।

মজিবুর রহমান ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর সেক্টরের অধীন চুয়াডাঙ্গা ৪ উইংয়ে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে চুয়াডাঙ্গা ইপিআর উইংয়ের বাঙালি অধিনায়ক মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর (পরে লে. কর্নেল) নেতৃত্বে যুদ্ধে যোগ দেন।

মতিউর রহমান, বীর উত্তম

গ্রাম রঘুনাথপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা বঙ্গবন্ধু কলোনিসংলগ্ন এলাকা, পৌরসভা, লালমনিরহাট। বাবা জয়নুদ্দীন ডাক্তার, মা জমিলা বেগম। স্ত্রী আমেনা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৬। মৃত্যু ১৯৯৬।

মতিউর রহমান ১৯৭১ সালে ঢাকায় বেবিট্যাক্সি চালাতেন। তখন তাঁর বয়স ২১-২২। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের আগরতলায় গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁকে নৌ-কমান্ডো বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে বেশ কয়েকটি নৌ-অপারেশনে অংশ নেন তিনি। তাঁর প্রথম গেরিলা তৎপরতা অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে। একাত্তরের ১৫-১৬ আগস্ট মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ পাওয়া নৌ-কমান্ডোরা পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রবন্দর ও প্রধান প্রধান নদীবন্দরে একযোগে যে অপারেশন করেন, সেটিই 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে খ্যাত। এটা ছিল খুব বড় অপারেশন। এ অপারেশনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পাকিস্তানসহ বিশ্বকে হতভম্ব করে দেয়। পৃথিবীর প্রায় সব প্রচারমাধ্যম এ ঘটনা ফলাও করে প্রচার করে।

অপারেশনের চূড়ান্ত তারিখ ছিল ১৫ আগস্ট পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে। মতিউর রহমান অংশ নেন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি ফেরিঘাট আক্রমণে। এ অপারেশনে তাঁরা অংশ নেন মোট নয়জন। তাঁদের দলনেতা ছিলেন শাহজাহান সিদ্দিকী (বীর বিক্রম)। সহ-দলনেতা তিনি। আগস্ট মাসের ১১-১২ তারিখে সীমান্ত অতিক্রম করে তাঁরা বাংলাদেশে আসেন। অপারেশন করার কথা ১৫ আগস্ট। সেদিন দাউদকান্দি এলাকায় ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি হয়। তাঁদের গাইড অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে অপারেশন স্থগিত রাখতে হয়। পরদিন ১৬ আগস্ট মধ্যরাতে তাঁরা দাউদকান্দি ফেরিঘাটের ফেরি ও পন্টুনে লিমপেট মাইন লাগান। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মতিউর রহমান। ফেরিঘাটে প্রহরায় ছিল পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় সহযোগী রাজাকাররা। তারা টেরই পায়নি। মাইন লাগানোর পর মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত চলে যান নিরাপদ অবস্থানে। রাত পৌনে তিনটায় চারদিক প্রকম্পিত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একের পর এক নয়টি লিমপেট মাইন বিস্ফোরিত হয়। মাইন বিস্ফোরণের বিকট শব্দ ও পাকিস্তানি সেনাদের অবিরাম গুলিবর্ষণে ২৫ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। দু-তিন দিন পর নৌ-কমান্ডোরা ভারতের আগরতলায় চলে যান।

পরবর্তী সময়ে মতিউর রহমান বরিশাল বন্দর ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি অপারেশন করেন। এর মধ্যে বরিশালের অপারেশন ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। তিনিই ছিলেন দলনেতা। ২৫-২৬ অক্টোবর সফলতার সঙ্গে এ অপারেশন সম্পন্ন করেন। তিনটি জাহাজ লিমপেট মাইনের সাহায্যে তাঁরা ডুবিয়ে দেন।

বেশির ভাগ অপারেশনে তিনি অসাধারণ দক্ষতা, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী একজন নৌ-কমান্ডো। যুদ্ধের পর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, জানানো যায়নি খেতাব পাওয়ার খবর। তাঁর খবর পাওয়ার পর জানা যায় তিনি আর বেঁচে নেই।

মো. জালাল উদ্দীন, বীর উত্তম

গ্রাম পলাশবাড়িয়া, ইউনিয়ন নহাটা, মহম্মদপুর, মাগুরা। বর্তমান ঠিকানা সদর, মাগুরা। বাবা ইসমাইল মোল্লা, মা বরু বিবি, স্ত্রী শিরিন জালাল। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫১।

AMARBOI.COM

মো. জালাল উদ্দীনসহ কয়েকজন নৌ-কমান্ডো বাংলাদেশের ভেতরে গোপন আশ্রয়স্থলে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছেন। এ সময় সেই আশ্রয়স্থলের অদূরে বয়ে যাওয়া নদী থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের ভটভট শব্দ। গ্রামবাসী কয়েকজন দৌড়ে এসে খবর দিলেন, নদীতে দুটি জাহাজ আসতে দেখা যাচ্ছে। নৌ-কমান্ডোদের বুঝতে বাকি থাকল না, ওগুলো আর কিছু নয় পাকিস্তানি গানবোট। খাবার রেখে তাঁরা উঠে পড়লেন। বেশ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত তাঁরা। শক্তিবলও সামান্য। দলটি মাত্র ১২ জনের। অস্ত্র বলতে একটি এলএমজি, পাঁচটি এসএমজি ও ছয়টি এসএলআর। তার পরও তাঁরা সাহসী এক সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি ওই গানবোট আক্রমণ চালানোর। এরপর তাঁরা দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গ্রামবাসীকে বললেন নিরাপদ অবস্থানে থাকতে। নৌ-কমান্ডোরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে নদীর তীরে বাঁধে অবস্থান নিলেন। গানবোট দুটির প্রথমটি বেশ এগিয়ে। দ্বিতীয়টি কিছুটা দূরে। প্রথম গানবোটটি নৌ-কমান্ডোদের নাগালের মধ্যে আসামাত্র গর্জে উঠল তাঁদের সবার অস্ত্র। গানবোটের সামনের গানার গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। আহত হলো আরও কয়েকজন। অক্ষত নৌসেনারা ছোটাছুটি করতে থাকল। ভীতসন্ত্রস্ত ক্যাপ্টেন গানবোটের গতি বাড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে গেল। দ্বিতীয় গানবোট থেকে গোলাবর্ষণ হতে লাগল। নৌ-কমান্ডোরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সেই আক্রমণ অনেকক্ষণ ধরে মোকাবিলা করলেন। মো. জালাল উদ্দীন এ যুদ্ধে অসীম সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখান। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের। ঘটেছিল হরিনগরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিনগর সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার অন্তর্গত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা। অপারেশন জ্যাকপটের আওতায় মংলা ও হিরণ পয়েন্টে নৌ-অপারেশনে অংশ নেওয়ার জন্য আগস্টে ৬০ জন নৌ-কমান্ডো ভারত থেকে কয়রা থানার বেদকাশীতে আসেন। সেখান থেকে ১২ জন নৌ-কমান্ডো হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে হিরণ পয়েন্টে অভিযানের জন্য রওনা হন। এই দলে ছিলেন মো. জালাল উদ্দীন। তাঁদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দীন (পরে মেজর)। তিনি তাঁদের হিরণ পয়েন্টে না পাঠিয়ে বরিশালের রাজাপুরে নিয়ে যান। ফলে অপারেশন জ্যাকপটের আওতায় হিরণ পয়েন্ট অভিযান ব্যর্থ হয়। জিয়াউদ্দীন নৌ-কমান্ডো দলকে রাজাপুরে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়ে রাখেন। এতে নৌ-কমান্ডোদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বিশেষত, মো. জালাল উদ্দীন দলনেতাকে কয়েকবার এভাবে সময় নষ্ট না করে কিছু একটা করার জন্য বলেন। এরপর সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে একদিন তাঁরা যুদ্ধের সরঞ্জাম ও নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোনো পথপ্রদর্শক ছাড়াই ভারতের উদ্দেশে রওনা হন। বহু কষ্টে তাঁরা সীমান্তবর্তী হরিনগরে পৌঁছান। ১৮ সেপ্টেম্বর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত নৌ-কমান্ডোরা শিকারি পচাব্দী গাজীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। পচাব্দী গাজীর বাড়ির পাশ দিয়েই ছিল নদী। ওই নদীপথেই পাকিস্তানি গানবোট তাদের কৈখালী বিওপিসহ অন্যান্য ঘাঁটিতে রসদ ও রেশনসামগ্রী পৌঁছে দিত। সেদিন দুটি পাকিস্তানি গানবোট ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। তখন নৌ-কমান্ডোরা ওই গানবোটে আক্রমণ করেন।

মো. জালাল উদ্দীন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন যুদ্ধে। পরে ভারতে যান। মে মাসে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে 'অপারেশন হটপ্যান্টস' অভিযানেও (৭-১০ ডিসেম্বর) তিনি অংশ নেন। ১০ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর বিমান ভুলক্রমে তাঁদের গানবোটে বোমা ফেলে। এতে তাঁদের গানবোট ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি সামান্য আহত হন।

AMARBOI.COM

মো. শাহ আলম, বীর উত্তম

গ্রাম করমুল্লাপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
বাবা মো. আলী আহম্মদ চৌধুরী, মা জমিলা খাতুন।
স্ত্রী নাদিরা আলম। তাঁদের এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫৭। মৃত্যু ১৯৮৫।

মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোরা নির্ধারিত তারিখে বন্দরে অবস্থানরত জাহাজ মাইনের সাহায্যে ডুবিয়ে দেবেন। এ জন্য অপারেশনের আগে দিনে বন্দর ও আশপাশের এলাকা সরেজমিনে রেকি করা প্রয়োজন। দায়িত্বটা বেশ কঠিন। রেকিতে ভুল হলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। নৌ-কমান্ডোদের একটি দলের দলনেতা মো. শাহ আলম সিদ্ধান্ত নিলেন, এ দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেন। দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে তিনি গোটা অপারেশন সফল করেন। ঘটনার আকস্মিকতায় পাকিস্তানি সেনারা হকচকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অন্যদিকে সারা বিশ্বে এ ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করল। ১৯৭১ সালের মধ্য আগস্টে এ ঘটনা ঘটেছিল চট্টগ্রামে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' ঐতিহাসিক এক ঘটনা। ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো অভিযান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নতুন মাত্রা এবং বহির্বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এর আওতায় চট্টগ্রাম বন্দরে অভিযানের জন্য তিনটি দলের সমন্বয়ে কমান্ডো দল গঠন করা হয়। একটি দলের দায়িত্ব পান মো. শাহ আলম। এই অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁরা ভারতের পলাশি প্রশিক্ষণ ঘাঁটি থেকে ২ আগস্ট চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা হন। কথা ছিল, ১৩ ও ১৪ আগস্ট আকাশবাণী বেতারকেন্দ্র থেকে গানের মাধ্যমে দুটি ঘোষণা দেওয়া হবে। ঘোষণা দুটি শোনার পরই কমান্ডোরা অপারেশন করবেন। ঘোষণা দুটির প্রথমটি হলো পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া একটি গান 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান'। এ গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডোরা অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে থাকবেন। দ্বিতীয় ঘোষণা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি'। এ গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডোরা প্রস্তুতি শেষ করে ওই দিন মধ্যরাতে পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন অপারেশন করবেন। এ সংকেত শুধু সমন্বয়ক ও দলনেতাই জানতেন, অন্য কেউ জানতেন না।

নৌ-কমান্ডোরা আগরতলা হয়ে ৮ আগস্ট ১ নম্বর সেক্টরের হরিণা ক্যাম্পে পৌছান। সেদিন রাতেই তাঁরা বাংলাদেশে ঢোকেন। নৌকাযোগে ও হেঁটে ১৩ আগস্ট তাঁরা চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে পৌছান। পরে শহরের ভেতরে বিভিন্ন নিরাপদ বাড়িতে আশ্রয় নেন। হরিণা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আসার পথ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক।

চট্টগ্রাম শহরের সবুজবাগ হোটেলটি ছিল নৌ-কমান্ডোদের সম্মিলন কেন্দ্র। অপারেশনের আগে চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান, তাদের গতিবিধি, বন্দরে থাকা জাহাজের সংখ্যা, [illegible]রাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে জানা এবং কর্ণফুলীর টাইটাল চার্ট সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তখন এটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। কাজটি মো. শাহ আলম দক্ষতার সঙ্গে করেন।

১৫ আগস্ট মধ্যরাতে (ঘড়ির কাঁটা অনুসারে তখন ১৬ আগস্ট) নৌ-কমান্ডোরা সাফল্যের সঙ্গে অপারেশন শেষ করেন। এতে ১০টি টার্গেট সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস বা নিমজ্জিত হয়। এগুলো ছিল জাহাজ, গানবোট, বার্জ ও পন্টুন। চট্টগ্রাম বন্দরে পরিচালিত ভয়াবহ অপারেশনটির খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এ ঘটনা ফলাও করে প্রচার করে।

মো. শাহ আলম ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এতে যোগ দেন। পরে ভারতে গিয়ে নৌ-কমান্ডো বাহিনীতে যোগ দেন।

তিনি বসবাস করতেন চট্টগ্রাম মহানগরে। স্বাধীনতার পর এমবিবিএস পাস করে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন, বীর উত্তম

দক্ষিণ-পশ্চিম আসকর দিঘির পাড়, ১৮ জামাল খান লেন, চট্টগ্রাম। বাবা মোহাম্মদ কাশেম, মা মজিদা খাতুন। স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২১।

মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রাওয়ালপিন্ডিতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেল হেডকোয়ার্টারে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর শুনে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

২১ জুলাই তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার পর আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে।

মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীনের প্রথম কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের, বিশেষ করে প্লাটুন ও সেকশন কমান্ডারদের মনোবল, সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানো। তাঁদের মনোবল ও সাহস ফিরিয়ে আনতে তিনি নতুন কৌশল প্রয়োগ করেন। শুধু প্লাটুন ও সেকশন কমান্ডারদের সমন্বয়ে ক্ষুদ্র দল করে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কামালপুরেই হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতিতে বেশ কটি অপারেশন চালান। সব অপারেশনেই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকেন এবং নেতৃত্ব দেন। বেশির ভাগ অপারেশনই সফল এবং এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কিছু ক্ষয়ক্ষতিও হয়। পরবর্তী সময়ে এসব যোদ্ধাই তাঁর নেতৃত্বে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে ধলই বিওপি, কানাইঘাট ও এমসি কলেজের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

যে কটি যুদ্ধ বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়ের পটভূমি তৈরি করে, তার মধ্যে ধলই ও কানাইঘাটের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ২৮ অক্টোবর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে ধলইয়ে আক্রমণ করে। পাঁচ দিনের টানা যুদ্ধে ধলই মুক্ত হয়। এর পর আটগ্রাম-চারগ্রাম ও কানাইঘাটে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের মুখোমুখি হন। কানাইঘাটের গৌরীপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে জিয়াউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ২৬ নভেম্বর ভোরে তাঁর বাহিনীর একাংশের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। এতে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানি নাজুক অবস্থায় পড়ে। কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব শহীদ হন।

কানাইঘাট যুদ্ধে বিজয় মুক্তিবাহিনীর সিলেট বিজয় ত্বরান্বিত করে। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পিছিয়ে দরবস্ত ও খাদিমনগরে অবস্থান নেয়। মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানি অবস্থানের মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে অনুপ্রবেশ করে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে যাবেন। কাঁচা রাস্তা, খাল-বিল-হাওরের মধ্য দিয়ে দুর্গম পথ পেরিয়ে প্রায় এক হাজার ১০০ মুক্তিযোদ্ধা তাঁর নেতৃত্বে ১৩ ডিসেম্বর সিলেট এমসি কলেজে পৌঁছান। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, পথে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় না করে সিলেট শহরের কাছাকাছি পৌঁছে তাদের চমকে দেওয়া। তাঁর এ পরিকল্পনা বেশ কাজ করে। তাঁদের দেখে পাকিস্তানি সেনারা একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে। এমসি কলেজের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিকউদ্দিন চৌধুরী, বীর উত্তম

গ্রাম রণকেলি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। বাবা আবদুল করিম চৌধুরী, মা কামরুননেছা চৌধুরী। স্ত্রী সোনারা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৫। শহীদ ৩১ মার্চ মতান্তরে ১ এপ্রিল ১৯৭১।

শফিকউদ্দিন চৌধুরী চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ৪ নম্বর উইংয়ে। এর সদর দপ্তর ছিল চুয়াডাঙ্গায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। এ সময় বিষয়খালীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতিরোধযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে শহীদ হন শফিকউদ্দিন চৌধুরী।

ঝিনাইদহ জেলার পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে বিষয়খালী। যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এটি। ২৬ মার্চের পর একদল মুক্তিযোদ্ধা (ইপিআর) অবস্থান নেন বিষয়খালীতে। এই দলে ছিলেন শফিকউদ্দিন চৌধুরী। বিষয়খালীর বেগবতী নদীর অপর পাশে ছিল তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থান। নদীর ওপরে ছিল সেতু। ১ এপ্রিল (কারও কারও মতে ৩১ মার্চ) যশোর সেনানিবাস থেকে আসা একদল পাকিস্তানি সেনা তাঁদের আক্রমণ করে। এ সময় অভুক্ত মুক্তিযোদ্ধারা ভাত খাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা খাবার রেখে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। তাঁরা আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত না হয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করতে থাকেন। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সারা দিন যুদ্ধ চলে। দিনব্যাপী যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর শফিকউদ্দিন চৌধুরীসহ চারজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন। অন্যদিকে অনেক পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। বিষয়খালীর যুদ্ধে শফিকউদ্দিন চৌধুরী অসামান্য সাহস ও বীরত্ব দেখান। ২৬ মার্চের পর ওই অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বড় আক্রমণের মুখে এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সামরিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে প্রথম পরাজিত হয়। পরে নতুন আরেক দল পাকিস্তানি সেনা আর্টিলারির সহায়তায় তাঁদের আক্রমণ করে। তখন অব্যাহত গোলাবর্ষণের কারণে তাঁরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরফুদ্দীন আহমেদ, বীর উত্তম

গ্রাম সুলতানপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
বাবা মো. শামসুল আলম, মা হাসিনা আলম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬৬। গেজেটে নাম শরফুদ্দীন।
মৃত্যু ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

ভারতের এক ঘাঁটি থেকে আকাশে উড়ল ছোট একটি অটার বিমান। বিমানটির চালকের আসনে শরফুদ্দীন আহমেদ ও আক্রাম আহমেদ (বীর উত্তম)। আরও আছেন একজন গানার। বিমানে আছে রকেট ও মেশিনগান। স্বল্পগতির বিমানটি সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে এগিয়ে যেতে থাকে লক্ষ্যস্থলের দিকে। শরফুদ্দীন আহমেদ ও আক্রাম আহমেদ যতটা সম্ভব কৌশলে বিমান চালিয়ে যাচ্ছেন। একসময় তাঁরা পৌঁছে গেলেন লক্ষ্যস্থলে। তারপর আকাশের নির্দিষ্ট স্থানে বারবার চক্কর দিয়ে কয়েকটি রকেট ছুড়লেন। একই সময় গানার তাঁর মেশিনগান থেকে বর্ষণ করলেন গুলি। আর নিচে ভূমিতে থাকা পাকিস্তানি সেনারা জীবন বাঁচাতে ছোটাছুটি করতে লাগল। বিস্ফোরিত রকেটের স্প্লিন্টার ও গুলিতে নিহত ও আহত হলো অনেক পাকিস্তানি সেনা। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বরের। ঘটেছিল কুশিয়ারা নদীর তীরে।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল মুক্ত করার জন্য যৌথভাবে অভিযান শুরু করে। তারা সীমান্ত অতিক্রম করে আটগ্রাম-চরখাই-সিলেট, জাফলং-ছোটখেল-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জ-সালুটিকর-সিলেট এবং ছাতক-গোবিন্দগঞ্জ-লামাকাজিঘাট-সিলেট অক্ষ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় পাকিস্তানি সেনারা সীমান্ত এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণ করে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়। তারা মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীকে প্রবল বাধা দিতে থাকে। এতে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পাকিস্তানি অবস্থানে বিমান থেকে হামলার প্রয়োজন হয়। তখন মুক্তিবাহিনীর নবগঠিত বিমান উইং পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর বিমান থেকে হামলা করে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করতে থাকে। কুশিয়ারা নদীর তীরে এক জায়গায় পাকিস্তানি সেনারা বিপুল সেনাসমাবেশ ঘটায়। ওই পথ দিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যোদ্ধারা অগ্রসর হচ্ছিলেন। শরফুদ্দীন আহমেদ ও আক্রাম আহমেদ পাকিস্তানি অবস্থানে হামলা চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। বিমান হামলায় বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। আহতও হয় অনেকে। এরপর পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। সেদিন ওই বিমান হামলা পরিচালনা ছিল যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, স্বল্পগতির অটার বিমানটি যেকোনো সময় পাকিস্তানি সেনাদের মেশিনগানের গুলিতে ভূপাতিত হতে পারত।

শরফুদ্দীন আহমেদ ১৯৬৭ সালে বিমান চালানোর বাণিজ্যিক লাইসেন্স পান। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিভাগে প্ল্যান্ট প্রটেকশন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মে মাসে ভারতে চলে যান। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং গঠিত হলে তাঁকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিমান উইংয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে তিনি অটার বিমান দিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। প্রথম অপারেশনের সুযোগ পান ৫ ডিসেম্বরে। পরে তিনি অটার বিমান দিয়ে ৭ ও ৮ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ চালান।

শামসুজ্জামান, বীর উত্তম

গ্রাম সোনার চর, মেঘনা (সাবেক দাউদকান্দি), কুমিল্লা।
বাবা মো. দৌলত হোসেন, মা আয়েতুন নেছা।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১।
শহীদ ৪ আগস্ট ১৯৭১।

গভীর রাতে অ্যাসেম্বলি এরিয়া থেকে এফইউপিতে এলেন দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা কয়েকটি প্লাটুনে বিভক্ত। একটি প্লাটুনে আছেন শামসুজ্জামান। তিনি গণবাহিনীর সদস্য। তাঁরা সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী একটি ঘাঁটিতে আক্রমণ করবেন। মুক্তিবাহিনীর দুই কোম্পানিতে সেনাসদস্যের সংখ্যা মাত্র ২৪ থেকে ২৫। বাকি সবাই স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত গণবাহিনীর সদস্য। তাঁরা মাত্র ২৮ দিনের ট্রেনিং নিয়েছেন। নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সবাই নিঃশব্দে ফায়ারবেসে অবস্থান নিয়েছেন। অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল) আক্রমণের সংকেত দিলেন। শুরু হলো আর্টিলারি ফায়ার। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের লক্ষ্যের দিকে এগোতে লাগলেন। পাকিস্তানি সেনারাও বসে থাকল না। তাদের দিক থেকেও শুরু হলো পাল্টা আর্টিলারি ফায়ার। সীমান্তের ওই এলাকাজুড়ে যেন প্রলয় শুরু হয়ে গেল। গোলাগুলিতে গোটা এলাকা হলো প্রকম্পিত। এ ঘটনা ঘটে ১১ নম্বর সেক্টরের অধীন শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার অন্তর্গত নকশী বিওপিতে ১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট ভোরে।

প্রথাগত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে সামনে অগ্রসর হওয়া দুঃসাহসিক কাজ। কখনো ক্রল করে, কখনো দৌড়ে সামনে এগোতে হয়। স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা পেশাদার সেনাদের মতো তা-ই করছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি প্লাটুন অত্যন্ত সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গুলি করতে করতে পাকিস্তানি অবস্থানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এর মধ্যে শামসুজ্জামানও ছিলেন। এ সময় তাঁদের ওপর এসে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত একটি আর্টিলারি গোলা। গোলার টুকরার আঘাতে বেশ কজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। দুই-তিনজনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। কিন্তু শামসুজ্জামানসহ কয়েকজন মনোবল হারালেন না। তাঁদের সাহসিকতা ও বীরত্বের মুখে পাকিস্তানি সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তারা পালিয়ে যেতে থাকে। রণক্ষেত্র নিহত ও আহত সেনাসদস্যে ভরে যায়। তাদের বেশির ভাগই পাকিস্তানি। শামসুজ্জামান তখন বিওপির ৫০ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছেন। হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ভূমিমাইনের আঘাতে তিনি শহীদ হন। এ সময় আহত হন অধিনায়কসহ মুক্তিবাহিনীর আরও অনেকে। বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন সফল হতে পারেননি। শামসুজ্জামানসহ অনেকের লাশ সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করতে পারেননি। যুদ্ধক্ষেত্র পাকিস্তানি সেনাদের অনুকূলে চলে যাওয়ায় তাঁদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়।

শামসুজ্জামান ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে যান। সেখানে তিনি ২৮ দিনের কঠোর প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে জেড ফোর্সের অধীন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শাহে আলম, বীর উত্তম

গ্রাম দিদারুল্লাহ, ইউনিয়ন চরখলিফা, দৌলতখান, ভোলা।
বাবা আরফান আলী, মা মজিদা খাতুন।
স্ত্রী ফাতেমা খানম।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪। শহীদ ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

শাহে আলম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লাখ লাখ লোক মারা যায়। তখন তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। খবর শুনে তিনি ছুটি নিয়ে চলে আসেন নিজ দেশে। এর কিছুদিন পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনারা ভোলা দখল করার পর শাহে আলম তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ৪ নম্বর সেক্টরের অধীনে তিনি সিলেটে যুদ্ধ করেন।

সিলেটের সুরমা নদীর ওপর নির্মিত সেতু দখলের লক্ষ্যে কানাইঘাট এলাকায় ৪ ডিসেম্বর সকাল থেকেই শুরু হয় সম্মুখযুদ্ধ। শাহে আলমের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি সেনারা বাংকার থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকলে শাহে আলম জীবন বাজি রেখে ক্রল করে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং শত্রুসেনাদের ব্যাংকার লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়েন। আর ঠিক তখনই পাকিস্তানি সেনাদের গুলি শাহে আলমের মাথায় লাগে। তাঁর মাথার খুলি উড়ে যায়। তিনি বীরের মতো শহীদ হন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফিল মিয়া, বীর উত্তম

গ্রাম রাজাপুর, ইউনিয়ন উত্তর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা আলতাব আলী, মা সুফিয়া খাতুন। স্ত্রী মনোয়ারা বেগম। খেতাবের সনদ নম্বর ৪২। গেজেটে নাম সাফিল মিন। শহীদ ১ অক্টোবর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে বিয়ে করেন সাফিল মিয়া। বাড়িতে কৃষিকাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। মা-বাবা, ভাইবোন ও নববধূকে রেখে যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। পরে ভারতে গিয়ে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেন। প্রথম দিকে কিছুদিন ২ নম্বর সেক্টরের অধীন সীমান্ত এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ করেন। এরপর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হলে নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর সালদা নদীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে সাফিল মিয়া শহীদ হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা থানার অন্তর্গত নদী সালদা। ১৯৭১ সালে সালদা রেলস্টেশন ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। পাকিস্তানি সেনারা সালদা স্টেশন নিয়ন্ত্রণ করত। ওই স্টেশনের পাশের নয়নপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটি। সেখানে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি দল এবং অদূরেই কুটি ও কসবা এলাকায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩৩ বালুচ রেজিমেন্টের অবস্থান। সেপ্টেম্বরের শেষ দিন মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল একযোগে নয়নপুর, সালদা রেলস্টেশন, কসবা, কুটিসহ বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর সালেক চৌধুরী। এই দলে ছিলেন সাফিল মিয়া। তাঁরা সালদা নদী অতিক্রম করে সালদা রেলস্টেশনের পশ্চিমে একটি গোডাউন-সংলগ্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। পাকিস্তানি সেনারাও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে সাফিল মিয়াদের দলের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তেমন সুবিধা করতে পারছিলেন না। তাঁদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। অন্যদিকে নয়নপুরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিবাহিনীর অপর দলের প্রচণ্ড আক্রমণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। এরপর তারা পিছু হটে সালদা রেলস্টেশনের মূল ঘাঁটিতে গিয়ে অবস্থান নেয়। এতে সালদা রেলস্টেশনের পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাশক্তি আরও বেড়ে যায়। নয়নপুর থেকে আসা পাকিস্তানি সেনারা মূল দলের সঙ্গে একত্র হয়ে সাফিল মিয়াদের দলের ওপর তীব্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। ১ অক্টোবর সকাল নয়টার দিকে সাফিল মিয়াদের দলের গোলা শেষ হয়ে যায়। তখন তাঁরা চরম বিপদে পড়েন। ক্রমে মুক্তিবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বাড়তে থাকে। এক জায়গায় সাফিল মিয়াসহ কয়েকজন অবস্থান নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করছিলেন। সাফিল মিয়ার অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশলে মুক্তিবাহিনী চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। একপর্যায়ে একদল পাকিস্তানি সেনা তাঁদের প্রায় ঘেরাও করে ফেলে। পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড গুলির কারণে তাঁদের কেউ মাথা তুলতে পারছিলেন না। ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে সাফিল মিয়াসহ কয়েকজনের শরীরে। সাফিল মিয়া বুক ও হাতে গুলিবিদ্ধ হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। সেদিন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেও মুক্তিবাহিনী সালদা রেলস্টেশন দখল করতে ব্যর্থ হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা পাশের মন্দভাগ এলাকায় পশ্চাদপসরণ করেন। এ যুদ্ধে আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও অনেকে আহত হন। সহযোদ্ধারা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাহিত করেন বাংলাদেশের মাটিতেই, কসবার কুল্লাপাথরে। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সালাহ্উদ্দীন মমতাজ, বীর উত্তম

গ্রাম জগইরগাঁও, ইউনিয়ন পাঁচগাছিয়া, ফেনী সদর।
বাবা শামসুদ্দীন আহম্মদ, মা খায়রুন নাহার। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৪।
শহীদ ৩০ জুলাই ১৯৭১

AMARBOI.COM

১৯৭১ সালের জুলাইয়ে একদিন মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে সিদ্ধান্ত হলো, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কামালপুর বিওপি ঘাঁটিতে আক্রমণ করা হবে। শুরু হলো প্রস্তুতি। আক্রমণের আগে (২৮ জুলাই) রাতে (ক্যাপ্টেন) সালাহ্উদ্দীন মমতাজ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে জায়গাটি রেকি করতে গেলেন। সাড়াশব্দহীন অন্ধকার রাত। অন্ধকারে তিনি একটি পাকিস্তানি পর্যবেক্ষণ চৌকির কাছে গেলে পাকিস্তানি এক সেনা 'হল্ট' বলে চিৎকার দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হয়। অত্যন্ত সাহসী সালাহ্উদ্দীন মমতাজ সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে দেন। এই সুযোগে তাঁর কাছাকাছি থাকা এক যোদ্ধা ওই পাকিস্তানি সেনাকে গুলি করেন। সেখানে ছিল আরেক পাকিস্তানি সেনা। তাকেও তাঁরা গুলি করে হত্যা করেন। এরপর তিনি ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। এ ঘটনায় পাকিস্তানি সেনারা হতবাক ও বিস্মিত হয়। ২৯ জুলাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ কে নিয়াজি কামালপুর পরিদর্শনে যান। তাঁর নির্দেশে পাকিস্তানি সেনারা তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করে।

৩১ জুলাই ছিল আক্রমণের নির্ধারিত তারিখ। ৩০ জুলাই রাতে হঠাৎ শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। ঘোর অন্ধকার ও বৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধারা সময়মতো এফইউপিতে পৌঁছে অ্যাসল্ট ফর্মেশন তৈরি করতে দেরি করে ফেলেন। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেই সালাহ্উদ্দীন মমতাজ অ্যাসল্ট ফর্মেশন তৈরি করে আক্রমণ শুরু করেন। তুলনামূলকভাবে তিনি ছিলেন ক্ষিপ্র। ২৮ জুলাইয়ের পর তাঁর মনোবল ও আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল চাঙা করতে নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা না ভেবে তিনি বিওপির একদম কাছাকাছি গিয়ে মেগাফোনে পাকিস্তানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাদের উদ্দেশ করে বলতে থাকেন, 'আভি তক ওয়াকত হ্যায়, শালালোক সারেন্ডার করো, নেহিত জিন্দা নেহি ছোড়েঙ্গা।'

তাঁর এই সাহসী ভূমিকায় মুক্তিযোদ্ধাদেরও মনোবল বেড়ে যায়। তাঁরা সালাহ্উদ্দীন মমতাজের নেতৃত্বে বীর বিক্রমে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানের প্রায় ভেতরে ঢুকে পড়েন। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরে। তখন প্রথম সারিতে থাকা পাকিস্তানি সেনারা ওই অবস্থান ছেড়ে আন্তঃসীমায় প্রতিরক্ষা অবস্থান (শেল প্রুফ বাংকারে) নেয়। এতে তিনি আরও উৎসাহী হয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং ২০-২৫ জন সহযোদ্ধা নিয়ে কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকে পড়েন। এ সময় অগ্রসরমাণ মুক্তিযোদ্ধারা সালাহ্উদ্দীন মমতাজকে নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দিতে থাকেন। এ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি গোলা এসে পড়ে তাঁর পাশে। মেশিনগানের গুলিও লাগে তাঁর মাথায়। স্তিমিত হয়ে যায় তাঁর তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর। তাঁর শহীদ হওয়ার ঘটনায় কেবল সহযোদ্ধাদের মধ্যেই নয়, গোটা প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দেয় এবং তাঁরা রণাঙ্গন থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করেন। এভাবেই শেষ হয় কামালপুরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ৩০ জন শহীদ ও বিপুলসংখ্যক আহত হন। অসংখ্য পাকিস্তানি সেনাও নিহত হয়।

সালাহ্উদ্দীন মমতাজ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখান থেকে পালিয়ে এসে যোগ দেন যুদ্ধে। তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

AMARBOI.COM

সাহাবউদ্দিন আহমেদ, বীর উত্তম

চর কমলাপুর, জেলা শহর, ফরিদপুর। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি ৩, সড়ক ৩৫ (পুরোনো), গুলশান ১, ঢাকা। বাবা গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মা লাইলী রশিদ। স্ত্রী রোকেয়া নার্গিস। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৪।

আকাশে ভটভট শব্দ। মুক্তিবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার আকাশে চক্কর দিতে দিতে খুব নিচে নেমে আসছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে হেলিকপ্টার থেকে চালানো হচ্ছে আক্রমণ। নিচে থেকে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করেও ছোড়া হচ্ছে গুলি। শোনা যাচ্ছে আর্তনাদ আর চিৎকারের ধ্বনি। চারদিকে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। পাকিস্তানি সেনাদের ছোটাছুটি। তারা চেষ্টা করছে হেলিকপ্টারটি ধ্বংস করতে। তাতে আছেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ, বদরুল আলম ও একজন গানার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বরের। ঘটেছিল নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায়। সেদিন খুব সকালে সেখানে হেলিকপ্টার থেকে ছত্রীসেনা নামায় মিত্রবাহিনী। কিন্তু আশপাশের গোপন আস্তানা থেকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে ছত্রীসেনারা নিশ্চিত বিপর্যয়ের মুখে পড়েন। এ অবস্থায় মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনীর নবগঠিত বিমানবাহিনীর সাহায্য কামনা করে।

খবর পাওয়া মাত্র মুক্তিবাহিনীর বিমানবাহিনীর একটি ইউনিট অস্ত্রসজ্জিত হেলিকপ্টার নিয়ে রায়পুরা অভিমুখে রওনা হয়। সাহাবউদ্দিন আহমেদদের পরিকল্পনা ছিল, তাঁরা দূর থেকে আক্রমণ চালিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের ঝুঁকি নিয়ে বেশি নিচে নেমে আক্রমণ চালাতে হয়। বেশি নিচে নামার কারণে পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষে তাঁদের হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে পাল্টা আক্রমণ চালানো সহজ হয়। কিন্তু সাহাবউদ্দিন আহমেদদের আক্রমণ এত জোরালো ও নিখুঁত ছিল যে সব বাধা উপেক্ষা করে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর সফল অপারেশন চালান। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২০ জন নিহত ও ২৪-২৫ জন আহত হয়। শত্রুপক্ষের বাকি সবাই সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই অপারেশন শেষ করে তাঁরা হেলিকপ্টার নিয়ে নিরাপদে ফিরে যান।

সাহাবউদ্দিন আহমেদ ১০-১১টি অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আরও দুটি অপারেশনে ওই ধরনের বিরূপ অবস্থার মুখে পড়েছিলেন। যেকোনো সময় তাঁর হেলিকপ্টার শত্রুর গুলিতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। প্রায় একই রকমের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন ৬ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারে এবং ৭ ডিসেম্বর সিলেটের শমশেরনগরে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে ওই দুই দিনের অপারেশনে তাঁর হেলিকপ্টার কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

সাহাবউদ্দিন আহমেদ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসে (পিআইএ) কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ৭ এপ্রিল ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নানা সাংগঠনিক কাজ করতে থাকেন। ২৮ সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনীর বিমানবাহিনী গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রথমে তিনি জঙ্গি বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নেন। পরে লোক-সংকটের কারণে তাঁকে হেলিকপ্টার চালনা বিভাগে স্থানান্তর করা হয়। হেলিকপ্টার চালনার মতো পূর্বাভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তবে দিন কয়েকের প্রশিক্ষণে হেলিকপ্টার চালনায় তিনি দক্ষ হয়ে ওঠেন।

২০০৭ সালে বাংলাদেশ বিমানের চাকরি থেকে অবসর নেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল মওলা, বীর উত্তম

গ্রাম নাওপুরা (হাজিবাড়ি), কচুয়া, চাঁদপুর। বাবা ছিদ্দিকুর রহমান, মা জেবুন্নেছা। স্ত্রী নাজমা আক্তার। তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৪। গেজেটে নাম শফিউল মওলা।

ভারতের হলদিয়া নৌবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করল মুক্তিবাহিনীর দুটি জাহাজ 'পদ্মা' ও 'পলাশ'। পলাশ জাহাজে আছেন সিরাজুল মওলা। তিনি জাহাজের সামনের কামানের ক্রুম্যান। তাঁদের লক্ষ্য, খুলনায় পাকিস্তানি নৌঘাঁটি দখল করা। মুক্তিবাহিনীর দুটি জাহাজের সঙ্গে আছে মিত্রবাহিনীর একটি জাহাজ। খুলনার রূপসা নদীতে শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি আসামাত্র ঘটল এক আকস্মিক বিপর্যয়। এ সময় আকাশে দেখা গেল মিত্রবাহিনীর তিনটি জঙ্গি বিমান। চক্কর দিয়ে চলে গেল সাগরের দিকে। তারপর আবার এগিয়ে এল জাহাজগুলো লক্ষ্য করে। হঠাৎ বোমাবর্ষণ করল পদ্মা ও পলাশে। প্রথম ধাক্কাতেই বিধ্বস্ত হলো পদ্মা। পলাশের ইঞ্জিনরুমে জ্বলে উঠল দাউ দাউ আগুন। একটু পর পলাশও ডুবতে থাকল। ডেকে শহীদ নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ পড়ে আছে। আহত মুক্তিযোদ্ধারা কাতরাচ্ছেন মৃত্যুযন্ত্রণায়। গুরুতর আহত সিরাজুল মওলা অনেক কষ্টে উঠে পানিতে ঝাঁপ দিলেন।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরের। জাহাজ দুটি ভারত থেকে রওনা হয় ৭ ডিসেম্বর। সেদিনই দুপুরে খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছে জাহাজ দুটি পৌঁছায়। কিন্তু মিত্রবাহিনীর বিমান পাকিস্তানি সেনাদের জাহাজ ভেবে ভুল করে তাতে বোমাবর্ষণ করে। ফলে দুটি জাহাজেরই সলিলসমাধি হয়। এতে অনেক নৌ-মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও গুরুতর আহত হন। গুরুতর আহত রুহুল আমিন (বীরশ্রেষ্ঠ), সিরাজুল মওলা, আফজাল মিয়া (বীর উত্তম), মো. দৌলত হোসেনসহ (বীর বিক্রম) আরও কয়েকজন সাঁতরে নদীতীরে পৌঁছে যান। সেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক বিপদ। নদীতীরের বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী রাজাকাররা। এ রকমই এক জায়গায় নিরস্ত্র রুহুল আমিনকে রাজাকাররা ধরে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

সিরাজুল মওলা নদীতীরের যে জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম হন, সেখানে তিনি দেখতে পান তাঁর সহযোদ্ধা মো. দৌলত হোসেনকে। গুরুতর আহত দৌলত হোসেন নদীতীরে পড়ে আছেন। দৌলত তাঁকে বলেন, 'আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। সন্তানের মুখটা দেখা হলো না।'

মওলা দৌলত হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। মওলা অতি কষ্টে ক্রল করে আরেকটু সামনে যান। ওখানে গিয়ে দেখা পান তাঁর আরেক সহযোদ্ধা ইসহাককে। তিনি তেমন আহত নন। ইসহাক তাঁকে নিয়ে গেলেন আরেকটু দূরে। এ সময় দুই রাজাকার তাঁদের ধরতে আসে। সংকটময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই মুহূর্তে তাঁরা মনোবল হারালেন না। দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন রাজাকার দুজনকে প্রতিরোধ করবেন। ইসহাক এক রাজাকারের রাইফেল চেপে ধরেন। মওলা ওই রাজাকারের গালে চড় মারেন। তখন দুই রাজাকার অস্ত্র ফেলে সরে যায়। রাইফেল হাতে পেয়ে তাঁরা মনে শক্তি ফিরে পেলেন। কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করা মাত্র রাজাকাররা পালিয়ে গেল। এ সুযোগে তাঁরা দুজন উঠে পড়েন এক নৌকায়। মাঝি তাঁদের নিয়ে যান মিত্রবাহিনীর গানবোটে। পরে তাঁর চিকিৎসা হয় ব্যারাকপুর হাসপাতালে।

সিরাজুল মওলা চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে। ছুটিতে থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিবাহিনীর নৌ উইংয়ে যোগ দেওয়ার আগে মর্টার প্লাটুনের সদস্য হিসেবে স্থলযুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের সালদা নদী, মন্দভাগ, চৌদ্দগ্রাম, মুন্সিরহাটসহ কয়েকটি জায়গায়। এসব যুদ্ধে তাঁর নিখুঁত গোলাবর্ষণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অক্টোবরে মুক্তিবাহিনীর নৌ উইং গঠিত হলে পলাশ গানবোটে তাঁকে গান ক্রুম্যান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর কয়েকটি নৌ অপারেশনে তিনি অংশ নেন।

AMARBOI.COM

হাবিবুর রহমান, বীর উত্তম

গ্রাম মেন্দ, ইউনিয়ন মজলিশপুর, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা মো. আজিজুর রহমান, মা আমেনা খাতুন।
স্ত্রী মেহেরুন্নেছা। তাঁদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩।

রাধানগর সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার (বর্তমানে উপজেলা) অন্তর্গত সীমান্ত এলাকার ছোট একটি বাজার। ১৯৭১ সালে রাধানগরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা অবস্থান। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও টসি ব্যাটালিয়ন।

১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর রাধানগরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে বেপরোয়াভাবে এগিয়ে আসছে একদল পাকিস্তানি সেনা। হাবিবুর রহমান মেশিনগান দিয়ে গুলি করে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনো বাধাই পাকিস্তানি সেনারা মানছে না। এ সময় হাবিবুর রহমানের মেশিনগানের গুলি শেষ হয়ে যায়। তাঁর কাছে শেষ সম্বল চারটি গ্রেনেড। সেগুলো পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে ছুড়ে দেন।

সুবেদার হাবিবের কারণে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। গুলি বন্ধ হয়ে গেলে পাকিস্তানি সেনারা তাঁর অবস্থানের ওপর চড়াও হয়। হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মরক্ষার জন্য তাঁর আর কিছু ছিল না। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে অসংখ্য গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা করে মৃত ভেবে ফেলে চলে যায়। গভীর রাতে গ্রামের মসজিদের ইমাম ওই বাংকারের কাছে এসে অস্ফুট আওয়াজ শুনে উঁকি দিয়ে তাঁকে দেখতে পান। তিনি হাবিবকে উদ্ধার করে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। এ যুদ্ধে ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের কোম্পানি কমান্ডার, একজন লেফটেন্যান্টসহ প্রায় ১৫০ জন শহীদ হন।

হাবিবুর রহমান ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ছাতক, গোয়াইনঘাটসহ কয়েকটি অপারেশনে তিনি অংশ নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীর উত্তম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজুল হক, বীর বিক্রম

গ্রাম সফিপুর, ইউনিয়ন বিনোদপুর, সদর, নোয়াখালী।
বাবা মমতাজ মিয়া, মা জমিলা খাতুন।
স্ত্রী আংকুরের নেছা। তাঁদের তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১০৭। শহীদ ১৯৭১।

১৯৭১ সালে আজিজুল হকের মা-বাবা ও স্ত্রী জানতেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর দলে আছেন। কিন্তু তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জানতেন না, তিনি সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। জানলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। সহযোদ্ধারা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করতে পারেননি। পরিবারের সদস্যরা তাঁর কবর খুঁজে পাননি।

১৯৭৩ সালের গেজেটে খেতাবপ্রাপ্ত বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার ঠিকানা ছিল না। ২০০৪ সালে সরকার ঠিকানাসংবলিত নতুন গেজেট প্রকাশ করে। তখন ৬৬ জন খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওই তালিকায় ছিলেন আজিজুল হক।

মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আজিজুল হক কৃষিকাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে লুৎফর রহমান নিজের চেষ্টায় নোয়াখালীতে আলাদা একটি বাহিনী গঠন করেন। লুৎফর রহমান ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার। মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। আজিজুল হক তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। লুৎফর রহমানের বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতরে থেকেই নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন। বগাদিয়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লুৎফর রহমানের বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকবার সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন। এর কোনো এক যুদ্ধে আজিজুল হক শহীদ হন।

সোনাইমুড়ী উপজেলার দক্ষিণে বগাদিয়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় বগাদিয়া মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বগাদিয়া সেতুর নিচ দিয়ে নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধারা কানকিরহাট হয়ে ভারতে যাওয়া-আসা করতেন। সে জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বগাদিয়ার ওপর কড়া নজর রাখত। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের কড়া নজর উপেক্ষা করে কয়েকবার ওই সেতু ধ্বংস করেন এবং বেশ কয়েকবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহল দলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বেশির ভাগ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীই ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দু-তিনবার মুক্তিযোদ্ধাদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতাহার আলী মল্লিক, বীর বিক্রম

গ্রাম গোপালপুর, ইউনিয়ন চরাদী, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
বাবা কাঞ্চন আলী মল্লিক, মা জামিনা খাতুন।
স্ত্রী ফাতেমা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১২২। শহীদ ২ এপ্রিল ১৯৭১।

সকাল হতেই বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। প্রতিরোধযোদ্ধাদের অবস্থানের আশপাশে বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল পাকিস্তানি সেনাদের নিক্ষিপ্ত গোলা। প্রতিরোধযোদ্ধাদের একজন আতাহার আলী মল্লিক। তাঁরা ঘাপটি মেরে আছেন। পাল্টা জবাব না দেওয়ায় পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। মুক্তিযোদ্ধারা এটাই চাইছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা আওতার মধ্যে আসতেই তাঁদের অস্ত্রগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠল। সেই সঙ্গে চলল গ্রেনেড ও মর্টার চার্জ। গোলাগুলির অব্যর্থ আঘাতে নিহত হলো বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তীব্র গোলাগুলি ও ঘটনার আকস্মিকতায় অন্য পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেল।

প্রতিরোধযোদ্ধাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলো না। ফলে বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল তাঁরা। কিন্তু ব্যাপারটি ছিল একেবারেই সাময়িক। কেননা যেকোনো সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। তাই তাঁরা চলে গেলেন নিজ নিজ অবস্থানে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যেতে থাকে। এভাবে দুপুর-বিকেল গড়িয়ে গেল। পাকিস্তানি সেনাদের আর দেখা নেই। প্রতিরোধযোদ্ধারা ভাবলেন, আর হয়তো তারা আসবে না।

কিন্তু তাঁদের এ ধারণা ছিল ভুল। সন্ধ্যায় আবার পাকিস্তানি সেনাদের আকস্মিক আক্রমণ। এবার তারা এল বিপুল শক্তি নিয়ে। অন্ধকারে শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। একটু পর পর জ্বলে উঠছে ট্রেসারের উজ্জ্বল আলো। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। এবার মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা কোণঠাসা। হঠাৎ পাকিস্তানি শেলের স্প্লিন্টারের আঘাতে শহীদ হলেন আতাহার আলী মল্লিক। আহত হলেন আরও অনেকে। প্রতিরোধযোদ্ধাদের মধ্যে ক্রমেই হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তাঁরা পিছু হটলেন। সহযোদ্ধাদের লাশ তাঁরা সঙ্গে নিতে পারলেন না। পাকিস্তানি সেনারা ওই এলাকা থেকে চলে যাওয়ার পর কয়েকজন যোদ্ধা সঙ্গীদের লাশ খুঁজতে যান, কিন্তু তাঁরা লাশ পেলেন না।

১৯৭১ সালের ২ এপ্রিলের ঘটনা এটি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রংপুর ইপিআর উইংয়ের বাঙালি ইপিআর সেনারা বিদ্রোহ করেন। ইপিআরের বি কোম্পানি তিস্তা নদীর সেতুতে ব্যারিকেড দিয়ে অবস্থান নেয় কুড়িগ্রাম প্রান্তে। তাদের লক্ষ্য ছিল রংপুর সেনানিবাস থেকে অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনাদের বাধা দেওয়া। ১ এপ্রিল সেখানে প্রথম যুদ্ধ হয়।

আতাহার আলী মল্লিক ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চিলমারী বিওপিতে। ২৮ মার্চ তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুর রউফ, বীর বিক্রম

কোচের চর, মনোহরদী, নরসিংদী।
বর্তমান ঠিকানা উত্তরা, ঢাকা। বাবা আবদুল হেকিম, মা রওশন আরা বেগম। স্ত্রী শামীম আরা। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২২।

আবদুর রউফ ১৯৭১ সালে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে মায়ের কাছে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মা সায় দিলেন না। কয়েক দিন পর আরও আটজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে রওনা হলেন ভারতের উদ্দেশে। তিন দিন হেঁটে পৌঁছালেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তসংলগ্ন এক ক্যাম্পে। অনেক দিন অপেক্ষা করার পর শুরু হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ চলাকালে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রথম বাংলাদেশ অফিসার্স ওয়ার কোর্সে। তিন মাসের প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যুদ্ধ করেন ৫ নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত শেলা সাব-সেক্টরে। তাঁকে মুক্তিবাহিনীর একটি দল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আবদুর রউফ শেলা সাব-সেক্টরে যোগ দেন ১০ অক্টোবর। এই সাব-সেক্টরের অধীন এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ছাতক যুদ্ধ (১৩-১৭ অক্টোবর) ও টেংরাটিলা আক্রমণের (৩০ নভেম্বর) ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সীমান্তবর্তী হওয়ায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে এই এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করা কিছুটা সহজ ছিল। সাব-সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে নভেম্বরে তিনি একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের একটি সেতু ধ্বংস করেন। নির্ধারিত দিন তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ১৪০ জনের একটি দল ভারত থেকে রওনা হয় নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে। সেতুর কাছাকাছি পৌঁছে রেকি করতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, সেতুতে পাহারায় আছে একদল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার। রাত আনুমানিক তিনটায় তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। তারাও পাল্টা আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা আবদুর রউফের নেতৃত্বে অত্যন্ত সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাঁরা সেতুর দখল নেন। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা হতাহত ব্যক্তিদের নিয়ে টেংরাটিলার দিকে পালিয়ে যায়। এরপর তাঁরা রেল ও সড়কসেতুতে দ্রুত বিস্ফোরক সংযুক্ত করে তা ধ্বংস করেন। এই অপারেশনে আবদুর রউফ যথেষ্ট রণকৌশল ও সাহসের পরিচয় দেন।

এর দিন কয়েক পরই সংঘটিত হয় টেংরাটিলা যুদ্ধ। সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৯ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর চারটি কোম্পানি ভারত থেকে রওনা হয়ে ৩০ নভেম্বর টেংরাটিলার নির্ধারিত জায়গায় অবস্থান নেয়। নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটি দল মূল আক্রমণকারী দল হিসেবে আক্রমণ করে টেংরাটিলার পাকিস্তানি অবস্থানে। আবদুর রউফ এ সময় তাঁর দল নিয়ে ফ্ল্যাঙ্কগার্ড হিসেবে যুদ্ধে অংশ নেন। কয়েক দিন এখানে যুদ্ধ চলে। টেংরাটিলায় পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থান এতই সুদৃঢ় ছিল যে মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও কিছুতেই সামনে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। এ অবস্থায় তাঁরা তিন দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অবরোধ করেন। ৫ ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তানি সেনারা টেংরাটিলা থেকে পালিয়ে যায়।

আবদুর রউফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুর রকিব মিয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম শোলাপ্রতিমা, সখীপুর, টাঙ্গাইল।
বাবা হাতেম আলী মুন্সী, মা হালিমা বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৪।
শহীদ ২৫ অক্টোবর ১৯৭১।

ফুলছড়িঘাট গাইবান্ধা জেলার অন্তর্গত। ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বগুড়া-গাইবান্ধা রেললাইনের একটি শাখা ফুলছড়িঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীর অপর পাড়ে বাহাদুরাবাদঘাট। মাঝে যমুনা নদী। তখন যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে এ ঘাট ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও খাদ্য নিয়ে নানা ধরনের জাহাজ এখানে ভিড়ত। এখান থেকে সেগুলো পাঠানো হতো বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন স্থানে। অক্টোবরে নৌ-কমান্ডোরা ফুলছড়িঘাটে অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা করেন। অপারেশনে নেতৃত্ব দেন নৌ-কমান্ডো আবদুর রকিব মিয়া। শেষ পর্যন্ত এই অপারেশন ব্যর্থ হয়।

২৫ অক্টোবর গাইড মুক্তিযোদ্ধা কালাচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে আবদুর রকিব মিয়া নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে বাহাদুরাবাদের দক্ষিণে একটি মাদ্রাসার পাশ দিয়ে পাঁচ মাইল প্রশস্ত যমুনা নদীতে নেমে পড়েন। প্রত্যেকের বুকে বাঁধা লিমপেট মাইন। তখন গভীর রাত। বর্ষা মৌসুম হওয়ায় নদীতে তখন তীব্র স্রোত। রকিব মিয়া সহযোদ্ধাদের নিয়ে স্রোতের অনুকূলে সাঁতরে ফুলছড়িঘাটের কাছে আসেন। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য, জাহাজের পেছনে পৌঁছানো মাত্র সেগুলো যাত্রা শুরু করে। প্রপেলারের আঘাতে সৃষ্ট প্রচণ্ড ঘূর্ণিস্রোতে কয়েকজন নৌ-কমান্ডো তলিয়ে যান। প্রপেলারের পাখার আঘাতে আবদুর রকিব মিয়াসহ কয়েকজন শহীদ হন। যমুনার প্রবল স্রোতে তাঁদের শরীরের খণ্ডবিখণ্ড অংশ ভেসে যায়। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২৫ অক্টোবরে ফুলছড়ি রেলঘাটে।

আবদুর রকিব মিয়া চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে ফ্রান্সে সাবমেরিনার হিসেবে প্রশিক্ষণরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে এসে যুদ্ধে যোগ দেন। ফুলছড়িঘাট অপারেশনই ছিল তাঁর প্রথম ও শেষ অভিযান। অক্টোবরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আবদুর রকিব মিয়া ভারতের ক্যাম্পে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর যুদ্ধে যোগ দিতে আটজন নৌ-কমান্ডো নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য ফুলছড়িঘাটে অবস্থানরত রসদ বহনকারী জাহাজ মাইন দিয়ে ধ্বংস করা।

আবদুর রকিব মিয়ার মা-বাবা জানতেন না তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর থেকে মা-বাবার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

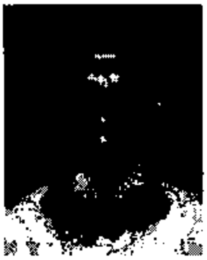

আবদুর রহমান চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম বড় ধলিয়া, ইউনিয়ন জগদীশপুর, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
বাবা আবদুর রহিম চৌধুরী, মা ফুলবানু। স্ত্রী সামসুন্নাহার বেগম।
তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬০।

১৯৭১ সালের মে মাসের একদিন। ৬ বা ৭ মে। ভোরে আবদুর রহমান একজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ার নিজেদের প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে বেরিয়ে পড়লেন রেকি করার উদ্দেশ্যে। বেলা ১১টায় সেখানে ফিরে এসে দেখেন, চারদিক লন্ডভন্ড। পড়ে আছে কয়েকজন সহযোদ্ধার রক্তাক্ত নিথর দেহ। এমন ঘটনার মুখোমুখি হবেন, ভাবতেই পারেননি। বুঝতে পারলেন, পাকিস্তানি সেনাদের আকস্মিক আক্রমণেই এ অবস্থা। ফলে সতর্ক হলেন তিনি। ভাবলেন, পাকিস্তানি সেনারা নিশ্চয়ই তাদের আশপাশেই আছে। তাঁকে এখান থেকে দ্রুত সরে পড়তে হবে। সঙ্গে থাকা সহযোদ্ধাদের সবাই পালিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি আর সরে পড়ার সুযোগ পেলেন না। পড়ে গেলেন একজন পাকিস্তানি সেনার সামনে। ওই পাকিস্তানি সেনা তাঁকে থামার নির্দেশ দিল। তখন মনে হলো, এই পাকিস্তানি সেনার গুলিতে মরার চেয়ে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মবিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়। তাঁর মনজুড়ে চলছে প্রচণ্ড তোলপাড়। তারপর নিমেষে নিজের কাছে থাকা পিস্তল বের করে কী মনে করে গুলি করেন ওই পাকিস্তানি সেনাকে লক্ষ্য করে। লুটিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাটি। গুলির শব্দ শুনে সেখানে এগিয়ে এল আরও দুজন পাকিস্তানি সেনা। তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের লক্ষ্য করে গুলি করলেন তিনি। দুই পাকিস্তানি সেনাই লুটিয়ে পড়ল। এরপর তিনি দ্রুত ছুটে গিয়ে অবস্থান নিলেন সেখানকার এক বাংকারে।

বাকি পাকিস্তানি সেনারা ছিল বেশ দূরে। পরিস্থিতি তাঁর সহায় হলো। ওই বাংকারে ছিল একটি গুলিভর্তি মেশিনগান। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে তিনি গুলি করতে লাগলেন। তখন পাকিস্তানি সেনারা দৌড়াদৌড়ি করে পিছিয়ে যেতে থাকল। তিন-চারজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এই ফাঁকে ওয়্যারলেস মারফত তিনি যোগাযোগ করলেন তাঁর অধিনায়কের সঙ্গে। অধিনায়ক তাঁকে নির্দেশ দেন দ্রুত ওই জায়গা থেকে সরে পড়ার। তিনি অধিনায়কের কাছে গোলা ছোড়ার অনুরোধ জানান। তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে তিন ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকেন। এই সুযোগে তিনি দ্রুত ক্রল করে পশ্চাদপসরণ করেন। সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছার পর সহযোদ্ধারা তাঁকে ভারতে নিয়ে যান।

আবদুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। যশোর সেনানিবাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে দলের কাউকে খুঁজে না পেয়ে নিজের এলাকা হবিগঞ্জে এসে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেন। পরে তাঁকে একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুদ্ধ করেন শাহজীবাজার, মাধবপুর, হরষপুর, আখাউড়া, ভৈরব, আশুগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুর রহিম, বীর বিক্রম

গ্রাম খেওড়া, ইউনিয়ন মেহারী, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা খোরশেদ মিয়া, মা সুফিয়া খাতুন। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭৭। শহীদ ১৭ অক্টোবর ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ১৭ অক্টোবর। শেষ রাতে গোলাগুলিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে চিলমারী। মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল একযোগে আক্রমণ করেছে চিলমারীর বিভিন্ন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানে। একটি দলে আছেন আবদুর রহিম। তিনি নিয়মিত বাহিনীর সদস্য। বিভিন্ন স্থানে আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়া। সকালের আলো ফোটার আগেই আগুনের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠে। একদিকে গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ, অন্যদিকে হতবিহ্বল নারী-পুরুষের ক্রন্দনরোল।

চিলমারী বর্তমানে কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। এর অবস্থান ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমে। চিলমারীর বিপরীতে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে রৌমারী। সেখান থেকে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে চিলমারীতে আক্রমণ পরিচালনা করা ছিল দুঃসাধ্য কাজ। ১৯৭১ সালে চিলমারীর কয়েকটি স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। এর মধ্যে ওয়াপদার অবস্থান ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত।

ওই অবস্থানেই আবদুর রহিম ও তাঁর সহযোদ্ধারা আক্রমণ করেন। দলনেতা ছিলেন নায়েক সুবেদার আবদুল মান্নান (বীর বিক্রম)। আবদুর রহিম তাঁর দলনেতার সঙ্গেই ছিলেন। ওয়াপদা ছাড়া চিলমারীর অন্যান্য পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থান কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। কিন্তু ওয়াপদার প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সেনাদের কোনোভাবেই হটানো সম্ভব হচ্ছিল না। ওয়াপদার অবস্থানে ছিল বেশ কয়েকটি কংক্রিটের বাংকার। বেশির ভাগ বাংকারে ছিল মেশিনগান। এর মধ্যে একটি ছিল বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে। সেখান থেকে পাকিস্তানি সেনারা অবিরাম গুলি ছুড়ছিল। একপর্যায়ে আবদুর রহিম জীবন বাজি রেখে ওই বাংকার ধ্বংস করার জন্য ক্রল করে এগিয়ে যান। বাংকারে গ্রেনেড ছোড়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন।

আবদুর রহিমের রক্ত বৃথা যায়নি। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের তিন দিক থেকে অবরোধ করে রাখেন। যুদ্ধ চলে কয়েক দিন। পরে পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। শহীদ আবদুর রহিমকে সহযোদ্ধারা চিলমারীতে সমাহিত করেন। স্বাধীনতার পর তাঁর মরদেহ সেখান থেকে তুলে কসবার কুটি-চৌমুহনী এলাকায় পুনরায় সমাহিত করা হয়।

আবদুর রহিম ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। চট্টগ্রামে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর তাঁর দলের সঙ্গে ভারতে যান। প্রথমে ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে, পরে জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। অক্টোবরের প্রথমার্ধে জেড ফোর্স সিলেট এলাকায় যায়। কিন্তু তাঁদের দল চিলমারীতে থেকে যায়। আবদুর রহিম রৌমারীর ঠাকুরের চরসহ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল আজিজ, বীর বিক্রম

গ্রাম দড়িয়াবাজ, সদর, সুনামগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা জামাইপাড়া, সুনামগঞ্জ। বাবা আলিমউদ্দীন, মা ফুলবরণ নেছা। স্ত্রী তাহেরুন নেছা। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৭০।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার বেরিগাঁওয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। মুক্ত এলাকা থেকে শহরে প্রবেশ করতে হলে এই বেরিগাঁও দিয়েই মুক্তিযোদ্ধাদের যেতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকবার বেরিগাঁওয়ের পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছেন।

ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার পর আগস্টের শেষ দিকে একদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ওই প্রতিরক্ষা অবস্থানে একযোগে আক্রমণ চালান। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আজিজও অংশ নেন। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের পাঁচটি কোম্পানি পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। একটি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল আজিজ। বেরিগাঁওয়ে সেদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আহত হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীরও কয়েকজন হতাহত হন। এরপর পাকিস্তানি সেনারা বেরিগাঁও থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অবশেষে সুনামগঞ্জ শহর মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।

আবদুল আজিজ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে সুনামগঞ্জে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে যাওয়ার পর তাঁকে ৫ নম্বর সেক্টরের অধীন বালাট সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

আবদুল ওহাব, বীর বিক্রম

গ্রাম মরিচা, ইউনিয়ন রাজামেহার, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। বাবা আলী নেওয়াজ, মা খাতুন বিবি। স্ত্রী মাজেদা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৬। মৃত্যু ২০০৭।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আবদুল ওহাব সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল। তিনি ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ত্রাস। একের পর এক অ্যামবুশ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে ফিরে যেতেন বিজয়ীর বেশে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে আটক বা হত্যা করার জন্য অনেকবার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা দুবার ৫০ হাজার টাকার পুরস্কারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করে। অসংখ্য স্থানে অ্যামবুশ করেন আবদুল ওহাব। এর মধ্যে কালতাদীঘির পাড়, শালগড়, লোত্তামুড়া, সালদা নদী, মন্দভাগ, ঝিকুরা, গোবিন্দপুর, মীরপুর-মাধবপুর এবং চান্দলার অ্যামবুশ ও অপারেশন উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিলের ঘটনা। সে সময় তিনি তাঁর প্লাটুন (৭ নম্বর) নিয়ে দেবীপুরে ছিলেন। খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৭০-৭২ জনের একটি দল সালদা নদীর দিকে আসছে। খবর পেয়ে তিনি কোম্পানি (চার্লি) কমান্ডার আবদুল গাফফারের কাছে অভিপ্রায় জানালেন পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করার। তিনি সম্মতি দিলেন। ওহাব তৈরিই ছিলেন। রওনা হয়ে কালতাদীঘির পাড়ে গিয়ে জানতে পারলেন, পাকিস্তানি সেনারা ততক্ষণে সালদা নদীর কাছে পৌঁছে গেছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেখানেই অ্যামবুশ করলেন। কারণ, পাকিস্তানি সেনাদের ওই জায়গা দিয়েই কসবা যেতে হবে।

ওহাব একটি গাছে উঠে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। একটু পর দূরে দেখতে পেলেন, পাকিস্তানি সেনারা ফিরে আসছে। তাদের গাইড হিসেবে আছে চার-পাঁচজন বাঙালি। তারা সামনে। পেছনে একজন অফিসারের নেতৃত্বে সেনারা দুই সারিতে দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে আসছে। গাছ থেকে নেমে সহযোদ্ধাদের কর্তব্য ঠিক করে দিয়ে বললেন, তিনি গুলি ছোড়ার আগে কেউ যেন গুলি না ছোড়েন। তারপর তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অস্ত্রের গুলির আওতায় আসামাত্র প্রথম গর্জে উঠল আবদুল ওহাবের এলএমজি। সঙ্গে সঙ্গে সহযোদ্ধা ৩০ জনের অস্ত্র থেকে একযোগে গুলি শুরু হলো।

পাকিস্তানি সেনাদের সেখানে আত্মরক্ষার তেমন জায়গা ছিল না। একমাত্র স্থান ছিল সড়কসংলগ্ন খাল। আক্রমণে লুটিয়ে পড়ে অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা। আকস্মিক আক্রমণে দিশেহারা পাকিস্তানি সেনাদের কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে খালে, কেউ পজিশন নিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে। আচমকা এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এক ঘণ্টা পাল্টাপাল্টি গুলির পর মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করেন। পরে ওহাব খবর পান, ১৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং নয়জন আহত হয়েছে।

ঝিকুরা অ্যামবুশে (১০ জুলাই) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, দুজন মেজর, তিনজন ক্যাপ্টেন, একজন সুবেদার মেজর, একজন সেনা, একজন সিভিল পোশাকের ইঞ্জিনিয়ার, একজন ব্যবসায়ীসহ ১২ জন নিহত হয়। তারা একটি স্পিডবোটে করে সালদা নদী দিয়ে যাচ্ছিল। ওহাবের অ্যামবুশে স্পিডবোট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কুখ্যাত পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন বোখারিও ছিল। বোখারি ১৯৭১ সালে কুমিল্লায় অসংখ্য নিরস্ত্র বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে। মেয়েদের ওপর অত্যাচার চালায়।

আবদুল ওহাব পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁর ইউনিটের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল খালেক, বীর বিক্রম

গ্রাম খৈলগাঁও, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
বাবা আবদুল গফুর, মা জমিলা খাতুন। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৮৬। শহীদ মে ১৯৭১।

চা-বাগানের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া নির্জন একটি রাস্তা। এ রাস্তায় নিয়মিত টহল দেয় পাকিস্তানি সেনারা। আবদুল খালেকসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা একদিন অবস্থান নেন ওই চা-বাগানের বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে। সংখ্যায় তাঁরা মাত্র কয়েকজন। ওত পেতে বসে থাকেন পাকিস্তানি সেনাদের অপেক্ষায়। সময় গড়াতে থাকে। একসময় সেখানে হাজির হয় পাকিস্তানি সেনাদের বহনকারী কয়েকটি টহল গাড়ি। তাদের দেখামাত্র একসঙ্গে গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। হতাহত হয় বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা। আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত পাকিস্তানি সেনারা কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেদের সামলে নিয়ে শুরু করে পাল্টা আক্রমণ। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করতে থাকেন আবদুল খালেক ও তাঁর সহযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগ ছিলেন নিরাপদ অবস্থানে। সে জন্য পাকিস্তানি সেনাদের গুলি তাঁদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। অন্যদিকে তাঁদের গুলিতে একের পর এক মাটিতে ঢলে পড়ে পাকিস্তানি সেনা। এ সময় আবদুল খালেক আনন্দে নিজেদের নিরাপদ অবস্থান থেকে সরে আরেকটু সামনে অবস্থান নেন। তাঁর অস্ত্রের গুলিতে হতাহত হয় আরও কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। শত্রু নিধনে তিনি রীতিমতো উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবে তিনি আরও এগিয়ে যান। তখনই ঘটে বিপত্তি। পাকিস্তানি সেনাদের কয়েকটি গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে। শহীদ হন আবদুল খালেক।

AMARBOI.COM

১৯৭১ সালের মে মাসের শেষ দিকে (৯ জ্যৈষ্ঠ) নলুয়া চা-বাগানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর এই যুদ্ধ হয়। হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া ও চুনারুঘাটের মাঝামাঝি নলুয়া চা-বাগান। চুনারুঘাট উপজেলার অন্তর্গত এলাকা এটি। হবিগঞ্জ শহর থেকে দূরে এই চা-বাগানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক। শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার কয়েক মাইল আগে নলুয়া চা-বাগানের রাস্তাটি এক গিরিখাদ বেষ্টন করে চলে গেছে। সেখানেই অবস্থান নিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর আবদুল খালেক ও তাঁর সহযোদ্ধারা। সুবিধাজনক অবস্থান নেওয়ার কারণে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হন। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর শুধু আবদুল খালেক শহীদ হন।

১৯৭১ সালে আবদুল খালেক কৃষিশ্রমিক ছিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ ছিল তাঁর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তেলিয়াপাড়ায় অবস্থান নিলে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁকে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বাধীন কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল বারিক, বীর বিক্রম

গ্রাম বাগড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। বাবা মো. শাহনেওয়াজ,
মা জোবেদা খাতুন। স্ত্রী মনোয়ারা বেগম।
তাঁদের পাঁচ মেয়ে ও তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬৬।

প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে আবদুল বারিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ায় প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে আক্রমণ করে। তাঁরা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পশ্চাদপসরণ করে। কয়েক দিন পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আবার আক্রমণ করে। এবার তারা আক্রমণ করে বিভিন্ন দিক থেকে। প্রতিরোধযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করলেও কিছু এলাকা তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাঁদের অধিনায়ক সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানি অবস্থানে পাল্টা আক্রমণের। পরিকল্পনা অনুযায়ী, একদিন রাত ১২টার দিকে তিন কোম্পানি প্রতিরোধযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। সেদিন টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। আবদুল বারিকের কাছে ছিল মর্টারগান। তিনি পাকিস্তানি ঘাটিতে সেই মর্টারগান দিয়ে বোমার বিস্ফোরণ ঘটান। এতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি মেশিনগান পোস্ট ধ্বংস হয় ও গাড়িতে আগুন ধরে যায়। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২০–২৫ জন হতাহত হয়।

আবদুল বারিক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এর অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। তিনি ডেলটা কোম্পানিতে ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তাঁদের কোম্পানি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিল। ২৭ মার্চ তাঁরা মেজর সাফায়েত জামিলের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এরপর তাঁদের কোম্পানি আখাউড়ায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আখাউড়া দখল করলে তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান।

জুন মাসের মাঝামাঝি (আনুমানিক ১৪ জুন) ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক খালেদ মোশাররফের নির্দেশে মুক্তিবাহিনীর একটি দল কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানায় আক্রমণ করে। এ আক্রমণে আবদুল বারিকও অংশ নেন। তাঁরা ছিলেন ১৬ জন। কুমিল্লা জেলা সদরের উত্তর-পশ্চিমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বুড়িচং থানা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই থানায় বিপুলসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও মিলিশিয়া নিয়োগ করে। এই বুড়িচং দিয়েই মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের চলাচল করতে হতো। পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও মিলিশিয়াদের কারণে গেরিলাদের চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় খালেদ মোশাররফ তাঁদের বুড়িচং থানা আক্রমণে পাঠান। রাত একটার দিকে তাঁরা একযোগে থানায় আক্রমণ চালান। পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও মিলিশিয়ারা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে পরাস্ত হয়। যুদ্ধে আটজন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও মিলিশিয়া নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। অন্যরা পালিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর একজন আহত ও একজন শহীদ হন। এই যুদ্ধে আবদুল বারিক যথেষ্ট সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। পরে তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মজিদ, বীর বিক্রম

গ্রাম বেতুড়া, বিরল, দিনাজপুর। বাবা আফার মোহাম্মদ, মা আহেলা খাতুন। স্ত্রী মোজলেসা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১১৯।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আবদুল মজিদ যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি ছিলেন ইপিআরে। আবদুল মজিদ ১৯৯১ সালের আগ পর্যন্ত জানতেন না তিনি বীর বিক্রম। সে বছর তাঁর গ্রামের ঠিকানায় একটি ঈদকার্ড আসে। খামে লেখা 'আবদুল মজিদ বীর বিক্রম'। তিনি প্রথমে এর অর্থ বুঝতে পারেননি। ১৯৯৮ সালে বীর বিক্রম পদক ও সনদ তিনি হাতে পান।

আবদুল মজিদ ৬ নম্বর সেক্টরের অধীন লালমনিরহাটের পাটগ্রাম-হাতীবান্ধা এলাকায় যুদ্ধ করেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি একদিন তাঁরা যান হাতীবান্ধার পূর্বের পারুলিয়া রেলসেতু ধ্বংস করতে। আবদুল মজিদ ছিলেন এই অভিযানে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী দলের গ্রুপ কমান্ডার। সেতুর কাছে অবস্থান নেওয়ার কিছুক্ষণ পর দেখেন, লালমনিরহাটের দিক থেকে এগিয়ে আসছে অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা। গ্রুপ কমান্ডার ও গানার হিসেবে তিনি ব্রেনগান হাতে ছিলেন পুরোভাগে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন ইপিআর সদস্য। নিশানার মধ্যে পাকিস্তানি সেনারা আসামাত্র গর্জে উঠল আবদুল মজিদের ব্রেনগান। একই সময় তাঁর সঙ্গীরাও একযোগে গুলি করতে শুরু করলেন। গুলিতে লুটিয়ে পড়ল বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তাদের দিক থেকেও শুরু হলো পাল্টা গুলিবর্ষণ। এরপর তারা শুরু করে আর্টিলারি শেলিং। একপর্যায়ে আবদুল মজিদ দেখেন, তাঁর সঙ্গীরা কেউ তাঁর পাশে নেই।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে আবদুল মজিদের সহযোদ্ধারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন। এ সময় তিনি একা একস্থানে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করছিলেন। সহযোদ্ধারা তাঁকে পশ্চাদপসরণের খবর দিতে পারেননি। ফলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে একা হয়ে যান। পরে অনেক কৌশলে তিনি পশ্চাদপসরণ করেন।

আবদুল মজিদ বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু পারুলিয়ার যুদ্ধ তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মালেক, বীর বিক্রম

গ্রাম ছায়কোট, চান্দিনা, কুমিল্লা। বাবা সৈয়দ আহমদ, মা সৈয়দা কুলসুম বিবি। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩১। গেজেটে নাম মো. আবদুল নালিক।

৮ অক্টোবর, ১৯৭১। ভরা বর্ষার নদী। দুই কূল ছাপিয়ে পানি উথলে উঠছে। রাতে নদীতে টহলরত পাকিস্তানি গানবোট ও বন্দরের সার্চলাইটের তীব্র আলো চারদিক ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। এর মধ্যেই নদীতে নেমে সাঁতরে এগিয়ে যাচ্ছেন একদল নৌ-কমান্ডো। ১৮ জনের মধ্যে একজন আবদুল মালেক। তাঁদের লক্ষ্য বন্দরে নোঙর করা জাহাজ। মৃত্যুভয় তাঁদের দৃঢ়তার কাছে হার মানে। সবাই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে জাহাজের সামনে, মাঝে ও পেছনে লিমপেট মাইন লাগিয়ে অতি দ্রুত তীরে ফিরতে থাকেন। তাঁরা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরার আগেই শুরু হয় বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে বন্দরের সাইরেন। পাকিস্তানি সেনারাও তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। মাইনের বিস্ফোরণ, সাইরেন ও গুলির শব্দে গোটা বন্দর এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

এ ঘটনা ঘটেছিল মংলা বন্দরে। সেদিন নৌ-কমান্ডোরা এ বন্দরের পশুর নদে নোঙর করা কয়েকটি জাহাজ লিমপেট মাইনের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডুবিয়ে দেন। এ জন্য নৌ-কমান্ডোরা ভারত থেকে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মংলা বন্দর এলাকায় আসেন। ক্যাম্প স্থাপন করেন কৈলাসগঞ্জে। সেখান থেকে মংলা বন্দরে পৌঁছানো সহজ ছিল। অপারেশনের আগে তাঁরা বন্দরে রেকি করেন। নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যার আগেই রাতের খাবার খেয়ে নৌ-কমান্ডোরা স্থল মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মংলা বন্দরের উদ্দেশে রওনা হন।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কোনো অবস্থাতেই আলো জ্বালানো যাবে না। নৌকার মাঝিরা স্থানীয় হওয়ায় তাঁদের রাস্তা চিনতে অসুবিধা হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা পৌঁছে যান নির্দিষ্ট জায়গায়। নদীতে নামার আগে নৌকার মধ্যেই তাঁরা সব প্রস্তুতি সেরে নেন। তারপর নেমে পড়েন নদীর পানিতে। সাঁতরে এগিয়ে যেতে থাকেন জাহাজের দিকে, আর সঙ্গে থাকা স্থলযোদ্ধারা নদীর পাড়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কমান্ডোরা ছয় ভাগে বিভক্ত হয়ে ছয়টি জাহাজের দিকে যান। সব দলই সাফল্যের সঙ্গে জাহাজে লিমপেট মাইন সংযুক্ত করতে সক্ষম হন।

আবদুল মালেক পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। ছুটিতে থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে যান। পরে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে। তিনি যেসব জায়গায় অপারেশন ও যুদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে আশুগঞ্জ ফেরিঘাট অপারেশন, কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বাতাকান্দি বাজার এবং ঢাকার যাত্রাবাড়ীর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি পূর্ব পাকিস্তান নৌপরিবহন সংস্থার ঢাকার কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় নৌপথের মানচিত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সংগ্রহ করেন। এগুলো নৌ-কমান্ডোদের অপারেশনে যথেষ্ট কাজে লাগে।

আবদুল মালেক ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

আবদুল মালেক চৌধুরী

বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক

গ্রাম ত্রৈলক্ষ বিজয়, সদর, মৌলভীবাজার। বাবা মনোহর চৌধুরী, মা আরবজান বিবি। স্ত্রী হাজেরা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭ ও ১৮৭। মৃত্যু ২০০৭।

বড়খাতা লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন। এর পশ্চিম দিকে তিস্তা নদী আর পূর্ব দিকে ভারত সীমান্ত। পাটগ্রাম থেকে রেল ও সড়কপথ বড়খাতা হয়ে লালমনিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত। বড়খাতা অংশে আছে রেলসেতু। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেতুটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ কারণে সেতুটি রক্ষায় তারা নিয়মিত সেনা, ইপিসিএএফ ও রাজাকারদের সমন্বয়ে এক কোম্পানির বেশি সদস্য নিয়োগ করে।

মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকবার চেষ্টা করেও ওই সেতু ধ্বংস করতে পারেননি। একপর্যায়ে সেতুটি ধ্বংসের দায়িত্ব পড়ে ৬ নম্বর সেক্টরের পাটগ্রাম সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের (বীর বিক্রম) ওপর। এই অপারেশনের জন্য তিনি অন্যদের পাশাপাশি আবদুল মালেক চৌধুরীর কোম্পানিকেও সঙ্গে নেন। অপারেশনের তারিখ ছিল ৮ আগস্ট। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা সেতুতে বিস্ফোরক সংযুক্ত করেন। বৃষ্টির মধ্যেই তাঁরা ডেটোনেটরে আগুন ধরান।

রাত পৌনে দুইটার দিকে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। মনে হলো, আকাশ ভেঙে অবিরাম বজ্রপাত হচ্ছে। তিস্তা নদীতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল সেতুর অবকাঠামো ও নদীতীরের বাংকার। প্রাণভয়ে পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ ও রাজাকাররা ছোটাছুটি শুরু করছে। তখন আবদুল মালেক চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট মেজবাহউদ্দীন আহমেদ বীর বিক্রম তাঁদের অধীন কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ করলেন। হতাহত হলো বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী। পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ১৫ জনের লাশ ফেলে তারা পালিয়ে যায়। সেদিনের পর মুক্ত হয় তিস্তার পূর্ব দিকের এলাকা।

আবদুল মালেক চৌধুরী ১৯৭১ সালে রংপুর ইপিআর উইংয়ের অধীনে পাটগ্রাম সীমান্তে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন সুবেদার বোরহানউদ্দীন। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর তিনি পাটগ্রামে অবস্থান নেন। পরে সেক্টর ও সাব-সেক্টর গঠিত হলে তাঁকে ইপিআর ও গণবাহিনীর যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানির কমান্ডার করা হয়। তিনি মোগলহাট, ভূরুঙ্গামারী, পাটেশ্বরী, কাকিনাসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন। তিনি প্রথমে সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর এবং পরে পাটগ্রাম সাব-সেক্টরের অধীনে ছিলেন।

আবদুল মালেক চৌধুরী ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বিডিআরে চাকরি করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মোতালেব, বীর বিক্রম

গ্রাম পূর্বশ্রীকোল, শ্রীপুর, মাগুরা।
বাবা গোলাম ছরোয়ার মিয়া, মা আমিনা বেগম।
স্ত্রী হাসিনা। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৭।
শহীদ ২৭ এপ্রিল ১৯৭১।

আবদুল মোতালেবসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা রাতের অন্ধকারে ভারতের ভূখণ্ড থেকে প্রবেশ করলেন বাংলাদেশে। হেঁটে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের গন্তব্য মোহনপুর। সেখানে আছে একটি সেতু। সেতুটিকেই তাঁরা ধ্বংস করবেন। এর কাছাকাছিই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান। তারা যেকোনো সময় আক্রমণ করতে পারে। সকাল হওয়ার আগেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন নির্দিষ্ট স্থানে। সেতুর আশপাশে দ্রুত প্রতিরক্ষা অবস্থান নিলেন তাঁরা। বিস্ফোরক দলের সদস্যরা কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় কাজ সম্পন্ন করলেন। তখন সকালের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল। বিকট শব্দে ধ্বংস হয়ে গেল সেতু। শব্দ পেয়ে কাছাকাছি থাকা পাকিস্তানি সেনারা গাড়িযোগে দ্রুত এসে তাঁদের ওপর আক্রমণ করল।

অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাদের অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণে মুক্তিযোদ্ধারা বেশির ভাগ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। কিন্তু আবদুল মোতালেবের দলটি তাদের অবস্থান ধরে রাখল। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকল। শহীদ হলেন তাঁর দুজন মুক্তিযোদ্ধা। আহত হলেন তিন-চারজন। একটু পর আবদুল মোতালেবও গুরুতর আহত হলেন। এতে তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হলো। কয়েকজন সহযোদ্ধা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেও রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। তখন সহযোদ্ধারা গ্রামবাসীর সহযোগিতায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সীমান্তের ওপারে। পথেই তিনি মারা গেলেন। পরে তাঁকে ভারতের বাঙালপাড়ায় সমাহিত করা হয়। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত মোহনপুরে।

AMARBOI.COM

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধযুদ্ধ করতে করতে সমবেত হন দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে। সেখানে সমবেত হওয়ার পর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তিনটি দলে বিভক্ত হয়। একটি দলের নেতৃত্বে থাকেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল)। এই দলে ছিলেন আবদুল মোতালেব। তাঁরা ৯, ১০, ১১ ও ১৯ এপ্রিল বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এরপর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের কামারখালীতে অবস্থান নেন। সেখানে অবস্থানকালে মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভেতরে বেশ কয়েকটি অপারেশন পরিচালনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে এসে মোহনপুর সেতু ধ্বংস করেন।

আবদুল মোতালেব পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। ৩০ মার্চ রাতে তাঁরা আক্রান্ত হন। তখন তাঁরা বিদ্রোহ করে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হক ভূঁইয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম রাধানগর, আখাউড়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আফতাবউদ্দীন ভূঁইয়া, মা আমেনা খাতুন।
স্ত্রী হাসনে আরা বেগম। তাঁদের ছয় ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫।

মুক্তিবাহিনীর সাব-সেক্টরের অধিনায়ক কয়েকজন দলনেতাকে ডেকে পাঠালেন। আবদুল হক ভূঁইয়াসহ কয়েকজন যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'খবর এসেছে, মন্দভাগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে সেনা পরিবর্তন হবে। নতুন একটি দল কাল সেখানে আসবে। তাদের অ্যামবুশ করতে হবে। আপনারা কে যাবেন?' আবদুল হক ভূঁইয়া হাত তুললেন। অধিনায়ক তাঁর পিঠ চাপড়ে দ্রুত তৈরি হতে বললেন। তাঁর সঙ্গে দেওয়া হলো বাছাই করা আটজন মুক্তিযোদ্ধা আর চারটি এলএমজি ও পাঁচটি এসএমজি। আবদুল হক ভূঁইয়া সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁরা প্রথমে সিদলাই (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) গ্রামে যাবেন। কারণ, নতুন পাকিস্তানি সেনারা মন্দভাগে আসবে জলপথে। সিদলাই গ্রামের অদূরে দুটি নদীর সংযোগস্থল। সেখানে আছে একটি কুমারবাড়ি। এলাকাটা জনমানবশূন্য। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। নতুন করে পরিখাও করতে হবে না। ওখানে আছে অনেক ছোট ছোট গর্ত। ভোর হওয়ার আগেই তাঁরা তিনটি গর্তে অবস্থান নিলেন।

সময় গড়িয়ে দুপুর হলো। পাকিস্তানি সেনাদের দেখা নেই। মুক্তিযোদ্ধারা রোদে পুড়ে ও ক্ষুধায় প্রায় কাতর। দু-তিনজন অস্থির হয়ে পড়লেন। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা বললেন, আজ বোধ হয় পাকিস্তানি সেনারা আসবে না। কিন্তু আবদুল হক ভূঁইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখতে চান। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলতে শুরু করেছে। এমন সময় নদীতে একটি নৌকা দেখা গেল। তাতে একটি লাল পতাকা। এ নৌকার বেশ পেছনে আরও দুটি নৌকা। আবদুল হকের মনে হলো, সামনের নৌকায় পাকিস্তানি সেনারা নেই। তাঁর অনুমানই সত্য হলো। নৌকায় কয়েকজন রাজাকার ও খাদ্যদ্রব্য। তিনি নির্বিঘ্নে নৌকাটি যেতে দিলেন। একটু পর বাকি দুই নৌকা এগিয়ে এল। নৌকাবোঝাই পাকিস্তানি সেনা। নদীর পাড় দিয়েও হেঁটে আসছে কিছু পাকিস্তানি সেনা। জলে ও ডাঙায় মিলে ১৩০-১৪০ জন। এক কোম্পানি। এত পাকিস্তানি সেনা দেখে মুক্তিযোদ্ধারা ভড়কে গেলেন। আবদুল হক ভূঁইয়া তাঁদের সাহস জুগিয়ে বললেন, পাকিস্তানি সেনারা পানিতে। অল্প কয়েকজন ডাঙায়। ভয় পাওয়ার কারণ নেই। নৌকা তাঁদের গুলির আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল সব অস্ত্র। পাকিস্তানি সেনারা প্রতিরোধের তেমন সুযোগ পেল না। বেঁচে যাওয়া পাকিস্তানি সেনারা পানিতে ঝাঁপ দিল। আহত ও নিহত সেনারা নৌকায় ও পানিতে গড়িয়ে পড়ল। আবদুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা একনাগাড়ে গুলি করে দ্রুত সরে পড়লেন সেখান থেকে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের আগস্টের শেষ দিকের। মুক্তিযোদ্ধাদের এই অ্যামবুশে ৩৫-৩৬ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন শহীদ হন।

আবদুল হক ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে ভূমি জরিপ বিভাগে কাজ করতেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণও তাঁর নেওয়া ছিল। তিনি ছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হাকিম, বীর বিক্রম

গ্রাম পাঁচগাঁও নিজ ভাওর, চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা দীন মোহাম্মদ, মা সাবেদা খাতুন। স্ত্রী রুচিয়া খাতুন।
তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯৬। মৃত্যু ২০০১।

রাতে পাহাড়ি পথে হেঁটে আবদুল হাকিমসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা পৌঁছালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছে। সেখানে কোদাল-খন্তা চালিয়ে শুরু করলেন ছোট পরিখা খোঁড়ার কাজ। ভোরের আলো ফোটার আগেই শেষ হলো সেই কাজ। তারপর তাঁরা অবস্থান নিলেন পরিখার ভেতর। মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের আড়াল করে চুপচাপ আছেন। অধিনায়কের সংকেত পেলেই তাঁরা একযোগে আক্রমণ চালাবেন। কিন্তু তার আগেই পাকিস্তানি সেনারা তাদের সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে শুরু করল আর্টিলারি ও মর্টারের গোলাবর্ষণ। শত শত গোলা পড়তে লাগল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর। গোলাবর্ষণ ও গুলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মাথা তোলাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। চরম প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে লাগলেন আবদুল হাকিমসহ কয়েকজন। কিন্তু আবদুল হাকিম বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারলেন না। হঠাৎ একসঙ্গে চার-পাঁচটি গুলি এসে লাগল তাঁর চোখ, বুক ও কোমরে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বরের। ঘটেছিল সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকার রাধানগরে।

রাধানগর সীমান্ত এলাকার একটি বাজার। বাজারের পূর্ব পাশ দিয়ে পিয়াইন নদের শাখা প্রবাহিত। এর উত্তর পারে জাফলং চা-বাগান। উত্তর-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিওপি তামাবিল এবং ভারতের ডাউকি বিওপি। রাধানগরসহ গোয়াইনঘাট এলাকায় ছিল পাকিস্তানি সেনাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান। এখানে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, পাঞ্জাব রেঞ্জার ও টসি ব্যাটালিয়ন। অক্টোবরের শেষ দিকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে আক্রমণের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভেতরে আসে। ৫ নভেম্বর রাধানগরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুক্তিবাহিনীর ৪ নম্বর সেক্টরের ডাউকি সাব-সেক্টরের একদল মুক্তিযোদ্ধা, জেড ফোর্সের তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মিত্রবাহিনীর ৫/৫ গোর্খা রেজিমেন্টের একদল সেনা যৌথভাবে এ যুদ্ধে অংশ নেয়। সেদিন মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকজন যোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর বিপুলসংখ্যক সেনাসদস্য শহীদ হন। আহত হন আবদুল হাকিমসহ অনেকে। আবদুল হাকিমকে সহযোদ্ধারা উদ্ধার করে ভারতের শিলং হাসপাতালে পাঠান। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেশ স্বাধীন হয়।

আবদুল হাকিম চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। এরপর ১ নম্বর সেক্টর এলাকায় কিছুদিন যুদ্ধ করেন। পরে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানিতে। ছাতক, গোয়াইনঘাটসহ কয়েকটি জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হালিম চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম দক্ষিণ পাইকশা, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
বাবা আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী, মা ফিরোজা বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৮। শহীদ ১৯৭১।

রাত তখন আটটা পাঁচ বা দশ। সবুজ রঙের একটি কার ব্রেক কষে থেমে পড়ল ব্যস্ত গলির মুখে। সেই কার থেকে ক্ষিপ্রগতিতে নামলেন আবদুল হালিম চৌধুরী জুয়েলসহ পাঁচজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। চারজনের হাতেই স্টেনগান। একজনের হাতে এসএমজি। এক মিনিটের মধ্যে তাঁরা অবস্থান নিলেন সুবিধাজনক একটা জায়গায়। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে গর্জে উঠল সবার অস্ত্র। অদূরে পাকিস্তানি সেনাদের চেকপোস্টে প্রহরারত ছিল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার মিলে ১২-১৩ জন। আবদুল হালিম চৌধুরী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের ছোড়া আকস্মিক গুলির আঘাতে নিহত হলো চারজন পাকিস্তানি সেনা ও ছয়জন রাজাকার।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মহানগরের ফার্মগেটের। সেখানে তখন ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট। প্রহরায় ছিল মিলিটারি পুলিশ ও রাজাকারের দল। সার্বক্ষণিক পাহারায় নিয়োজিত ছিল তারা। এখানেই ছিল তাদের বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা। মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা সেখানে অপারেশন করেন। অপারেশনে অংশ নেন পাঁচজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা : জুয়েল, বদি, আলম ও পুলু। আরেকজন সামাদ। তিনি ছিলেন গাড়ির চালক। সেদিন দুপুরের দিকে অপারেশনের আগে তাঁরা জায়গাটা রেকি করেছিলেন। তারপর গোপন আস্তানায় ফিরে পরামর্শ শেষে সেদিনই তাঁরা অপারেশন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। সময় নির্ধারণ করেন রাত আটটা দশ মিনিট। নিউ ইস্কাটনের গোপন আস্তানা থেকে তাঁরা গাড়িতে করে রওনা হন সন্ধ্যা সাতটা ৫০ মিনিটে। ফার্মগেটে এসে গাড়িটি ডানে ঘুরে হলি ক্রস কলেজের গলির ভেতর ঢুকে থেমে যায়। এরপর তাঁরা ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। দ্রুত অপারেশন করে তাঁরা সটকে পড়েন ওই গাড়িতে নিয়েই।

AMARBOI.COM

আবদুল হালিম চৌধুরী ১৯৭১ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসের শেষ দিকে ঢাকা থেকে পালিয়ে তিনি ভারতের ত্রিপুরার মেলাঘরে যান। সেখানে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ঢাকায় এসে গেরিলা অপারেশন শুরু করেন। ফার্মগেট ছাড়াও এলিফ্যান্ট রোডের পাওয়ার স্টেশন, যাত্রাবাড়ী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে গেরিলা অপারেশনে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেন তিনি। ১৯ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে গেরিলা অপারেশনের জন্য রেকি করার সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে তিনি আহত হন। এরপর তিনি ঢাকার বড় মগবাজার এলাকায় একটি বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের মাধ্যমে তাঁর খবর পেয়ে যায়। ২৯ আগস্ট ওই বাড়িতে হানা দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আটক করে। তাঁর ওপর তারা চালায় অমানুষিক নির্যাতন। পরে তাঁকে হত্যা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সবুর খান, বীর বিক্রম

গ্রাম চর রাঘবরায়, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। বর্তমান ঠিকানা আদালত পাড়া, টাঙ্গাইল। বাবা সুজাত আলী খান, মা আয়েশা খানম। স্ত্রী রাবেয়া বেগম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৪।

আবদুস সবুর খানসহ ৩০-৩২ জনের একদল মুক্তিযোদ্ধা নদীর ঘাটে ওত পেতে বসে আছেন। সবার হাত অস্ত্রের ট্রিগারে, দৃষ্টি সামনে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখানে হাজির হলো ছয়-সাতজন পাকিস্তানি সেনা। একটু পর এল আরও ১০-১২ জন পাকিস্তানি সেনা। এখন তারা পুরোপুরি মুক্তিযোদ্ধাদের নাগালের মধ্যে। আবদুস সবুর খান এবং তাঁর সহযোদ্ধারা সংকেত পেয়ে একযোগে গুলি চালাতে শুরু করলেন। প্রথম ধাক্কায় চারজন পাকিস্তানি সেনা নদীতে গড়িয়ে পড়ল। তিনজন পড়ে রইল নদীর পাড়ে। একটু পর বেঁচে যাওয়া পাকিস্তানি সেনারাও গুলি শুরু করল। মেশিনগান, দুই ইঞ্চি-তিন ইঞ্চি মর্টার ও রকেট লঞ্চারের গোলাগুলিতে চারদিক প্রকম্পিত হতে লাগল। প্রায় আধা ঘণ্টা একনাগাড়ে যুদ্ধ চলল। তারপর থেমে থেমে চলে আড়াই ঘণ্টার মতো।

এ যুদ্ধে আবদুস সবুর খান বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি নদীর পাড়ে একবার ডানে, একবার বাঁয়ে গিয়ে এবং আধা মাইল দৌড়াদৌড়ি করে প্রায় তিন ঘণ্টা গুলি চালান। আধা মাইলজুড়ে মুক্তিবাহিনী অবস্থান নিয়েছে—পাকিস্তানি সেনাদের এ রকম ধোঁকা দেওয়াই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। বিশৃঙ্খল পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৭ জুন সকালে ঘটেছিল টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার পশ্চিমে কামুটিয়ায়।

আবদুস সবুর খান ছিলেন একজন নির্মাণশ্রমিক। ১৯৭১ সালে টাঙ্গাইলের সন্তোষে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। পরে টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনী গঠিত হলে তিনি এতে যোগ দেন। তিনি ছিলেন কাদেরিয়া বাহিনীর একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। পরে তাঁকে একটি দলের নেতা হিসেবেও দায়িত্ব দেওয়া হয়। টাঙ্গাইলের বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। জুন থেকে আগস্ট—টানা তিন মাস কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নিয়ে পরিশ্রান্ত আবদুস সবুর বিশ্রামে ছিলেন টাঙ্গাইলের সুবিরচালা গ্রামে। এখানে থাকার সময় একদিন দুপুরে হইচই পড়ে যায়। জানতে পারেন, তিন মাইল দূরে মরিচা গ্রামে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করেছে। সেখানে ছিল কাদেরিয়া বাহিনীর একটি দল। তারা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। সবুর খান ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পান, পাকিস্তানি সেনাদের বেশির ভাগ একটি নৌকায় করে নদী পাড় হয়ে বল্লার দিকে যাচ্ছে। কয়েকজন নদীর পাড়ে অপেক্ষা করছে নৌকার জন্য। এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না আবদুস সবুর খান।

নৌকা ঘাটে ফিরে এলে পাকিস্তানি সেনারা তাতে ওঠামাত্র মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল। এমন সময় গর্জে উঠল আবদুস সবুর খানের অস্ত্র। চার-পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা গুলিবিদ্ধ হয়ে নদীতে পড়ে গেল। তিনজন নৌকার ওপর লুটিয়ে পড়ল। যেসব পাকিস্তানি সেনা নদীর ওপাড়ে ছিল, তারা এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে চালাতে পালিয়ে গেল। এ ছাড়া পাথরঘাটা, বল্লা, বাথুলি, চাড়ান, এলাসিন, নাগরপুর, বাসাইল ও মির্জাপুরের যুদ্ধেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সালাম, বীর বিক্রম

গ্রাম মধ্য কাছাড়, ইউনিয়ন ধর্মপুর, সদর, ফেনী।
বাবা দারগ আলী মিস্ত্রি, মা ফাতেমা বেগম।
স্ত্রী নূরজাহান বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩। শহীদ ৫ আগস্ট ১৯৭১।

কয়েক দিন ধরে মুষলধারে বৃষ্টি। এর মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা অবস্থান নিল সালদা নদী ও শশীদল রেলস্টেশনের পশ্চিম পাশে। কাছাকাছি এক জায়গায় অবস্থান করছিল মুক্তিবাহিনীর একটি দল। এ দলের নেতৃত্বে আবদুস সালাম। খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত এগিয়ে গেলেন শশীদল রেলস্টেশনের দিকে। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। আবদুস সালামের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারাও সাহসের সঙ্গে শুরু করলেন পাল্টা আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশলের কাছে হার মেনে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটল। আবদুস সালাম ধারণা করলেন, পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ওদিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর যেই তিনিসহ কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়েছেন, অমনি শুরু গুলি ও মর্টারের গোলাবর্ষণ। আড়াল নেওয়ার সুযোগ পেলেন না আবদুস সালাম। এক ঝাঁক গুলি এসে লাগল তাঁর শরীরে। শহীদ হলেন সাহসী আবদুস সালাম।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৫ আগস্টের। সালদা নদী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের সময় সালদা নদী এলাকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক রণাঙ্গন। এখানে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি সেনারা কয়েক দিন পর পর এই এলাকায় এসে অবস্থান নিত। মুক্তিবাহিনী তাদের আক্রমণ করে হটিয়ে দিত। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন আবদুস সালাম তাঁর দলবল নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন।

আবদুস সালাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ফেব্রুয়ারি থেকে দুই মাসের ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে নিজ এলাকায় সংঘটিত প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। পরে ভারতে গিয়ে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের সালদা নদী এলাকায়। শহীদ হওয়ার আগে বেশ কটি যুদ্ধে অংশ নেন।

কসবার কৈখোলায় ছিল মুক্তিবাহিনীর একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। ১৮ জুন বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনার একটি দল ওই প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা সেখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন। পাকিস্তানি সেনারা কৈখোলা দখল করার পর সেখানে অবস্থান নেয়। পরদিন ভোরেই নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানি (চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ করে। একটি উপদলে ছিলেন আবদুস সালাম। তিনি তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে শিবপুরের দিক দিয়ে পাকিস্তানি অবস্থানের একদম ভেতরে ঢুকে পড়েন। এতে পাকিস্তানি সেনারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তিনি ঝোড়োগতিতে পাকিস্তানি অবস্থানে ঢুকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন। তাঁদের দুঃসাহসী আক্রমণে বিপর্যস্ত পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে ৩১ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সালাম, বীর বিক্রম

গ্রাম আলীয়াবাদ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা মুন্সি আজগর আলী, মা যোবেদা বেগম।
স্ত্রী খোদেজা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯৮।

১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক আটটা। সিলেটের তেলিয়াপাড়া এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকাররা মুক্তিবাহিনীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। সে সময় সুবেদার ওসমান গনির নেতৃত্বে হাবিলদার আবদুস সালাম মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। প্রায় দুই ঘণ্টার এই সম্মুখযুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ছোড়া শেলের আঘাতে হাবিলদার আবদুস সালামের তলপেট ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আহত আবদুস সালামকে মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করতে সক্ষম হন। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পরে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়। ওই সম্মুখযুদ্ধে রাজাকারসহ ৩০ থেকে ৩৫ জন পাকিস্তানি সেনা মারা যায়।

আবদুস সালাম প্রথম জীবনে পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন। পরে ইপিআরে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর হেডকোয়ার্টারের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেন। বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় তিনি সিলেট অঞ্চলে চলে আসেন। তারপর সিলেটের তেলিয়াপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

আবু ইউসুফ, বীর বিক্রম

গ্রাম কাজলা, পূর্বধলা, নেত্রকোনা।
বাবা মহিউদ্দিন তালুকদার, মা আশরাফুননেছা।
স্ত্রী ফাতেমা ইউসুফ। তাঁদের এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৭। মৃত্যু ১৯৯৯।

সহযোদ্ধাদের সঙ্গে আবু ইউসুফ প্রতিরক্ষা অবস্থানে। সকাল হলেই তাঁরা রওনা হবেন ঢাকার দিকে। রাতে তাঁরা পালা করে ঘুমালেন। তখনো সকাল হয়নি, আবু ইউসুফের মনে হলো, জঙ্গলের ভেতর কেউ আছে। সহযোদ্ধাদের দ্রুত গোটা এলাকা ঘেরাও করার নির্দেশ দিলেন তিনি। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন জঙ্গলের দিকে। নিঃশব্দে জঙ্গলে ঢুকেই ভেতরে অনেক পাকিস্তানি সেনা দেখতে পেলেন। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। আবু ইউসুফ দ্রুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্ত নিলেন, এদের আত্মসমর্পণ করাতে হবে। তাদের বুঝতে না দিয়ে প্রথমে নিজেদের নিরাপদ অবস্থান সংহত করলেন। তারপর অস্ত্র উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, হ্যান্ডস আপ। হকচকিত পাকিস্তানি সেনারা সবাই হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি নির্দেশ দিলেন আত্মসমর্পণের। পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করতে থাকল। একজনকে দেখে আবু ইউসুফ চমকিত হলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদের খান তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনিও নীরবে তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ১৪ ডিসেম্বর এ ঘটনা ঘটে গাজীপুরের মৌচাকে।

সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ময়মনসিংহে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার দিকে রওনা হয়। ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল হয়ে ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদের তাঁর বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন গাজীপুরের কালিয়াকৈরে। ১৩ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মৌচাকের ঠেঙ্গার বান্দ্রের কাছে অবস্থান নেয়। মুক্তিবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবু ইউসুফ। সেই রাতেই আবদুল কাদের খান তাঁর বাহিনীর একাংশ নিয়ে সেখানে পৌঁছান। ১৪ ডিসেম্বর সকালে তারা আবু ইউসুফের দলের হাতে বন্দী হয়।

আবু ইউসুফ চাকরি করতেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর প্রকৌশল শাখায়। ১৯৭১ সালে প্রেষণে সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখান থেকে পালিয়ে লন্ডনে যান। ভারতে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন আগস্টে। প্রথমে যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের অধীনে। পরে ১১ নম্বর সেক্টরে। জামালপুরের কামালপুর (১৪-১৫ ও ২৭-২৮ নভেম্বর), বকশীগঞ্জ, জামালপুর যুদ্ধসহ কয়েকটি জায়গায় সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন। কামালপুর মুক্ত করার পর মিত্রবাহিনী (১ মারাঠা রেজিমেন্ট) ও মুক্তিবাহিনী জামালপুরের দিকে মার্চ করে। আবু ইউসুফ মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ও কর্নেল ব্রারের সঙ্গে জামালপুরের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

AMARBOI.COM

আবুল কালাম আজাদ, বীর বিক্রম

পার দিঘুলিয়া, সদর, টাঙ্গাইল।
বাবা কাশেম উদ্দিন সরকার ওরফে আবদুল মজিদ
মা সালেহা বেগম। স্ত্রী জেসমিন আক্তার।
তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৩।

একাত্তরের জুন মাস। টাঙ্গাইলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের তৎপরতা খুব বেড়ে গেল। কাদেরিয়া বাহিনীর কয়েকজন কমান্ডার ভূঞাপুরের মুক্ত এলাকার এক ডাকবাংলোয় বসে আলোচনা করলেন করণীয় নিয়ে। শহরের ভেতরে গেরিলা অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু সেখানে কে যাবেন? সহযোদ্ধাদের বলার পর রাজি হলেন আবুল কালাম আজাদ ও নজরুল ইসলাম বাকু। তাঁদের কয়েকটি গ্রেনেড দেওয়া হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল কালাম আজাদ ও নজরুল ইসলাম গ্রেনেডসহ অবস্থান নিলেন শহরের পাশের পাঁচকাহনিয়া গ্রামে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, দুজন দুটি পৃথক স্থানে অপারেশন চালাবেন। আজাদ যাবেন রাজাকার কমান্ডার খোকা তালুকদারের বাড়িতে। খোকার নেতৃত্বেই রাজাকাররা শহরে খুন, ধর্ষণ, লুটপাটসহ নানা অপকর্ম করে। নজরুল ইসলাম যাবেন থানায়। প্রথমে আজাদ গ্রেনেড ছুড়বেন। শব্দ শুনে নজরুল ইসলামও গ্রেনেড ছুড়বেন থানার ভেতরে।

জুন মাসের শেষের দিকে একদিন সন্ধ্যায় আজাদ ও নজরুল ইসলাম শহরে ঢুকলেন। আজাদ গেলেন খোকা তালুকদারের বাড়ির পাশে, থানার পাশে গেলেন নজরুল ইসলাম। সারা রাত তাঁরা জঙ্গলে বসে থাকলেন মশার কামড় সহ্য করে। অপারেশন করবেন শেষ রাতে। তখন পাহারারত রাজাকার ও পুলিশের মধ্যে কিছুটা শিথিলতা থাকে। নির্ধারিত সময়ে আজাদ পর পর কয়েকটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করলেন খোকা তালুকদারের বাড়িতে। বিকট শব্দে সেগুলো বিস্ফোরিত হলো। ওই বাড়িতে তখন শুরু হয়ে গেছে মহাপ্রলয়। এরপর আজাদের আর কিছু দেখার সুযোগ ছিল না। কারণ, বিস্ফোরণের পর সেখানকার রাজাকার এবং শহরের অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা গুলি করতে থাকে। তিনি দ্রুত ওই এলাকা থেকে সরে পড়েন। দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যান শহরের বাইরে। ওদিকে নজরুল ইসলামও একই সময়ে থানার ভেতরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। সেই গ্রেনেডও বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়।

AMARBOI.COM

আবুল কালাম আজাদ ১৯৭১ সালে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। টাঙ্গাইলের কাগমারীতে ২ মার্চ ছাত্র-যুবকদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ শুরু হলে তিনিও প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। কাদেরিয়া বাহিনী গঠিত হলে তিনি এ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হন। জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত তিনি টাঙ্গাইল শহরের প্রধান সড়ক, সদর থানার ক্যাম্পাস, পোস্ট অফিস, পাওয়ার হাউসসহ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। তিনি মূলত 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে গ্রেনেড হামলা চালাতেন। ১৭ আগস্ট টাঙ্গাইলে এক অপারেশনে আসার পথে তিনি ও নজরুল ইসলাম পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন। তখনই ইকবাল হোসেন নামের এক রাজাকার পর পর নয়টি গুলি করে নজরুল ইসলামকে হত্যা করে। আজাদকে পাকিস্তানি সেনারা সার্কিট হাউসে নিয়ে যায়। কাদেরিয়া বাহিনী সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়।

চরম নির্যাতনেও আবুল কালাম আজাদ কোনো তথ্য দেননি। পরে তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসে পাঠানো হয়। সেখানেও চলে নির্যাতন। শেষে সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হয়। বিচারে তাঁর ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫টি বেত্রাঘাতের আদেশ হয়। ২ ডিসেম্বর ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়। স্বাধীনতার পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল কালাম আজাদ, বীর বিক্রম

গ্রাম বিনোদপুর, ইউনিয়ন বিনোদপুর, সুধারাম নোয়াখালী। বাবা মকবুল আহম্মদ, মা ফুল বানু। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৭৫। শহীদ ১৯৭১।

আবুল কালাম আজাদ কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে মা-বাবার যোগাযোগ ছিল না। স্বাধীনতার পর মা-বাবা অপেক্ষায় থাকেন ছেলের। কিন্তু ছেলে আর ফিরে আসে না। দরিদ্র মা-বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি সৈয়দপুর সেনানিবাসে গিয়ে ছেলের খোঁজ নেওয়া। কয়েক মাস পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে জানানো হয়, তাঁদের ছেলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কোন দিন এবং কোথায় যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, সে তথ্য হয়তো চিঠিতে ছিল। কিন্তু সেই চিঠি হারিয়ে গেছে।

১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম দিকে সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, অনির্ধারিত সাঁতার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির অজুহাতে এই রেজিমেন্টের সেনাদের সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। বি ও ডি কোম্পানিকে পাঠানো হয় রংপুরের ঘোড়াঘাটে। সি কোম্পানিকে সৈয়দপুর-দিনাজপুর সড়কের মধ্যবর্তী মণ্ডলপাড়ায় মোতায়েন করা হয় বৈদ্যুতিক কেন্দ্রের পাহারায়। এ (আলফা) কোম্পানিকে পাঠানো হয় দিনাজপুরের পার্বতীপুরে। ওয়্যারলেস সেট ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র থাকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের নিয়ন্ত্রণে। এ সময় সেনানিবাসে অবস্থান করছিল রেজিমেন্টের রিয়ার পার্টি, ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার ও হেডকোয়ার্টার কোম্পানির কিছু সেনা।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ঢাকার গণহত্যার সংবাদ দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থানরত তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর পরপরই এই রেজিমেন্টের কোম্পানিগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিদ্রোহ করে। ৩০ মার্চ রাতে সেনানিবাসে অবস্থানরত বাঙালি সেনাদের ওপর পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করে। তখন বাঙালি সেনারা তাদের প্রতিরোধ করেন। এ যুদ্ধে অনেক বাঙালি সেনা শহীদ ও আহত হন। অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁরা পরে সমবেত হন দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে। তাঁরা দিনাজপুরের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে ভূষিরবন্দর (৫ ও ৬ এপ্রিল), পার্বতীপুর (৭ এপ্রিল), বদরগঞ্জ (৮ ও ৯ এপ্রিল), খোলাহাটি (১০ এপ্রিল), ফুলবাড়ী (১১ এপ্রিল) এবং হিলির যুদ্ধ (১৯-২০ এপ্রিল) উল্লেখযোগ্য। ২১ এপ্রিলের পর মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে অবস্থান নেন। এরপর জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত এলাকার রামগতি, ফুলবাড়ী, চরখাই, রামনগর, জলপাইতলী, রাজাই, আমবাড়ী, গৌরীপুর, মন্মথপুরসহ কয়েকটি জায়গায় অ্যামবুশ, রেইড ও কমান্ডো হামলা চালান। কোনো এক যুদ্ধে আবুল কালাম আজাদ শহীদ হন। এ সময় ৭০০ জন সদস্যের তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪১৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ক্যাম্পে দেখা যায়। অন্যরা শহীদ, আহত অথবা নিখোঁজ হন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল খায়ের, বীর বিক্রম

গ্রাম কাশারা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। বর্তমান ঠিকানা মধ্যপাড়া, কালীকচ্ছ ইউনিয়ন, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা মো. ননী মিয়া, মা মকছুদা খাতুন। স্ত্রী মাহমুদা খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও ছয় মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৬।

সারা দিন টহল আর খণ্ডযুদ্ধ শেষে ১০-১২ জনের একদল মুক্তিযোদ্ধা রাত ১২টার দিকে পালা করে বিশ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় খবর এল, পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অবস্থানের দিকে এগোচ্ছে। দলনেতা আবুল খায়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাদের প্রতিরোধ করতে। সামান্য অগ্রসর হতেই বুঝতে পারলেন, বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা ৫০ থেকে ৬০ গজ দূরত্বের একটি আম-কাঁঠালের বাগানে অবস্থান করছে। আবুল খায়েরের সঙ্গে একজন গুলির বাক্স বহনকারী থাকলেও বাকি সহযোদ্ধারা তখন বেশ দূরে। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটি গাছের আড়ালে অবস্থান নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন দিক থেকে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তানি সেনারা। তাঁর চোখের সামনে গুলির বাক্স বহনকারী যুবকের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পেছনে থাকা সহযোদ্ধারা আর সামনের দিকে এগোতে পারলেন না। তাঁরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলেন।

অন্ধকার রাতে আবুল খায়ের সম্পূর্ণ একা। সামনে অনেক পাকিস্তানি সেনা। তিনি কলেমা পড়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। জীবনের মায়া ছেড়ে দুটি প্রতিজ্ঞা করলেন, 'অন্তত ১০-১২ জন পাকিস্তানি শত্রুসেনাকে না মেরে মরব না' এবং 'শত্রুর গুলি যদি লাগে, বুকে লাগবে, কিন্তু পিঠে লাগতে দেব না'। একাই গুলিবর্ষণ শুরু করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সামনের দিক থেকে গুলিবর্ষণ কমতে লাগল। অনুমান করলেন, পাকিস্তানি একাধিক সেনা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। একপর্যায়ে তাঁর দুই হাতে একসঙ্গে গুলি লাগে। বাঁ হাতে দুটি আর ডান হাতে সাত-আটটি। দুই হাতই অবশ হয়ে গেল তাঁর। আর গুলি ছুড়তে পারছিলেন না। শত্রুসেনাদের বুঝতে না দিয়ে আহত আবুল খায়ের নিঃশব্দে পেছনের দিকে যেতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আবু বকর সিদ্দিক নামের এক সহযোদ্ধার (আনসার সদস্য) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর সহায়তায় দুই হাত পাটের রশি দিয়ে বেঁধে একটি খাল পার হয়ে ভোর পাঁচটার দিকে ভারতে পৌঁছান। বেঁচে যান তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা। ওই রাতে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ক্যাম্প দখল করে নেয়। পরে জানতে পারেন, তাঁর গুলিতে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়েছে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২২ আগস্টের। ঘটেছিল বুড়িপোতা এলাকায়।

বুড়িপোতা মেহেরপুরের অন্তর্গত একটি এলাকা। জেলা সদর থেকে এর অবস্থান পশ্চিম দিকে। পরে আহত আবুল খায়েরকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের ব্যারাকপুর হাসপাতালে। ২৩ আগস্ট রাতে তাঁর দুই হাতে অপারেশন করা হয়।

আবুল খায়ের চাকরি করতেন ইপিআরে। কর্মরত ছিলেন যশোরে। ২৫ মার্চের পর তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। আহত হওয়ার আগে যশোর ও মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল বাশার, বীর বিক্রম

গ্রাম বদলকোট, চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা আবদুল লতিফ মুন্সী, মা তাজকেরার নেছা।
স্ত্রী রৌশনারা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১১৮। শহীদ ৯ মে ১৯৭১।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান। আবুল বাশার একজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে একটি বাংকারে সতর্ক অবস্থায় আছেন। সকাল থেকেই শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ। গোলা এসে পড়তে লাগল তাঁদের অবস্থানের চারপাশে। ঘন্টা দুই পর তাঁরা দেখতে পেলেন দূরে একদল পাকিস্তানি সেনা। তারা তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে আসছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে একটি মেশিনগান, তিন-চারটি এলএমজি। বাকিগুলো সাধারণ অস্ত্র। অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল তাঁদের অস্ত্র। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের ভারী অস্ত্রের দাপটে মুক্তিযোদ্ধারা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। একপর্যায়ে শুরু হলো বিমান হামলা। পাকিস্তানি বিমান আকাশ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করল। এ সময় মুক্তিযোদ্ধা অনেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন।

আবুল বাশারসহ কয়েকজন মনোবল হারালেন না। তিনি সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করে চললেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলেন না। বিমান থেকে ছোড়া কয়েকটি গুলি এসে লাগল তাঁর মাথায়। শহীদ হলেন তিনি। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৯ মে তারিখের। ঘটেছিল বিবির বাজারে।

বিবির বাজার কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার অন্তর্গত। কুমিল্লা শহর থেকে ছয় কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। প্রতিরোধযুদ্ধের পর কুমিল্লা অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা সমবেত হন বিবির বাজারে। কুমিল্লা শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের বিবির বাজারের অবস্থানে আক্রমণ করতে থাকে। কয়েকবার সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। প্রতিবারই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হন। বিবির বাজারের প্রতিরক্ষা অবস্থানে বেশির ভাগই ছিলেন ইপিআর সদস্য। সেদিনের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আবুল বাশারসহ কয়েকজন শহীদ ও ১০-১২ জন আহত হন। পাকিস্তানি সেনাদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে সহযোদ্ধারা আবুল বাশারের লাশ উদ্ধার করে বিবির বাজারেই সমাহিত করেন।

আবুল বাশার চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা উইংয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমানউল্লাহ কবির, বীর বিক্রম

গ্রাম লাউদত্ত (খানবাড়ি), ইসলামপুর, জামালপুর। বাবা আহমদ আলী, মা জমিলা খাতুন। স্ত্রী ফিরোজা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭০। শহীদ ১৬ আগস্ট ১৯৭১।

আমানউল্লাহ কবির রেলওয়েতে চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসের মাঝামাঝি ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন।

জামালপুরের বকশীগঞ্জ থানার ধানুয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম কামালপুর। এ গ্রামের মাঝামাঝি সীমান্ত ফাঁড়ি। সীমান্তের ওপারে ভারতের মেঘালয় রাজ্য। ১৯৭১ সালে কামালপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। এখানে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল তাদের ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের একটি দল এবং বিপুলসংখ্যক রেঞ্জার্স, ইপিসিএএফ ও রাজাকার।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখানে অবস্থান নেওয়ার পর থেকে মুক্তিবাহিনী বিচ্ছিন্ন আক্রমণ ও গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের নাজেহাল ও হয়রানি করতে থাকে। ৩১ জুলাইয়ের যুদ্ধের পর থেকে প্রায় দিনই মুক্তিবাহিনীর দল কামালপুর এবং এর পার্শ্ববর্তী ধানুয়া, উঠানিপাড়া, ঘাসিরগাঁও, পালবাড়ী, বক্সপাড়া, মাঝির চর প্রভৃতি জায়গায় আকস্মিক আক্রমণ চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ আগস্ট মুক্তিবাহিনীর সুবেদার মনসুরের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের ১৩৫ জনের একটি দল আকস্মিকভাবে কামালপুরে আক্রমণ করে। তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। আমানউল্লাহ কবিরও স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মুক্তিযোদ্ধারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করা মাত্র তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। গোলাগুলির শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে ঘাঁটির একদম কাছাকাছি গিয়ে অবস্থান নেন।

৩১ জুলাইয়ের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের ঘাঁটিতে অত্যাধুনিক অস্ত্রের মজুদ আরও বৃদ্ধি করে। এর মধ্যে ছিল কয়েকটি ৮১ এমএম মর্টার ও দূরপাল্লার স্বয়ংক্রিয় ভারী মেশিনগান। পাশে বকশীগঞ্জে ছিল তাদের ৮৩ ইনডিপেনডেন্ট মর্টার ব্যাটারি। সেগুলো দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্র বলতে কেবল এলএমজি, স্টেনগান ও রাইফেল। হালকা অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই আমানউল্লাহ কবিরসহ মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলা করেই একটু একটু করে তাঁরা এগিয়ে যান। পাকিস্তানি সেনারা মাঝেমধ্যে আলো জ্বালিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল যুদ্ধস্থল। এই আলোর সাহায্যে তারা অনেক মুক্তিযোদ্ধার অবস্থান চিহ্নিত করে। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর তারা মেশিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু করে। এ অবস্থায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটতে বাধ্য হন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের তীব্র আক্রমণ উপেক্ষা করে আমানউল্লাহ কবিরসহ কয়েকজন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন আমানউল্লাহ কবির। এ যুদ্ধে আরও সাত-আটজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্টের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরব আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম লতিফপুর, সিলেট। বাবা মাহমুদ আলী, মা হারিছা বিবি। স্ত্রী বদরুননেছা। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০৩। মৃত্যু ১৯৯৫।

আরব আলীসহ তাঁর অধিনায়ক খবর পেলেন একদল পাকিস্তানি সেনা কাশিপুরে আসছে। কাশিপুর তাঁদের আওতার মধ্যে। অধিনায়ক বললেন পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করতে। মুক্তিযোদ্ধারা তৈরিই ছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই ইপিআর সদস্য। সীমান্তসংলগ্ন ক্যাম্প থেকে তাঁরা দ্রুত চলে এলেন কাশিপুরে। সেখানে আছে একটি সেতু। আরব আলী তাঁর দল নিয়ে অবস্থান নিলেন ওই সেতুর পশ্চিম প্রান্তে। একটু পর সেতুর পূর্ব প্রান্তে হাজির হলো একদল পাকিস্তানি সেনা। তারা সেতু অতিক্রম করে নিশ্চিন্তে হেঁটে যেতে থাকে পশ্চিম দিক বরাবর। তারা কল্পনাও করেনি মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি। গুলির আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল আরব আলীর দলের সবার অস্ত্র। নিমেষে হতাহত হলো বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা। আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত ও ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সেনারা যে যেভাবে পারল, পজিশন নিয়ে শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। যুদ্ধ চলল অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেল। যারা পালাতে পারল না, তারা আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকল।

কাশিপুর যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। ১৯৭১ সালের ২৭ বা ২৮ জুনের ঘটনা। সাপ্তাহিক পাকিস্তানি সেনা লরি ও জিপে করে সেখানে টহল দিতে আসে। সেতুর পূর্ব প্রান্তে দূরে এক জায়গায় গাড়ি রেখে হেঁটে সেতু অতিক্রম করে তারা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দিকে। আরব আলীরা যেখানে অ্যামবুশ করেছিলেন, সেখান দিয়েও যাচ্ছিল একদল পাকিস্তানি সেনা। সেনাদের দল তাঁদের অ্যামবুশের ভেতর আসামাত্র গুলি শুরু করেন তাঁরা। এতে নিহত হয় চার-পাঁচজন। যুদ্ধের পর তাঁরা আত্মগোপন করা পাকিস্তানি সেনাদের খুঁজতে বের হন। সেখানে কাছেই ছিল একটি পাকা বাড়ি। চারদিকে এর উঁচু দেয়াল। আরব আলীর মনে হলো, পাকিস্তানি সেনারা এ বাড়িতেই লুকিয়ে থাকতে পারে। কিছুক্ষণ পর ওই বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে এল হইচইয়ের শব্দ। সেখানে লুকিয়ে ছিল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা ওই পাকিস্তানি সেনাদের গুলি করেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন লেফটেন্যান্ট। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

আরব আলী ১৯৭১ সালে দিনাজপুর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে সীমান্ত বিওপিতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন যুদ্ধে। প্রতিরোধযুদ্ধে আহত হন। ভারতে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টর এলাকায়। গোয়ালহাটি, ছুটিপুর, বর্নি, গঙ্গাধরপুরসহ কয়েকটি এলাকায় তিনি সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলতাফ হোসেন, বীর বিক্রম

গ্রাম ভবানীপুর, ইউনিয়ন ওটরা, উজিরপুর, বরিশাল।
বাবা আবদুস ছোবহান মোল্লা, মা আছিয়া বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৬।
শহীদ অক্টোবর ১৯৭১।

বরিশাল জেলা সদরের উত্তর দিকে আড়িয়াল খাঁ নদের উপকূলে বাবুগঞ্জ থানা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মাঝেমধ্যে সেখানে হানা দিত। সড়ক বা নদীপথে এসে তারা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আবার চলে যেত। সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা এসে অবস্থান নেয় বাবুগঞ্জে। অক্টোবর মাসের ২ বা ৩ তারিখে (১৬ আশ্বিন) মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেলেন বরিশাল থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারের একটি দল সড়কপথে বাবুগঞ্জে আসছে। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা তাদের অ্যামবুশ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে বাবুগঞ্জ-বরিশাল সড়কের এক স্থানে অ্যামবুশ করে আড়ালে বসে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা দেখতে পান, পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে। সামনে মুক্তিযোদ্ধারা থাকতে পারে, ওরা কল্পনাও করেনি। তারা অস্ত্রের আওতায় আসামাত্র একসঙ্গে গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের সব অস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন পাকিস্তানি সেনা লুটিয়ে পড়ে।

তারপর কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। হতচকিত পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত অবস্থান নিয়ে শুরু করল পাল্টা গুলি। আলতাফ হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলা করছেন। হঠাৎ একটি গুলি এসে লাগে আলতাফ হোসেনের বুকে। সহযোদ্ধারা যে তাঁকে উদ্ধার করবেন, সে সুযোগও নেই। বুকে গুলি লাগলেও আলতাফ হোসেন দমে গেলেন না। গুলিবিদ্ধ অবস্থায়ই আরও কিছুক্ষণ গুলি চালিয়ে গেলেন। গুলি চালাতে চালাতে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। সেখানে যুদ্ধ চলে অনেকক্ষণ। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হন। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা পিছু হটে বরিশালে পালিয়ে যায়। সহযোদ্ধারা মুমূর্ষু অবস্থায় আলতাফ হোসেনকে উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। পরদিন সকালে তিনি মারা যান। সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চারজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

আলতাফ হোসেন ১৯৭১ সালে ছিলেন ২১-২২ বছরের যুবক। ১৯৬৮ সাল থেকে তিনি স্থানীয় বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে, বিশেষত জোতদার ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। একপর্যায়ে স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করে একটি দল গঠন করে তাঁদের নিয়ে ভারতে যান। সেখানে প্রশিক্ষণে দেরি হওয়ায় আবার নিজ এলাকায় চলে আসেন। পরে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে ও তাঁর দলকে মুক্তিবাহিনীর ৯ নম্বর সেক্টরের ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আলতাফ হোসেন উজিরপুর এলাকায় রায়েরহাট, আলতা, শকুন্দিয়া এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বানারীপাড়া থানা আক্রমণে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউ কে চিং মারমা, বীর বিক্রম

লাঙ্গিপাড়া, সদর, বান্দরবান। বাবা বাইসাউ মারমা
মা ম্রাংসানু মারমা। স্ত্রী তুইকানু মারমা। তাঁদের দুই ছেলে
ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০০।
গেজেটে নাম ইউ কে ঝিং।

ইউ কে চিং বয়সের কারণে অনেক কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না। তাঁর বয়স এখন প্রায় ৭৫ বছর। তিনি মারমা আদিবাসী। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাঙালিদের সঙ্গে তিনিও তাতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে তিনি রংপুর ইপিআর উইংয়ের অধীন লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা বিওপিতে কর্মরত ছিলেন। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর তিনি পাটগ্রাম এলাকায় অবস্থান নেন। পরে ৬ নম্বর সেক্টরের অধীন সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীসংলগ্ন চৌধুরীহাটের যুদ্ধের ঘটনা ইউ কে চিংয়ের প্রায়ই মনে পড়ে। ওই যুদ্ধের স্মৃতি তাঁকে বেশ পীড়া দেয়। সেখানে মুক্তিবাহিনীর লেফটেন্যান্ট সামাদসহ (আবু মঈন আশফাকুস সামাদ, বীর উত্তম) আরও কয়েকজন সহযোদ্ধা শহীদ হন। তিনিও শহীদ বা আহত হতে পারতেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার রায়গঞ্জের অন্তর্গত চৌধুরীহাট সীমান্তবর্তী এলাকা। নভেম্বরের মাঝামাঝি একদল মুক্তিযোদ্ধা সেখানে অবস্থান নেন। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিলেন। একটি দলে ছিলেন ইউ কে চিং। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্ত অবস্থান। রাতে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালান। সারা রাত যুদ্ধ চলে। ভোরে পাকিস্তানি সেনাদের দিক থেকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। রায়গঞ্জের পূর্ব দিকে দুধকুমার নদ। ইউ কে চিং ছিলেন এর উত্তর পারে। লেফটেন্যান্ট সামাদও সেদিকে ছিলেন। তাঁরা সেদিক দিয়ে রায়গঞ্জের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশে পড়েন। সেখানে একটি সেতুর নিচে বা বাংকারে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের ক্যামোফ্লেজ করা একটি এলএমজি পজিশন। রেকি করার কাজে জড়িত মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ওই সুরক্ষিত অবস্থান সম্পর্কে কিছুই টের পাননি। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্র সেখান থেকে পাকিস্তানি সেনারা বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকে। পরে মুক্তিবাহিনীর মূল দল এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও স্থল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পিছু হটে নাগেশ্বরীতে অবস্থান নেয়।

ইউ কে চিং চৌধুরীহাট ছাড়াও হাতীবান্ধা, পাখিউড়া, ভূরুঙ্গামারী, রৌমারীসহ কয়েকটি জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শুধু অস্ত্র নিয়েই নয়, তিনি কখনো কখনো আদিবাসীদের নিজস্ব প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার কৌশল প্রয়োগ করেও যুদ্ধ করেন। এর মাধ্যমে তিনি কয়েকটি জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের হতাহত করেন। আদিবাসীদের মধ্যে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র ইউ কে চিংই খেতাবপ্রাপ্ত যোদ্ধা। বিডিআরের চাকরি থেকে ১৯৮২ সালে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়ামিন চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম রণকেলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। বাবা আবদুল হামিদ চৌধুরী (হামদু মিয়া), মা সাইদুন বেগম। স্ত্রী সেহেলী চৌধুরী। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৬। মৃত্যু ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৬।

এয়ারফিল্ডের কাছাকাছি একটা জলাশয়। সেখানে মাছ ধরছেন কয়েকজন। গ্রামবাসী অনেকে প্রায়ই সেখানে মাছ ধরতে আসে। সেদিনও স্থানীয় দু-তিনজন এসেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ইয়ামিন চৌধুরীসহ আরও পাঁচজন। তাঁদেরও বেশভূষা ওই ব্যক্তিদের মতো। সবারই হাতে বড়শি।

ইয়ামিন চৌধুরী ও তাঁর পাঁচ সঙ্গী আসলে মাছ ধরছেন না, মাছ ধরার ভান করে ওখানে ঘাপটি মেরে আছেন। এভাবে কেটে গেল দেড়-দুই ঘণ্টা। হঠাৎ তারা একটি বিমানের শব্দ শুনতে পেলেন। ক্রমেই শব্দ বাড়তে লাগল। ভালো করে তাঁরা তাকাতেই দেখতে পেলেন, আকাশে একটি বিমান চক্কর দিচ্ছে। আসলে এ বিমানের জন্যই তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি অতিকায় সি-১৩০ প্লেন সেখানে অবতরণ করল।

বিমানটি থামামাত্র দ্রুত তাঁরা পজিশনে চলে গেলেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে এলএমজি। একটু পর গর্জে উঠল তাঁদের প্রত্যেকের হাতের অস্ত্র। টার্গেট থেকে তাঁদের দূরত্ব মাত্র দেড় থেকে দুই শ গজ। ফলে তাঁদের অস্ত্রের কোনো গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। গুলিবিদ্ধ বিমানটির একটি জায়গা থেকে ধোঁয়ার ছোট্ট একটা কুণ্ডলী বের হতে দেখা গেল। সেখানে পাহারায় থাকা পাকিস্তানি সেনারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। গোলাগুলির শব্দে সংলগ্ন গ্রামের লোকজনও পালিয়ে যাচ্ছিল। ইয়ামিন চৌধুরী ও তাঁর পাঁচ সহযোদ্ধা তাদের সঙ্গে মিশে চলে গেলেন নিরাপদ দূরত্বে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের জুন-জুলাইয়ের। ঘটেছিল সিলেট জেলার সালুটিকর বিমানবন্দরে। সেদিন তাঁদের অস্ত্রের গুলিতে পাকিস্তানি ওই বিমানের বেশ ক্ষতি হয়। বিমানচালক বিমানটি নিয়ে তখনই ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়। সেটি বিধ্বস্ত হয় ঢাকায় অবতরণ করতে গিয়ে।

ইয়ামিন চৌধুরী মুক্তিবাহিনীভুক্ত গণবাহিনীর যোদ্ধা ছিলেন। মেঘালয়ের ইকো ওয়ানে প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৫ নম্বর সেক্টরের ডাউকি ও ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন একটি কোম্পানির কমান্ডার। তিনি ও তাঁর অধীন মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁর কোম্পানি 'হিট অ্যান্ড রান' নীতি অনুসরণ করে অ্যামবুশ, রেইড, ডিমোলিশন, আকস্মিক আক্রমণসহ বিভিন্নমুখী অপারেশন চালায় এবং পাকিস্তানি সেনাদের বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয়। তিনি কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধেও অংশ নেন। এর মধ্যে ছাতক, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম অপারেশন মোল্লারগাঁও সেতু ধ্বংস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম এ মান্নান, বীর বিক্রম

গ্রাম সিদলাই, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।
বাবা মিন্নত আলী, মা সাহারা বানু।
স্ত্রী নূরজাহান আক্তার।
তাঁদের পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪।

১৯৭১ সালের আগস্টের মাঝামাঝি একদিন। নিয়মিত ও গণযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়া মুক্তিবাহিনীর একটি দল চিলমারীর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মূল অবস্থানে আক্রমণ করে। এম এ মান্নান ছিলেন একটি দলে। তিনি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য।

ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরবর্তী চিলমারী কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩২ বালুচ রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি ও তাদের সহযোগী এক কোম্পানি ইপিসিএএফ, দুই কোম্পানি রাজাকার ও দুই প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন ছিল। এদের মূল অবস্থান ছিল স্থানীয় রেলস্টেশন, হাইস্কুল ও ওয়াপদা অফিসে।

তখন মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ছিল খুবই কম। সীমিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই তাঁরা সেখানে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধের আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের কয়েকটি মেশিনগান, লাইট মেশিনগানসহ অন্য আরও কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে এসব অস্ত্রের বেশির ভাগই অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে তাঁরা কিছুটা বিপদেই পড়ে যান। রেলস্টেশনে পাকিস্তানি সেনাদের মেশিনগানের পজিশন বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। সেখান থেকে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ করছিল। তখন এম এ মান্নান ও তাঁর দুই-তিনজন সহযোদ্ধা সেই মেশিনগান ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। স্টেশনের উত্তর দিকে একটি বাংকারে ছিল সেটি। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধা আবদুর রহিম (বীর বিক্রম) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্রল করে সেদিকে যান। কিন্তু বাংকার লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। মেশিনগানের পজিশনের কাছাকাছি আরেকটি বাংকারে থাকা পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের দেখে গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেদিন সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

এম এ মান্নান ১৯৭১ সালে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। ২৭ মার্চের পর তিনি পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ করেন চট্টগ্রামের কুমিরা এলাকায়। তিনি তখন ছিলেন প্লাটুন কমান্ডার। এরপর তিনি তাঁর প্লাটুন নিয়ে যান হরিণায়, পরে ভারতের তেলঢালায়। এম এ মান্নান জেড ফোর্সের অধীনে ১১ নম্বর সেক্টরের রৌমারী এলাকার ঠাকুরের চর, নকশী বিওপি এবং বৃহত্তর সিলেট জেলার বড়লেখা, কমলগঞ্জসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন। কমলগঞ্জ যুদ্ধে তাঁর বুকে গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

১৯৮০ সালে এম এ মান্নানকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তখন তাঁর পদমর্যাদা ছিল সুবেদার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এয়ার আহমদ, বীর বিক্রম

গ্রাম বালুয়া, ইউনিয়ন মুন্সিরহাট, ফুলগাজী, ফেনী।
বাবা নজির আহম্মদ, মা রোকেয়া বেগম।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬।
শহীদ ৯ নভেম্বর ১৯৭১।

এয়ার আহমদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে মা-বাবা পাশের গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে তাঁকে চিঠি লেখেন। চিঠি পেয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ি যান তিনি। এর মধ্যে শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন। কয়েক দিন পর মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর আর বিয়ে করা হয়নি। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে।

ফেনী জেলার অন্তর্গত বিলোনিয়া। বিলোনিয়া থেকে রেললাইন চলে এসেছে ফেনী পর্যন্ত। পাশ দিয়ে সমান্তরাল কাঁচা রাস্তা। অক্টোবর মাসের শেষ দিক থেকে সেখানে একটানা বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিনও টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে চিথলিয়া-পরশুরামের মাঝামাঝি এক স্থানে ভোররাতে রেললাইনের পাশের রাস্তা ঘেঁষে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহল দলকে আক্রমণ করার জন্য। সকাল হলেই রেলট্রলিতে শুরু হবে পাকিস্তানি সেনাদের টহল। তারপর ভোরের আলো ফুটল। সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। এমন সময় চিথলিয়ার দিক থেকে অস্পষ্ট শব্দ এল।

এয়ার আহমদ ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা পরিষ্কার দেখতে পেলেন একটা রেলট্রলি। ট্রলিতে বসা বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা। তাদের সঙ্গে এক অফিসার। তারা বুঝতেই পারেনি মুক্তিবাহিনী এত কাছে ওত পেতে বসে আছে। মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা ওখানে অবস্থান নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এয়ার আহমদই ছিলেন সবচেয়ে সাহসী। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসছিলেন।

রেলট্রলিটা এগিয়ে আসছে। আওতার মধ্যে আসামাত্র এয়ার আহমদ ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অস্ত্র একসঙ্গে গর্জে উঠল। প্রথম গুলি করেন এয়ার আহমদই। একজন পাকিস্তানি সেনাও প্রাণে বাঁচতে পারল না। গোলাগুলির শব্দে চিথলিয়া ও পরশুরামে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা দুই দিক থেকেই গোলাগুলি শুরু করে।

এদিকে আক্রমণের তাৎক্ষণিক সাফল্যের আনন্দে বাংকার থেকে উঠে এয়ার আহমদ দৌড়ে গেলেন অদূরে পড়ে থাকা নিহত পাকিস্তানি এক সেনা অফিসারের দিকে। গোলাগুলির কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলেন। নিহত পাকিস্তানি অফিসারের কোমরে বাঁধা খাপ থেকে পিস্তলটি বের করে নিজের পকেটে রাখলেন। এরপর সেই অফিসারকে টেনে আনতে থাকলেন নিজেদের বাংকারের দিকে। ঠিক তখনই চিথলিয়ার দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া একটি বুলেট এসে লাগল তাঁর মাথায়। নিমেষে এয়ার আহমদের শরীরটা কুঁকড়ে গেল। তিনি শহীদ হলেন। দিনটি ছিল ৯ নভেম্বর। সহযোদ্ধারা তাঁকে সমাহিত করেন দক্ষিণ পৈথারা গ্রামে। এ গ্রাম তাঁর নিজ গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে।

এয়ার আহমদ ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকার পরশুরাম, মুন্সিরহাট, ফুলগাজী, সালধরসহ কয়েক স্থানে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাহী বক্স পাটোয়ারী, বীর বিক্রম

গ্রাম বাজাপ্তী, হাইমচর, চাঁদপুর। বাবা মফিজউদ্দিন পাটোয়ারী, মা জীবনেন নেছা। স্ত্রী লুৎফা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯০। শহীদ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি ২ নম্বর সেক্টরের একদল মুক্তিযোদ্ধা চাঁদপুরে গেরিলা অপারেশন চালাতে ভারত থেকে এসে অবস্থান নেন জেলার হাইমচর উপজেলায়। তাঁরা গোপন শিবির স্থাপন করেন গাজীপুর ইউনিয়নের বাজাপ্তী গ্রামে। তাঁরা বেশ কয়েকটি অপারেশন চালান। তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে পাকিস্তানি সেনারা রাজাকারদের সহায়তায় তাঁদের গোপন শিবিরের সন্ধান পেয়ে যায়। ৩০ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল চাঁদপুর থেকে বাজাপ্তী গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়। তাদের আসার খবর মুক্তিযোদ্ধারা আগেই পেয়ে যান। ফলে তাঁরা বেড়িবাঁধের পাশে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ শুরু করেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সেদিন পাকিস্তানি সেনারা চলে যায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের গোপন শিবির স্থানান্তর করেন রাঘবপুরের মজুমদারবাড়িতে।

১৮ বা ১৯ সেপ্টেম্বর সহযোগী রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে একদল পাকিস্তানি সেনা সেখানে আকস্মিকভাবে হানা দেয়। সেদিন শিবিরে এলাহী বক্স পাটোয়ারীসহ মাত্র তিনজন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করছিলেন। আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত তিন মুক্তিযোদ্ধা মনোবল না হারিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেন। এভাবে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ঠেকিয়ে রাখেন। যুদ্ধে দুই সহযোদ্ধা শহীদ এবং এলাহী বক্স পাটোয়ারী আহত হন। গুলিতে তাঁর ডান হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর তিনি কোনো রকমে সেখান থেকে পালিয়ে নিজের বাড়িতে (বাজাপ্তী গ্রামে) চলে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

২১ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে একদল পাকিস্তানি সেনা গানবোটযোগে বাজাপ্তীতে এসে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাঁকে আটক করে নদীর তীরে নিয়ে হত্যা করে। ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা এলাহী বক্স পাটোয়ারীর নিষ্প্রাণ মরদেহ কয়েক ঘণ্টা পড়ে থাকে নদীর তীরে। পরদিন পরিবারের সদস্যরা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করেন।

এলাহী বক্স পাটোয়ারী আনসার বাহিনীতে চাকরি করতেন। প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। চাঁদপুরের পতন হলে ভারতে চলে যান। সেখানে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জুলাইয়ে দেশের ভেতরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর গেরিলা আক্রমণ চালানোর জন্য ২ নম্বর সেক্টর থেকে মুক্তিবাহিনীর স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণযোদ্ধাদের চাঁদপুরে পাঠানো হয়। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এলাহী বক্স পাটোয়ারীসহ নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস আই এম নূরুন্নবী খান

বীর বিক্রম

গ্রাম লক্ষ্মীধরপাড়া, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। বর্তমান ঠিকানা শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা। বাবা হাবীবউল্লাহ খান, মা শামছুন নাহার বেগম। স্ত্রী জাকিয়া মাহমুদা ও সুলতানা নবী। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭।

সালুটিকর সিলেট জেলার অন্তর্গত। শহর থেকে সাত কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। নবাটিলার দক্ষিণ দিক ঘেঁষে বিমানঘাঁটি এলাকা। সালুটিকরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষাব্যূহ। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী সেখানে আক্রমণ করে। কয়েক দিন যুদ্ধ চলে। ১২ ডিসেম্বরের যুদ্ধই ছিল চূড়ান্ত যুদ্ধ। সেদিন সকাল থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অবস্থানে আর্টিলারি আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীও পাল্টা জবাব দেয়। পরে পাকিস্তানি সেনারা মার্চ করে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের একদম কাছে চলে এলে কৌশলগত কারণে এস আই এম নূরুন্নবী খান সহযোদ্ধাদের গুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

পাকিস্তানি সেনারা প্রথমে পাশের দাড়িকান্দি দখল করে নদীর তীরবর্তী চৌধুরীকান্দি ও কচুয়ারপাড় এলাকায় আসতে থাকে। কাছেই ছিল সরকারি ডাকবাংলো। সেখানে একদল মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন অধিনায়ক এস আই এম নূরুন্নবী খান। তাঁর সঙ্গে আছেন মিত্রবাহিনীর কর্নেল রাজ সিং। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে আসামাত্র রাজ সিং বারবার নূরুন্নবী খানকে গুলি করার অনুরোধ জানান। দুঃসাহসী নূরুন্নবী খান তা না করে বললেন, শত্রুদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হবে।

পাকিস্তানি সেনারা এক সারিতে এগিয়ে আসতে থাকে। তারা ভেবেছিল, মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে গেছেন। ১০ গজের মধ্যে আসামাত্র নূরুন্নবী খান তাদের লক্ষ্য করে বলেন, হ্যান্ডস আপ। এতে পাকিস্তানি সেনারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। সামনে থাকা কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে। পেছনে থাকা পাকিস্তানি সেনারা এদিক-সেদিক দৌড়ে পালায়। তারপর শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে নিহত হয় বহু পাকিস্তানি সেনা। বন্দী হয় বেশ কয়েকজন। সন্ধ্যার মধ্যেই গোটা সালুটিকর এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।

এস আই এম নূরুন্নবী খান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় প্রশিক্ষণরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। ২৭ মার্চ সেখান থেকে কৌশলে দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সঙ্গে ঢাকায় এসে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে যাওয়ার পর তিনি কিছুদিন মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেলটা কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নেন। এর মধ্যে বাহাদুরাবাদ, ছাতক, গোয়াইনঘাট, রাধানগর, ছোটখেল ও সালুটিকর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

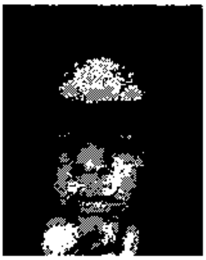

ওয়ালী উল্লাহ্, বীর বিক্রম

গ্রাম ছোট জীবনগর, ইউনিয়ন খিলপাড়া, চাটখিল নোয়াখালী। বাবা করিম বক্স, মা আমিরের নেছা। স্ত্রী আমিরের নেছা। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯। মৃত্যু ১৯৯৪।

ওয়ালী উল্লাহর দলনেতা লুৎফর রহমান খবর পেলেন, যেকোনো সময় প্যাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল তাঁদের এলাকায় আসতে পারে। তিনি ওয়ালী উল্লাহকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দ্রুত অ্যামবুশ করার নির্দেশ দিলেন। ওয়ালী উল্লাহ্ ফাঁদ পাতলেন বগাদিয়ায়। এ সময় তাঁর দলনেতা এগিয়ে গেলেন প্যাকিস্তানি সেনাদের গতিবিধি দেখতে। দলনেতা ফিরে আসার আগেই অ্যামবুশস্থলে একটি পিকআপ ভ্যানে করে এসে নামল প্যাকিস্তানি সেনারা। ওয়ালী উল্লাহ্ দলনেতার অপেক্ষায় না থেকে আক্রমণ চালালেন। আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত পাকিস্তানি সেনারা। উল্টে পড়ে গেল পিকআপ ভ্যান। নিহত হলো দুই পাকিস্তানি সেনা। পিকআপ ভ্যানে ছিল একজন জেসিওসহ ছয়জন সেনা। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে এল আরও কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। যুদ্ধ চলল কয়েক ঘণ্টা। পাল্টাপাল্টি আক্রমণে ওয়ালী উল্লাহর রণকৌশল ও দুঃসাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে হতাহত সেনাদের নিয়ে চৌমুহনীর দিকে চলে যায়। যুদ্ধে ওয়ালী উল্লাহ নিজে সামান্য আহত হলেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। একটি গুলি তাঁর কপাল ঘেঁষে চলে যায়।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মে মাসে। বগাদিয়া নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ এলাকার একদল মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার মেজর লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে নিজ এলাকাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। এই দলে ছিলেন ওয়ালী উল্লাহ।

ওয়ালী উল্লাহ্ প্যাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ডেপুটেশনে ক্যাডেট কলেজে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। ২৫ মার্চ তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ছিলেন। সেখান থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। নোয়াখালীর চাটখিল, বেগমগঞ্জ, চন্দ্রগঞ্জ, সোনাইমুড়িসহ কয়েকটি জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেন।

১৯৭৮ সালে চাকরি থেকে তিনি অবসর নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দকার আজিজুল ইসলাম, বীর বিক্রম

গ্রাম বানিয়াড়া, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
বাবা খন্দকার নূরুল ইসলাম, মা সালেহা খাতুন।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২৩।
শহীদ ২২ নভেম্বর ১৯৭১।

খন্দকার আজিজুল ইসলামের বড় বোন নূর বেগম তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, '...আমার মা ছিলেন আগের দিনের মানুষ। বাবুল (খন্দকার আজিজুল ইসলাম) মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আগে মায়ের কাছে গল্প বলত। একদিন বলল, এক দেশে যুদ্ধের কারণে তরুণদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। রিক্রুটমেন্ট সেন্টারে সমবেত ব্যক্তিদের বাড়িতে কে কে আছে জিজ্ঞেস করায় সবাই বলল যে মা-বাবা, ভাই-বোন আছে। শুধু একজন বলল, বাড়িতে তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। তখন কর্তৃপক্ষ তাকে বলে, মাকে দেখাশোনা করাই তার বড় দায়িত্ব। এই বলে তাকে ফেরত পাঠায়। বাড়ি আসার পর মা ছেলের কাছে ফিরে আসার কারণ জানতে চান। ছেলে বলল, "তোমার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া হলো না।" এরপর মা আত্মহত্যা করেন, যাতে ছেলে দেশের জন্য যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। এই গল্প বলে বাবুল বলত, "মা, তুমি ওই রকম মা হতে পারো না!" তারপর মে মাসের প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাবুল কাউকে না বলে লুকিয়ে চলে যাচ্ছিল। ধরা পড়ে যাওয়ায় মাকে বলে, "তুমি তো সব দেখছ। দেশের ওপর অত্যাচার, নারীদের ওপর নির্যাতন, এটা সহ্য করা যায় না। আমাকে দেশের জন্য কিছু করতেই হবে।"'

খন্দকার আজিজুল ইসলাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে চাচাতো ভাই আজিমকে (চিকিৎসক ও মুক্তিযোদ্ধা) সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আসেন। তারপর কয়েকজনের সঙ্গে মিলে দল বেঁধে ভারতের আগরতলায় যান। তাঁদের মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর তিনি সীমান্ত এলাকায় ছোটখাটো অপারেশনে অংশ নেন। এরপর তিনি প্রথম বাংলাদেশ অফিসার্স ওয়ার কোর্সে যোগ দেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা রেলস্টেশনের পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে চন্দ্রপুর। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২২ নভেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে সেখানকার পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন খন্দকার আজিজুল ইসলাম। চন্দ্রপুরে সেদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর একজন মেজর (কোম্পানি কমান্ডার), তিনজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারসহ ৪৫ জন এবং মুক্তিবাহিনীর লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলামসহ ২২-২৩ জন শহীদ হন। আহত হন ৩৫ জন। সারা রাত যুদ্ধ চলে। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পিছু হটে। মুক্তি ও মিত্রবাহিনী চন্দ্রপুর দখল করে নেয়। কিন্তু বেশিক্ষণ এই অবস্থান তাঁদের পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। কয়েক ঘণ্টা পর পাকিস্তানি সেনারা আবারও প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে চন্দ্রপুর-লতুয়ামুড়া দখল করে নেয়। পরে খন্দকার আজিজুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করে সমাহিত করা হয় চন্দ্রপুর মসজিদের পাশে।

খন্দকার আজিজুল ইসলাম ১৯৭১ সালে ঢাকা কলেজের বিএ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দকার নাজমুল হুদা, বীর বিক্রম

বগুড়া রোড, বরিশাল। আদি নিবাস কোদালিয়া নগরকান্দা, ফরিদপুর। বাবা খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন মা বদরুন নেছা খাতুন। স্ত্রী নীলুফার দীল আফরোজ বানু। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ০১। মৃত্যু ৭ নভেম্বর ১৯৭৫।

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার বর্নি বিওপি। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। ছিল প্রায় ৭৫ জন পাকিস্তানি সেনা। ওই ঘাঁটির কারণে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে সহজে অপারেশন করতে পারছিলেন না। আগস্টের প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা সিদ্ধান্ত নিলেন সেখানে আক্রমণের। ৫ আগস্ট দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা তাঁর নেতৃত্বে আক্রমণ চালান। তাঁর পণ, পাকিস্তানি সেনাদের সেখান থেকে তাড়াবেনই। শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনারা তাদের ১৫ জনের লাশ ফেলে পালিয়ে যায়।

যুদ্ধ জয়ের পর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নাজমুল হুদা তা তদারক করছিলেন। হঠাৎ আরেক দল পাকিস্তানি সেনা পেছন থেকে এসে তাঁদের ওপর আক্রমণ করে। এর জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। মুহূর্তে হকচকিত অবস্থা কাটিয়ে উঠে তাঁরা আবার শুরু করেন আক্রমণ। খন্দকার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। তিনি নিজেও অস্ত্র হাতে সহযোদ্ধাদের পাশে থেকে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। একপর্যায়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের আওতার মধ্যে পড়ে যান। তখন কয়েকজন সহযোদ্ধা তাঁকে পেছনে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। সেদিন চারজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং কয়েকজন আহত হন।

খন্দকার নাজমুল হুদা ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি শুধু অধিনায়কত্ব বা নির্দেশ দিতেন না, বেশির ভাগ সময় নিজেও প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বয়রা সাব-সেক্টরের অধীনে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসবের মধ্যে রঘুনাথপুর, যাদবপুর, বেলতা, গঙ্গানন্দ, বর্নি, চৌগাছা-মাসলিয়া ও চৌগাছার যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ২০-২১ নভেম্বর চৌগাছার গরীবপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ ছাড়া তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী অসংখ্য অ্যামবুশ, ডিমোলিশনসহ আকস্মিক আক্রমনও চালায়।

খন্দকার নাজমুল হুদা চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি তথাকথিত আগরতলা মামলার অভিযুক্ত হিসেবে অনেকের সঙ্গে তাঁকেও আটক করা হয়। তিনি ছিলেন ২৭ নম্বর আসামি। তখন ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তিনি বেকসুর খালাস পান। কিন্তু তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। স্বাধীনতার পর তাঁকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। তখন তাঁর পদবি ছিল কর্নেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবিরুজ্জামান, বীর বিক্রম

গ্রাম কাজীপাড়া, ইউনিয়ন বাহাদুরপুর, পাংশা, রাজবাড়ী। বাবা আবদুল জব্বার মৃধা, মা সুফিয়া খাতুন। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪০। শহীদ অক্টোবর ১৯৭১।

১৯৭১ সালের অক্টোবরের প্রথম দিক। খবিরুজ্জামানসহ তিনজন নৌ-কমান্ডো ভারত থেকে রওনা হলেন মাদারীপুরের উদ্দেশে। টেকেরহাট ফেরিঘাট আক্রমণ করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। নিরাপত্তার জন্য তাঁরা রাতে চলাচল করতেন। আবার যাত্রাপথও তাঁদের অচেনা। অনেক কষ্টে যুদ্ধাস্ত্র, মাইনসহ তাঁরা মাদারীপুরের রাজৈরে গোপন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছালেন সাত দিন পর। সেখানে অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর তাঁরা অক্টোবরের শেষ দিকে টেকেরহাট ফেরিঘাট আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের নিরাপত্তা দেবে স্থল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল।

নির্ধারিত দিন রাত একটায় খবিরুজ্জামান ও অন্য দুই নৌ-কমান্ডো বুকে মাইন বেঁধে পানিতে নেমে এগিয়ে যেতে থাকেন। খবিরুজ্জামানের দুই সহযোদ্ধা তাঁদের টার্গেট খুঁজে পেলেও তিনি তাঁর টার্গেট (টহলবোট) খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এ জন্য তিনি পানি থেকে মাথা উঁচু করে তা খুঁজতে থাকলে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে দেখে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছোড়া এক ঝাঁক গুলিতে খবিরুজ্জামানের মাথা ও দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনি শহীদ হন। অপারেশনস্থলে ঠিকমতো রেকি না হওয়ায় এই বিপর্যয় ঘটে। রেকি করার দায়িত্ব ছিল স্থলযোদ্ধাদের ওপর। তাঁরা সে দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেননি। অন্য দুজন কমান্ডো সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মাইনের আঘাতে ফেরিঘাটের পন্টুন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।

ঘটনার তিন দিন পর খবিরুজ্জামানের সহযোদ্ধারা জানতে পারেন যে টেকেরহাট থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরের এক স্থানে নদীতে ডুবুরির পোশাক পরা একটি লাশ ভেসে আছে। তখন তাঁরা সেখানে গিয়ে খবিরের লাশ শনাক্ত করেন; কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভয়ে তাঁরা খবিরুজ্জামানের লাশ দাফন করতে না পেরে ডুবুরির পোশাক খুলে কুমার নদেই ভাসিয়ে দেন।

খবিরুজ্জামান নৌ-কমান্ডোর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর চট্টগ্রামে অপারেশনে প্রথম অংশ নেন। তাঁর পরবর্তী অভিযান ছিল খুলনার চালনা বন্দরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালেদ সাইফুদ্দীন আহমেদ

বীর বিক্রম

গ্রাম কাটদহ, মিরপুর, কুষ্টিয়া। বাবা মহিউদ্দীন আহমেদ, মা রমেলা খাতুন। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬২। গেজেটে নাম খালেদ সাইফুদ্দীন। শহীদ ৫ আগস্ট ১৯৭১।

তখন ভোর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের এক গোপন শিবিরে ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধারা কেউ ঘুমিয়ে, কেউ বা জেগে। এমন সময় খবর এল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁদের শিবিরের পাশের গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাবে। শিবিরে ছিলেন খালেদ সাইফুদ্দীন আহমেদসহ ৩৫ থেকে ৩৬ জন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলকে আক্রমণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এরপর ঘটতে থাকে একের পর এক নানা ঘটনা। শেষে মুক্তিযোদ্ধারাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অ্যামবুশে পড়েন। তখন যুদ্ধে শহীদ হন খালেদ সাইফুদ্দীন আহমেদসহ আটজন মুক্তিযোদ্ধা। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৫ আগস্টের। ঘটেছিল বাগোয়ানে।

বাগোয়ানের অবস্থান চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর জেলার সীমান্তে। এর পাশেই যোধপুরে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন শিবির। অদূরে নাটুদহের হাজার দুয়ারী স্কুলে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। আরেকটি ঘটনা সেদিন ঘটে। কিছুক্ষণ পর মুক্তিযোদ্ধারা খবর পান, বাগোয়ান গ্রামের মাঠ থেকে দুজন রাজাকার জোর করে ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আসলে সেটা ছিল মিথ্যা খবর। খালেদ সাইফুদ্দীন আহমেদসহ সাতজন মুক্তিযোদ্ধা বাগোয়ানে যান। পরে তাঁরা আরেকটু এগিয়ে যান রতনপুর ঘাটে। সেখানে তাঁদের এক সহযোদ্ধা বোকামি করে একটি ফাঁকা গুলি ছোড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসে তাঁদের দিকে। অবস্থা বেগতিক দেখে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত পিছিয়ে বাগোয়ানে যান এবং সেখানকার একটি ব্যগানে আশ্রয় নেন। এর মধ্যে আরও ২৪ জন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে আসেন। তারপর তাঁরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে একদল রওনা হলেন রতনপুরের দিকে, আরেক দল কাভারিং পার্টি হিসেবে থেকে গেলেন পেছনে।

রতনপুরের দিকে এগোতে থাকা দলে ছিলেন খালেদ সাইফুদ্দীন আহমেদসহ ১৫ জন। তাঁরা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ায় চরম বিপদে পড়েন। পথে পাকিস্তানি সেনারা ইংরেজি 'ইউ' শেপে অ্যামবুশ করে লুকিয়ে ছিল। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আক্রমণ করে। এতে প্রথমেই শহীদ হন দু-তিনজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁদের বেশির ভাগ অস্ত্রও ছিল সেকেলে। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনারা ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। খালেদসহ দু-তিনজন বুঝতে পারলেন, তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে পারবেন না। ততক্ষণে পাকিস্তানি সেনারা খুব কাছাকাছি এসে তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। তারা খুব কাছ থেকে খালেদ সাইফুদ্দীন আহমেদ ও অন্যদের গুলি করে হত্যা করে।

খালেদ সাইফুদ্দীন আহমেদ ১৯৭১ সালে কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের লালবাজার সাব-সেক্টর এলাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিজির আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম কার্তিকদিয়া, সদর, বাগেরহাট।
১৯৬০ সাল থেকে স্থায়ীভাবে খুলনায় বসবাস।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৫। গেজেটে নাম মি. খিজির।

খিজির আলী যুদ্ধ করেন ৯ নম্বর সেক্টরের হিঙ্গলগঞ্জ সাব-সেক্টর এলাকায়। ১৯৭১ সালে ছিলেন মেকানিক। তখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন।

খিজির আলীর অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ ছিল না। তার পরও ২৬ মার্চ খুলনা মহানগরের বৈকালি এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা সামান্য বন্দুক দিয়ে তিনি অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখেন। খুলনার পতন হলে তিনি ভারতে যান। সেখানে কয়েক দিন প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার টাউন শ্রীপুরে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে সফল অপারেশন করেন। তাঁরা ৩১ জন মুক্তিযোদ্ধা একযোগে গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ শেষে প্রথম অংশ নেন অপারেশন জ্যাকপটে। ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে একদল নৌ-কমান্ডো মংলা বন্দরে লিমপেট মাইনের সাহায্যে কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। খিজির আলীর দলের ওপর দায়িত্ব ছিল নৌ-কমান্ডোদের অবস্থানস্থলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ও তাঁদের গাইড হিসেবে কাজ করা। তাঁদের রেকি করা তথ্যের ভিত্তিতেই নৌ-কমান্ডোরা সফলতার সঙ্গে অপারেশন করেন। পরে আরও কয়েকটি অপারেশনে তিনি নৌ-কমান্ডোদের সঙ্গে অংশ নেন। এর মধ্যে আশাশুনি থানা দখলের অভিযান উল্লেখযোগ্য।

আশাশুনি সাতক্ষীরার অন্তর্গত জেলা সদর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। আশাশুনিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল বিপুলসংখ্যক রাজাকার। অক্টোবরের মাঝামাঝি মুক্তিযোদ্ধা ও নৌ-কমান্ডোরা যৌথভাবে সেখানে আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্ব দেন খিজির আলী। দুই দিন সেখানে যুদ্ধ চলে। প্রথম দিন সারা রাত যুদ্ধ হয়। পরদিন মুক্তিযোদ্ধারা পুনর্গঠিত হয়ে আবার পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালান। এদিন তাঁরা পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের ফাঁকি দিয়ে থানার ঘাটে ভাসমান ফেরি পন্টুনে কয়েকটি মাইন লাগান। মাইন বিস্ফোরণে গোটা ফেরিঘাট তছনছ হয়ে যায়। লোহার পাত বিভিন্ন দিকে ছিটকে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের মধ্যে তীব্র ভীতি সৃষ্টি হয়। এ সময় দুঃসাহসী খিজির আলী দুই হাতে দুটি এলএমজি নিয়ে ঝড়ের বেগে গুলি করতে করতে থানার ভেতরে ঢুকে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ে। তাঁর ভয়াল রণমূর্তি দেখে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা এতই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলেই পালাতে থাকে। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা সহজেই আশাশুনি থানা দখল করে নেন। ১১ জন পাকিস্তানি সেনা ও ৪০ জন রাজাকার তাঁদের হাতে নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা অবশ্য বেশিক্ষণ আশাশুনি থানার দখল ধরে রাখতে পারেননি। পরদিন পাকিস্তানি হেলিকপ্টার বৃষ্টির মতো গুলি ও বোমা ফেলতে থাকে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম মোস্তফা, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক

গ্রাম ঝনকি, দোহার, ঢাকা। বর্তমান ঠিকানা হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। বাবা গোলাম মো. ফালু শেখ, মা আমেনা আছিয়া আক্তার। স্ত্রী শামীমা আক্তার। তাঁদের চার ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৪ ও ১১৫।

গোলাম মোস্তফা ছোটবেলা থেকেই জেদি ও অভিমানী। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বাবা কয়েকবার চেষ্টা করেন তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনার। এ নিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে বাবার রাগারাগি হয়। তাতে তিনি খুব কষ্ট পান। সে জন্য স্বাধীনতার পর বাবার সঙ্গে দেখা করেননি, যাননি পৈতৃক বাড়িতেও।

গোলাম মোস্তফা চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার-নির্যাতন দেখে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ তাঁকে উদ্দীপ্ত করে। তখন তিনি ১৮ বছরের যুবক। কয়েক দিন পরই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে।

গোলাম মোস্তফা ছিলেন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানিতে। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা সমবেত হয় বৃহত্তর সিলেটের মাধবপুরে। তাঁরা জানতে পারেন, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শেষে একদল পাকিস্তানি সেনা যাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। আলফা কোম্পানির অধিনায়ক তাঁদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলকে অ্যামবুশ করার নির্দেশ দেন। এ জন্য রাতের অন্ধকারে মোস্তফাসহ ১৫-১৬ জন মাধবপুর উপজেলার গোপালপুরে যান। সেখানে সড়কের একটি মোড়ে তাঁরা অ্যামবুশ করেন। তাঁদের কেউ নিজেকে গাছের নিচে লতাপাতায় ঢেকে, কেউ গাছে অবস্থান নেন। সবার দৃষ্টি রাস্তার দিকে। এর মধ্যে ওই সড়ক দিয়ে একটি-দুটি করে কয়েকটি গাড়ি যাওয়া-আসা করে। তাঁরা অপেক্ষায় থাকেন একসঙ্গে কয়েকটি গাড়িতে আক্রমণ করার জন্য। এই সিদ্ধান্ত তাঁদের বিপদই ডেকে আনে। এর মধ্যে সেখানে দুজন অপরিচিত লোক আসে। তারা সামনে যেতে চাইলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সামনে যেতে নিষেধ করেন। এরপর তারা পেছন দিকে চলে যায়।

সকাল হওয়ার পর গোলাম মোস্তফা ও তাঁর সহযোদ্ধারা দেখেন, পাকিস্তানি সেনারা তিন দিক থেকে তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। ওই অপরিচিত লোক দুজন ছিল আসলে পাকিস্তানি সেনাদের দোসর। তারা পাকিস্তানি সেনাদের খবর দিয়েছে। তখন পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ লড়াই করা মানে জীবন বিলিয়ে দেওয়া। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা সামনে এগিয়ে বিরাট এক পাটখেতে ঢুকে যান। তার পাশেই ছিল একটি খাল। সেখানে অবস্থান নিয়ে গুলি শুরু করেন। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা গুলি শুরু করে। কয়েক ঘণ্টা গুলি-পাল্টা গুলির পর তাঁরা ধর্মগড়ে পশ্চাদপসরণ করেন।

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চান্দুরা এক যুদ্ধে মোস্তফা আহত হন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর হঠাৎ গুলি করতে থাকে। তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তাঁর দুই পায়েই এলএমজির গুলি লাগে। পরে তাঁর এক পা কেটে ফেলা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম রসুল, বীর বিক্রম

গ্রাম চকচন্দ্রপুর, ইউনিয়ন বিনাউটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা মফজল ভূঁইয়া, মা পরিজ্ঞারের নেছা। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৩। শহীদ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

গোলাম রসুল ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিলেট সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সের ৩ নম্বর উইংয়ের বি কোম্পানিতে। এই কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন সুবেদার ফজলুল হক চৌধুরী। কোম্পানির দুই প্লাটুনের একটি সিলেটের শমশেরনগর বিমানবন্দর রক্ষণাবেক্ষণে, অপরটি প্রশিক্ষণরত ছিল। গোলাম রসুল ছিলেন শমশেরনগরে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের খবর পেয়ে বিদ্রোহ করে সিলেটে তাঁরাই প্রথম ২৭ মার্চ শমশেরনগর বিমানবন্দরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে সিলেটে চলে যেতে বাধ্য হয়। পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করে। তখন তাঁরা সেখান থেকে পিছিয়ে গিয়ে মাধবপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অবস্থানগুলোর সন্ধান পেয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ও বিমান হামলার মধ্যেও তাঁরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু অব্যাহত হামলার মুখে তাঁরা টিকে থাকতে ব্যর্থ হন। এরপর তাঁরা ভারতে চলে যান।

ভারতে পুনর্গঠিত হওয়ার পর গোলাম রসুল যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরের বড়পুঞ্জী সাব-সেক্টর এলাকায়। এই সাব-সেক্টর ছিল সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার অংশবিশেষ নিয়ে। এই এলাকায় ছিল পাহাড়ি টিলা, চা-বাগান, অসংখ্য খালবিল, ঝোপ-জঙ্গল। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের পর তাঁরা একের পর এক অ্যামবুশ, আকস্মিক হামলা, ডিমোলিশনসহ বিভিন্ন ধরনের অপারেশন চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের পর্যুদস্ত করেন। ১৪ ডিসেম্বর চিকনাগুলে সরাসরি এক যুদ্ধে গোলাম রসুল শহীদ হন।

সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার চিকনাগুল সীমান্তবর্তী এলাকা। সেখানে চা-বাগানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি ছিল। সারা দেশে তখন মুক্তিযোদ্ধাদের জয়জয়কার। বাংলাদেশের বেশির ভাগ এলাকা তাঁদের দখলে। কিন্তু চিকনাগুলে তখনও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। ভৌগোলিক কারণে চিকনাগুলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কাজেই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই ঘাঁটি আক্রমণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৩ ডিসেম্বর গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা ওই ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান। এই দলে গোলাম রসুলও ছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রবলভাবে প্রতিরোধ করতে থাকে। ১৪ ডিসেম্বর সকালে মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ করেন। গোলাম রসুলসহ কয়েকজন যুদ্ধ করতে করতে পাকিস্তানি অবস্থানের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তাঁদের প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের এলএমজির গুলি এসে লাগে গোলাম রসুলের গায়ে। তিনি শহীদ হন। গোলাম রসুলসহ আরও দুজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনের বিনিময়ে মুক্ত হয় চিকনাগুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগৎজ্যোতি দাস, বীর বিক্রম

গ্রাম জলসুখা (ইছবপুর), আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
বাবা জিতেন্দ্র দাস, মা হরিমতি দাস। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৪। শহীদ ১৬ নভেম্বর ১৯৭১।

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত বদলপুর। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকা ৩ নম্বর সেক্টরের আওতাভুক্ত ছিল। কিন্তু এই এলাকার বেশ কিছু যুদ্ধ ৫ নম্বর সেক্টরের বড়ছড়া সাব-সেক্টর থেকে পরিচালিত হয়েছে। ১৫ নভেম্বর জগৎজ্যোতি দাসের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ নিয়ে টেকেরঘাট থেকে নৌকাযোগে বানিয়াচংয়ে আসছিলেন। টেকেরঘাট সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থানার অন্তর্গত। ১৬ নভেম্বর সকালে তাঁরা বদলপুরে পৌঁছান। সেখানে এসে জগৎজ্যোতি জানতে পারেন, একদল রাজাকার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে বসে চাঁদা আদায় করছে। এ কথা শুনে তিনি তাদের ওপর আক্রমণ করেন। তাঁদের আক্রমণে দুজন রাজাকার নিহত হয় এবং দুজন আত্মসমর্পণ করে। বাকি সবাই পালিয়ে যায়।

এমন সময় পাশের জলসুখা গ্রাম থেকে গুলি আসতে থাকে। এ গ্রামেই জগৎজ্যোতির বাড়ি। তিনি কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে সেদিকে রওনা হন। বাকিদের দুই ভাগে ভাগ করে একদল পাঠান পিটুয়াকান্দি, অন্য দল পাঠান আজমিরীগঞ্জের দিকে। এর মধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটি দল শাল্লা ও আজমিরীগঞ্জ থেকে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। অবস্থা প্রতিকূল দেখে জগৎজ্যোতি জলসুখায় না গিয়ে পিটুয়াকান্দিতে চলে আসেন। সেখানে কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে থাকে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ধাওয়া করেন। ধাওয়ার একপর্যায়ে জগৎজ্যোতি মাত্র তিনজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অনেক তফাতে চলে যান। মূল দল বেশ পেছনে পড়ে থাকে এবং তারা সত্যিকার অর্থেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। জগৎজ্যোতি তাঁর তিন সহযোদ্ধাকে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের একপর্যায়ে তাঁর সহযোদ্ধা আবু লাল, গোপেন্দ্র ও উপেন্দ্র শহীদ হন। তাঁর বাঁ পাঁজরে গুলি লাগে। আহত জগৎজ্যোতিকে ধরার জন্য পাকিস্তানি সেনারা এগিয়ে আসতে থাকে। কারণ, তিনি তাদের কাছে টেরর হিসেবে পরিচিত। অনেক অপারেশন পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। আহত জগৎজ্যোতি পাকিস্তানি সেনাদের কাছে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মাহুতি দেওয়াই শ্রেয় মনে করেন। নিজের গুলিতে শহীদ হন তিনি। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বরের। ঘটেছিল বদলপুরে।

জগৎজ্যোতি দাস ১৯৭১ সালে শিক্ষকতা করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ৫ নম্বর সেক্টরের বড়ছড়া সাব-সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিল্লুর রহমান, বীর বিক্রম

দরগাপাড়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
বাবা হাবিবুর রহমান, মা ফাতেমা বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১১৩। শহীদ ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১।

জিল্লুর রহমান ইপিআরে চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে চলে যান। সেখানে তাঁকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডি কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অক্টোবর থেকে জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে আবার তিনি ভারতে চলে যেতেন।

১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে কমলগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ চলে কয়েক দিন। এখানে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্ত এক ঘাঁটি। ১ ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে আলীনগর চা-বাগানে আক্রমণ করেন। সেখানে প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিল এক দল পাকিস্তানি সেনা। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলে ছিলেন জিল্লুর রহমান। তাঁরা নিঃশব্দে চা-বাগানে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীও পাল্টা আক্রমণ করে। দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ঘটে। তারা পরাজিত হয়। চা-বাগান মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ভানুগাছ এলাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। ৫ ডিসেম্বর ভানুগাছ এলাকায় দীর্ঘ সময় যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর অনেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। জিল্লুর রহমানসহ কয়েকজন পিছু না হটে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এ সময় তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া গোলার আঘাতে শহীদ হন। সেদিন যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আরও কয়েকজন শহীদ হন। তাঁদের কমলগঞ্জের আলীনগর ইউনিয়নের কামুদপুর গ্রামে সমাহিত করা হয়।

শহীদ জিল্লুর রহমানের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। মুক্তিযোদ্ধারা পরদিনই ভানুগাছ এলাকা থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তমিজউদ্দীন প্রামাণিক, বীর বিক্রম

গ্রাম সুন্দ্রাহবি, ইউনিয়ন তুষভান্ডার, কালীগঞ্জ
লালমনিরহাট। বাবা সয়েফউল্লাহ প্রামাণিক
মা তমিজন নেছা। স্ত্রী রেজিয়া খাতুন। তাঁদের তিন ছেলে
ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮৯।
শহীদ ২৭ মে ১৯৭১।

পাটেশ্বরীর অবস্থান রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার সীমান্তে। একটু দূরেই তিস্তা নদী। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এখানে প্রতিরোধযোদ্ধাদের একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল। তাঁরা ইপিআর-মুজাহিদ-আনসার ও ছাত্র-যুবক। ১৯৭১ সালের ২৬ মে পাকিস্তানি সেনারা পাটেশ্বরী প্রতিরক্ষা অবস্থানে ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করলে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সেখানে টিকে থাকা সম্ভব হলো না।

২৭ মে। ভোর। থানা হেডকোয়ার্টারে বসে আছেন প্রতিরোধযোদ্ধাদের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন নওয়াজেশসহ কয়েকজন। এমন সময় দুজন লোক সেখানে এল। তারা জানায়, পাকিস্তানি সেনারা ধরলা নদী অতিক্রম করেনি। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের আবারও পাটেশ্বরীতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন। আসলে ওই দুজন ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অনুচর। পাকিস্তানি সেনারাই তাদের মিথ্যা কথা বলে বর্ণিত ঘটনাস্থলে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছিল এবং তারা তাদের অ্যামবুশ রেঞ্জের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের এনে তাঁদের নিশ্চিহ্ন করার অপেক্ষায় ছিল। তাদের সেই কৌশল কাজে লাগে।

ওই দুজনের সংবাদের ভিত্তিতে প্রতিরোধযোদ্ধারা আবার পাটেশ্বরী প্রতিরক্ষা অবস্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একটি ট্রাক, একটি পিকআপ ও একটি জিপে রওনা হলেন প্রায় ১০০ জন যোদ্ধা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর তমিজউদ্দীন প্রামাণিক।

প্রতিরোধযোদ্ধাদের বহনকারী গাড়ি সেখানে পৌঁছামাত্র পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আক্রমণ করে। প্রতিরোধযোদ্ধারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। প্রাথমিক হকচকিত অবস্থা কাটিয়ে তাঁরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে নামেন এবং পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা চালান। তাঁরা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শেষ পর্যন্ত তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। শহীদ হন বেশ কয়েকজন। এর পরও তাঁদের অন্যতম অধিনায়ক মুজাহিদ বাহিনীর অনারারি ক্যাপ্টেন তমিজউদ্দীন প্রামাণিক সংঘর্ষস্থল ত্যাগ না করে একাই সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর গুলিতে বেশ কয়েকজন শত্রুসেনা হতাহত হয়। এই অসম যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনিও শত্রুর গুলিতে শহীদ হন।

এ ঘটনার পর প্রতিরোধযোদ্ধাদের পাটেশ্বরীর প্রতিরোধব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা নাগেশ্বরী বাজারে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

তমিজউদ্দীন প্রামাণিক ১৯৭১ সালে গাইবান্ধার মুজাহিদ ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। মার্চের প্রথমার্ধে তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ইপিআর ও ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা প্রতিরোধযোদ্ধাদের দলে যোগ দেন। পরে তাঁদের সঙ্গে এপ্রিল-মে মাসে কুড়িগ্রাম জেলার কয়েকটি স্থানে প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরিকউল্লাহ, বীর বিক্রম

গ্রাম শায়েস্তানগর, ইউনিয়ন কাবিলপুর, সেনবাগ
নোয়াখালী। বাবা আকু আলী, মা মোহরজান বেগম।
স্ত্রী আঙ্কুরের নেছা। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১০৫। শহীদ নভেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ২৮ বা ২৯ নভেম্বর যশোরের শার্শা উপজেলার কাগজপুকুর এলাকায় এক যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা তরিকউল্লাহ শহীদ হন। এ তথ্য দিয়েছেন তাঁর বড় ছেলে জাহাঙ্গীর আলম। আর কোনো তথ্য তিনি দিতে পারেননি। তরিকউল্লাহ কীভাবে কোন যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, এর কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। তিনি যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টর এলাকায়।

মে মাসের শেষ দিকে সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে তরিকউল্লাহ মুক্তিবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধের বিবরণ আছে সুকুমার বিশ্বাসের *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী* বইয়ে। তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তানি সেনারা ২৭-২৮ মে ভোর চারটার দিকে দুটি কোম্পানি নিয়ে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পাকিস্তানি সেনারা তেমন সুবিধা করতে না পেরে পেছনে সরে যায়। সকাল ছয়টায় পুনরায় পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ করে। থেমে থেমে এই সংঘর্ষ ১৪ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। পাকিস্তানি সেনাদের একটি ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন সময় এই সংঘর্ষে অংশ নেয়। এই সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আহত ও একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৩০ জনের মতো নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর দুজন শহীদ ও আটজন আহত হন। এই সংঘর্ষে নায়েব সুবেদার জব্বার, হাবিলদার বেলায়েত হোসেন, হাবিলদার তরিকউল্লাহ অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেন।'

তরিকউল্লাহ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এতে যোগ দেন। যশোর-সাতক্ষীরা অঞ্চলে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে আশ্রয় নেন ভারতের বয়রায়। বেনাপোল ও ভোমরা সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন তিনি। এই দুই সাব-সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধকালে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কোনো এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা উদ্দিন, বীর বিক্রম

গ্রাম নারায়ণ ডহর, পূর্বধলা, নেত্রকোনা।
বাবা খোদা নেওয়াজ খান, মা আতপজান বিবি।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৯।
শহীদ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

তারা উদ্দিন সংসারের দৈন্য ঘোচাতে ১৯৭০ সালে যোগ দেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ভেবেছিলেন, চাকরি করে মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাবেন। চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণ শেষে যোগ দেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। কিছুদিন পরই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তিনি অংশ নেন সেই যুদ্ধে। ১৯৭১ সালের মার্চে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর। চারদিকে তখন বিজয়ের হাওয়া। মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রতিদিন মুক্ত হচ্ছে দেশের এলাকার পর এলাকা। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে সিলেটের দিকে বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধারা। ১৪ ডিসেম্বর কোম্পানীগঞ্জে অবস্থান নিয়েছে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল। এ রকম একটি দলে আছেন তারা উদ্দিন। আলফা কোম্পানি নামের এ দলের নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল)। তাঁদের অবস্থান পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান থেকে ৫০০ থেকে ৬০০ গজ দূরে। ভোরে শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' ও 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে গুলি করতে করতে সামনে এগোতে থাকেন। একপর্যায়ে শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। সকালে পাকিস্তানি সেনাদের পালিয়ে যেতে দেখা গেল। মুক্তিযোদ্ধারাও তাদের পেছন পেছন যেতে থাকেন। কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তাঁরা।

সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের ছাতক অংশের এক তেমাথায় ছিল পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। এখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের কোনো অবস্থাতেই হটানো যাচ্ছিল না। ১৫ ডিসেম্বর সারা দিন সেখানে যুদ্ধ চলল। পাকিস্তানি সেনারা সেখানে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর সকাল থেকে আবার যুদ্ধ শুরু হলো। সেদিন পাকিস্তানি সেনাদের একটি গোলা এসে পড়ল তারা উদ্দিনের পরিখায়। তিনি শহীদ হলেন। সেদিন পাকিস্তানি সেনাদের গোলার আঘাতে প্রাণ হারান মুক্তিবাহিনীর আরও কয়েকজন সদস্য।

তারা উদ্দিন ও অন্য শহীদ যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রের পাশেই পীরের টিলায় সমাহিত করা হয়। সিলেটের এই এলাকায় ১৮ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। সেদিন দুপুরের পর পাকিস্তানি সেনাদের ওই অবস্থান মুক্তিযোদ্ধারা দখল করতে সক্ষম হন। যুদ্ধে এখানে থাকা বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। বাকি সবাই আত্মসমর্পণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম কিসমত মাইজভাগ, ইউনিয়ন ফুলবাড়ী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। বাবা শেখ মো. আবরু মিয়া, মা আছমা খাতুন। স্ত্রী সৈয়দা পেয়ারা বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৪।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে বুড়িঘাটের যুদ্ধের (১৮ এপ্রিল) পর তাহের আলীসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিলেন মহালছড়িতে। ২৫ এপ্রিল তাঁরা খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। এখন শত্রুদের শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। কিন্তু সে তথ্য জানার জন্য কেউ যেতে রাজি হচ্ছেন না। শেষে এ দায়িত্ব পড়ল তাহের আলীর ওপর। অধিনায়কের নির্দেশে কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে ২৬ এপ্রিল ভোরে তিনি রওনা হলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে। তাঁদের সবার বেশভূষা রাখালের মতো। অস্ত্রগুলো লুকানো। কিন্তু বেশি দূর তাঁরা যেতে পারলেন না। এলাকাটি মিজো-অধ্যুষিত। মিজোরা তাঁদের সহযোগিতা করছে না। এ অবস্থায় সহযোদ্ধারা আর চেষ্টা করতে রাজি নন। এদিকে তাহের আলী নাছোড়বান্দা। তথ্য সংগ্রহ না করে তিনি ফিরবেন না। এ সময় তিনি কৌশলে সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঢুকে পড়লেন মিজো এলাকার মধ্যে। চলে গেলেন একদম পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের কাছাকাছি। কাজটা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

পাকিস্তানি সেনা ও মিজোদের ফাঁকি দিয়ে তাহের আলী ও তাঁর সহযোদ্ধারা নিরাপদেই রেকি করতে সক্ষম হলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বিদ্রোহী মিজোরাও যোগ দিয়েছে। মিজোদের সবাই সশস্ত্র। তারাও সংখ্যায় অনেক। পাকিস্তানি সেনারা মিজোদের বশ করে তাদের দলে ভিড়িয়েছে। প্রকাশ্যে পাকিস্তানি সেনা তো আছেই, মিজোদের সঙ্গেও মিশে আছে বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা। তাদের সবাই কমান্ডো ব্যাটালিয়নের। ফেরার পথে এক জায়গায় সশস্ত্র মিজোদের মুখোমুখি হলেন তাঁরা। তখন বেধে গেল যুদ্ধ। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর মিজোরা পালিয়ে গেল। ফলে তাঁদের বেশ দেরিই হয়ে গেল। এদিকে তাঁরা সময়মতো ফিরতে না পারায় এবং গোলাগুলির শব্দ শুনে ক্যাম্পে থাকা সহযোদ্ধারা মনে করলেন, তাঁদের সবাই শহীদ হয়েছেন। এ রকম ঘটনা পরে আরও কয়েকবার ঘটে। ক্যাম্পে ফেরার পর তাঁদের দেখে সবাই উৎফুল্ল হয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তাহের আলী রেকি করে যা জেনেছেন, তা অধিনায়ককে জানালেন। পরদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের অবস্থানে আক্রমণ করে। তখন মহালছড়িতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে তাঁরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন।

তাহের আলী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে তাঁদের রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল চট্টগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। কালুরঘাটে যুদ্ধের পর তাঁরা অবস্থান নেন বুড়িঘাটে। এরপর মহালছড়ি এলাকায়। মহালছড়ির পতন হলে তাঁরা চলে যান ভারতে। সেখানে পুনর্গঠিত হওয়ার পর তিনি শেরপুর জেলার নকশি বিওপি, বৃহত্তর সিলেটের চিকনাগুল, বড়টিলাসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৌহিদউল্লাহ, বীর বিক্রম

গ্রাম কাঠকড়া, ইউনিয়ন জগন্নাথ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা ১৫/১০, শেরশাহ সুরী রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা। বাবা আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, মা আয়েশা খাতুন। স্ত্রী পারভীন আক্তার। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৯।

অন্ধকারে হঠাৎ একসঙ্গে এক ঝাঁক অস্ত্রের গর্জন। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। আকস্মিক আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা সবাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তৌহিদউল্লাহ একেবারে শত্রুর নাগালের মধ্যে। পজিশন নেওয়ার আগেই কয়েকটি গুলি এসে লাগে তাঁর পায়ে। নিমেষে তাঁর শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। চোখের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে সহযোদ্ধা আজিজ শহীদ হলেন। আহত হলেন আরও কয়েকজন সহযোদ্ধা। সহযোদ্ধা কেউ কেউ পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলেন। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে তাঁদের গোটা দল। এমন অবস্থায় পশ্চাদপসরণ ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনো বিকল্প থাকল না।

১৯৭১ সালের ৭ বা ৮ নভেম্বর। ফেনী জেলার বিলোনিয়ার অনেক জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাদের মজবুত প্রতিরক্ষাব্যূহ। ৩১ অক্টোবর থেকে এই এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছিল। কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টি। এর মধ্যেই যুদ্ধ চলছিল। সেদিনও টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যার পর চিথলিয়ার কাছে মুহুরী নদীর পশ্চিমে ধনীকুণ্ডের দক্ষিণে তৌহিদউল্লাহসহ ২০ জনের একটি দল রেকি করতে যান। তাঁর হাতে ছিল এলএমজি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর অবস্থান ও শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা শত্রুর অ্যামবুশে পড়ে যান। পরে তাঁদের কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ইনাম-উজ-জামান (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল) খবর পেয়ে সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় একটি দল পাঠান। তারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

তৌহিদউল্লাহ মুক্তিবাহিনীর একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকার অন্তর্গত ফুলগাজী, মুন্সিরহাট, বন্ধুরহাটসহ আরও কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন। ২১ জুন পর্যন্ত বিলোনিয়া মুক্ত ছিল। সে সময় তিনি ফেনীর দক্ষিণে একটি প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন। ২১ জুন তিনটি হেলিকপ্টার এসে তাঁদের অবস্থানের ৫০০ গজ দূরে নামে। তাঁরা তখন ভেবেছিলেন, হেলিকপ্টারগুলো মুক্তিবাহিনীর। আসলে সেগুলো ছিল শত্রুর হেলিকপ্টার। যখন হেলিকপ্টার থেকে পাকিস্তানি সেনারা নামতে থাকে, তখন তাঁদের ভুল ভাঙে। তৌহিদউল্লাহ তাঁর এলএমজি দিয়ে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করেন। কিন্তু তার আগেই হেলিকপ্টার অনেক ওপরে উঠে যায়। সেদিন সেখানে দুই পক্ষে ব্যাপক গোলাগুলি হয়।

তৌহিদউল্লাহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ষষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল পাকিস্তানের পেশোয়ারে। মার্চ মাসে তিনি ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন যুদ্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেলোয়ার হোসেন, বীর বিক্রম

গ্রাম ওয়াসেকপুর, ইউনিয়ন অম্বরনগর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। বাবা আফিজউদ্দিন, মা ছবের নেছা। স্ত্রী জাকিয়া খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০৬। শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

দেলোয়ার হোসেন চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এতে যোগ দেন। যশোর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন তিনি। যশোরের পতন হলে তাঁর সঙ্গী-সাথিদের বেশির ভাগই আশ্রয় নেন ভারতে। তিনি তাঁর দলনেতার অনুমতি নিয়ে নিজ এলাকায় এসে দেখেন, তাঁর এলাকা তখনো মুক্ত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৎপরতা তখনো শুরু হয়নি। তা দেখে স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে তাঁদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁর এলাকায় তৎপরতা শুরু করে। তখন দলের সবাইকে নিয়ে তিনি ভারতে চলে যান।

দেলোয়ার হোসেন পরে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টরের অধীনে। পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ফেনীর পাঠাননগরের এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। সহযোদ্ধারা তাঁকে সমাহিত করেন পাঠাননগরেই। রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকায় অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ফেনী জেলার বিলোনিয়ার কয়েকটি এলাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের অবরুদ্ধ করার জন্য মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে বন্দুয়া-দৌলতপুর-পাঠাননগরে প্রবেশ করে। কিন্তু এর আগেই পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত বিলোনিয়ার সব অবস্থান ছেড়ে ফেনীতে সমবেত হয়। পাঠাননগরে ছিল তাদের শক্ত এক অবস্থান। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধারা ফেনীর পাঠাননগরে পাকিস্তানি সেনাদের মুখোমুখি অবস্থান নেন। একটি দলে ছিলেন দেলোয়ার হোসেন। মুক্তিযোদ্ধারা পাঠাননগরে অবস্থান নেওয়ার পর দুই পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে প্রতিদিনই খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়। সে সময় কোনো এক যুদ্ধে দেলোয়ার হোসেন শহীদ হন। কীভাবে শহীদ হন, এর কোনো বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলমণি বিশ্বাস, বীর বিক্রম

গ্রাম পালপুর, সদর, সিলেট। বাবা অতুল বিশ্বাস
মা মনোদা বিশ্বাস। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৩।
গেজেটে নাম নীলমণি সরকার। শহীদ ১৯৭১।

সিলেট সদর উপজেলার কুচাই ইস্রাব আলী উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র নীলমণি বিশ্বাস ১৯৭১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। পরীক্ষার আগেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সিলেটে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বেছে বেছে হত্যা শুরু করলে বেশির ভাগ হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়। নীলমণির আত্মীয়স্বজন সবাই চলে গেলেও কয়েকটি পরিবার থেকে যায়। চৈত্রের শেষ দিকে (এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ) একদিন কিশোর নীলমণিদের গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল কয়েকজন সংখ্যালঘুকে হত্যা করে। সেদিন নীলমণি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। এরপর তাঁদের পরিবার ভারতে চলে যায়। সেখানে নীলমণি মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখান। প্রথমে তাঁকে মুক্তিবাহিনীতে নেওয়া হয়নি। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তাঁকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতের শিলচরের ধালচরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর নীলমণি যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরের অমলসিদ সাব-সেক্টরের অধীনে। এই সাব-সেক্টরের অধীনে ছিল কানাইঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকা। এ অঞ্চলে ছিল সুরমা নদীসহ কয়েকটি ছোট নদী এবং অসংখ্য খাল-বিল ও ছোট ছোট পাহাড়। প্রাকৃতিক এসব প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নিয়ে মুক্তিবাহিনীর স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধনে সক্ষম হন।

নীলমণি বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে কানাইঘাটের যুদ্ধ অন্যতম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য কানাইঘাটের যুদ্ধ। কানাইঘাট সিলেট জেলার অন্তর্গত উপজেলা। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সিলেট অভিমুখী অগ্রাভিযানের জন্য কানাইঘাট মুক্ত করা ছিল জরুরি; কানাইঘাটে পাকিস্তানি সেনারা তখন শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করে। মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল আক্রমণ চালায় কানাইঘাটে। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট গিয়াস ও লেফটেন্যান্ট জহিরের নেতৃত্বে দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা দরবস্ত-কানাইঘাট ও চরঘাট-কানাইঘাট সড়কের ওপর অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য অগ্রসর হন। নীলমণি ছিলেন লেফটেন্যান্ট জহিরের নেতৃত্বাধীন দলে। এ দলের বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁরা অগ্রসর হওয়ার পথে পাকিস্তানি সেনাদের আকস্মিক আক্রমণের মুখে পড়েন। প্রচণ্ড গোলাগুলির কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে এবং সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ ও আহত হন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের একপর্যায়ে বাংকারে থাকা নীলমণি মাথা তুলে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে গ্রেনেড নিক্ষেপ করার চেষ্টা করতে গেলে গুলি এসে লাগে তাঁর মাথায়। শহীদ হন কিশোর নীলমণি। পরে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয় কানাইঘাটেই।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুজ্জামান, বীর বিক্রম

গ্রাম জাহানাবাদ, ইউনিয়ন ছয়ানী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। বাবা আরিফ মিয়া, মা জামিরা খাতুন। স্ত্রী শহিবী বেগম। তাঁরা নিঃসন্তান। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৮। শহীদ জুন মতান্তরে জুলাই ১৯৭১।

গজারিয়া সেতু নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত। বেগমগঞ্জ থানার নান্দিয়াপাড়াসহ আশপাশের বড় একটি এলাকা। এটি ১৯৭১ সালের জুনের শেষ পর্যন্ত মুক্ত ছিল। এই এলাকায় ছিলেন সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা। এ দলেই ছিলেন নূরুজ্জামান। দেশের ভেতরে অবস্থান করে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এপ্রিল থেকে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে বিপুলাশ্বর স্টেশন, সোনাইমুড়ী, বগাদিয়া ফেনাকাটা, মীরগঞ্জ, মীরেরহাট, বড় কামতায় সংঘটিত যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ১৩ জুন নূরুজ্জামানের দলনেতা সুবেদার লুৎফর রহমান খবর পান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল নান্দিয়াপাড়া দখলের জন্য আসছে। সেদিন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে গজারিয়া সেতুতে অবস্থান নেন। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের চার ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধে পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি না হলেও দুজন গ্রামবাসী পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি বাহিনী সেদিন সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

এরপর পাকিস্তানি সেনারা আরও কয়েকবার নান্দিয়াপাড়া দখলের জন্য আসে। প্রতিবারই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। একদিন (সঠিক তারিখ কারও জানা নেই) পাকিস্তানি সেনারা আর্টিলারির প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে করতে এগোতে থাকে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এই সুযোগে পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। তখন নূরুজ্জামান কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ সামনে এগিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রবর্তী দলকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নূরুজ্জামান ও তাঁর সহযোদ্ধারা সংখ্যায় ছিলেন অনেক কম। পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে নূরুজ্জামানের সহযোদ্ধারা বিপর্যস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন। নূরুজ্জামান ও তাঁর আরেক সহযোদ্ধা বিচলিত না হয়ে বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করছিলেন। এ সময় তাঁরা দুজন গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। পরে মুক্তিযোদ্ধারা পুনর্গঠিত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা নূরুজ্জামান ও তাঁর সহযোদ্ধার মরদেহ নিয়ে যায়। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের জুনের শেষ অথবা জুলাইয়ের প্রথমার্ধের।

নূরুজ্জামান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন নিজ এলাকাতেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুল ইসলাম, বীর বিক্রম

গ্রাম লক্ষ্মীপুর, ইউনিয়ন মোটবি, সদর, ফেনী।
বাবা মুনশি আহমদ উল্লাহ, মা ফিরোজা বেগম।
প্রথম স্ত্রী কাঞ্চন আরা বিবি, দ্বিতীয় স্ত্রী জাহানারা বেগম।
তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ
নম্বর ৪৭। গেজেটে নাম নূর ইসলাম। শহীদ জুন ১৯৭১।

একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে সারা রাত জেগে থাকার ক্লান্তি। সব উপেক্ষা করে নূরুল ইসলাম বাংকারে বসে আছেন। তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে আছেন আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের এই অপেক্ষা শত্রু পাকিস্তানি সেনাদের জন্য। এলাকাজুড়ে একটা থমথমে অবস্থা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিশাল একটি দল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে থাকা এলাকা পুনর্দখলের জন্য আক্রমণ শুরু করেছে। কয়েক দিন ধরে শুরু হয়েছে তাদের আর্টিলারির গোলাবর্ষণ। আগের রাতে পাকিস্তানি সেনারা নূরুল ইসলামদের অবস্থানে অবিরাম গোলাবর্ষণ করেছে, কিন্তু তাঁরা সেসব উপেক্ষা করে তাঁদের অবস্থান ধরে রেখেছেন।

সকাল হতেই দেখা গেল, শত শত পাকিস্তানি সেনা তাঁদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৫ ও ১৯ বালুচ রেজিমেন্ট, ২১ আজাদ কাশ্মীর রাইফেলস ও ইপিকাপের সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তানি বাহিনী। তারা তাদের কামান, মর্টার ও বিকোয়েললেস রাইফেল থেকে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করছিল। তার মধ্যেই সাহসের সঙ্গে নূরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোদ্ধারা যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পেছন দিকে সরে যায়। এমন সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি শেল এসে পড়ে নূরুল ইসলামের অবস্থানে। শেলের টুকরার আঘাতে তাঁর শরীর কুঁকড়ে যায়। পাশের বাংকার থেকে দুজন সহযোদ্ধা এসে তাঁকে নিয়ে যান একটু দূরে। আবার একটি মর্টার শেল আঘাত করে তাঁকে। তিনি শহীদ হন। তাঁকে সেখানেই মসজিদের পাশে কবর দেওয়া হয়।

এ ঘটনা ৮ জুন ১৯৭১ সালের। (এ তারিখ নিয়ে মতান্তর আছে।)

নূরুল ইসলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুল ইসলাম, বীর বিক্রম

গ্রাম চান্দা আফড়া, ইউনিয়ন ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর।
বাবা শফিউল্লাহ মিয়া, মা হায়াতুননেছা।
স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৮৫। শহীদ আগস্ট ১৯৭১।

কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেল। ফেলে গেল অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও সহযোদ্ধাদের লাশ। অধিনায়কের নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা সেগুলো সংগ্রহ করছেন এমন সময় হঠাৎ গুলি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন একটি দল দ্রুত সেখানে এসে তাঁদের ওপর আক্রমণ করেছে। নূরুল ইসলাম, তাঁর অধিনায়ক ও কয়েকজন সহযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাওয়ে পড়লেন। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। শহীদ হলেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু বেঁচে গেলেন অধিনায়ক। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৯ আগস্টের (মতান্তরে ৫ আগস্ট)। ঘটেছিল বর্নিতে।

বর্নি যশোরের চৌগাছা উপজেলার অন্তর্গত। বর্নিতে আছে বিওপি। ১৯৭১ সালে সেখানে ছিল ৭৫-৮০ জন পাকিস্তানি সেনা। রাজাকারও তাদের সঙ্গে ছিল। ৯ আগস্ট বয়রা সাব-সেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদার (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল) নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা বর্নি সীমান্ত বিওপিতে আক্রমণ করেন। কয়েক ঘণ্টা সেখানে যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের ১৪ থেকে ১৫ জন নিহত হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা তাদের সহযোদ্ধাদের লাশ ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

এরপর খন্দকার নাজমুল হুদা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে নূরুল ইসলামের সহযোদ্ধারা সেগুলো সংগ্রহ করে নিজেদের ঘাঁটিতে পাঠাতে থাকেন। সেখানে ছিল একটি খাল। তার পূর্ব পারে ছিলেন অধিনায়কসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের মধ্যে নূরুল ইসলামও ছিলেন। বাকি মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন খালের পশ্চিম পারে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন একটি দল পেছন দিক থেকে এসে তাঁদের ওপর আক্রমণ করে। উৎফুল্ল মুক্তিযোদ্ধারা আকস্মিক ওই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এতে তাঁরা চরম বিপদের মুখে পড়েন। তখন নূরুল ইসলামসহ কয়েকজন বিচলিত না হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। ওই সুযোগে তাঁর সহযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ (বীরশ্রেষ্ঠ) ও আবুল হোসেন (বীর প্রতীক) অধিনায়কসহ কয়েকজনকে খাল পার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। খালের পূর্ব পারে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। ওই যুদ্ধে নূরুল ইসলামসহ চারজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। পরে মুক্তিযোদ্ধারা নূরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের মরদেহ উদ্ধার করে বর্নিতে সীমান্তসংলগ্ন স্থানে সমাহিত করেন।

নূরুল ইসলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নবীন সেনা ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে চলে যান। পরে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরের অধীনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম পূর্ব তালতলা, ইউনিয়ন বাইশগাঁও, মনোহরগঞ্জ, (সাবেক লাকসাম), কুমিল্লা। বাবা সেকান্দার আলী ভূঁইয়া, মা ফাতেমা বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭৮। শহীদ অক্টোবর ১৯৭১।

নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। যোগ দিয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে ছুটি কাটিয়ে আবার যোগ দেন কর্মস্থলে। যেদিন কর্মস্থলে ফিরে যান, সেদিন মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই বাড়ির পার্শ্ববর্তী রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় জানান। এরপর মা ছাড়া সবাই বাড়িতে ফিরে যান। মা নিষ্পলক চেয়ে থাকেন ছেলের গমনপথের দিকে। নূরুল ইসলামও বারবার পেছন ফিরে মাকে দেখতে থাকেন। তিনি দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর মা।

নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার দিন কয়েক পরই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এর পর থেকে তাঁর আর খোঁজ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে তিনি যোগ দিয়েছেন কি দেননি—তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেটা জানতে পারেননি। স্বাধীনতার পর মা-বাবা ও ভাইবোনেরা তাঁর অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন। তারপর চার-পাঁচ মাস কেটে যায়। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁর মা-বাবাসহ পরিবারের লোকজন। খোঁজ নিতে থাকেন তাঁরা। মা ও বড় ভাই যান কুমিল্লা সেনানিবাসে। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। সালদা নদীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। ওই যুদ্ধে নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। সহযোদ্ধারা তাঁকে সেখানেই সমাহিত করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা থানার অন্তর্গত সালদা নদী। এ নদীর পাশাপাশি কসবার বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। ১৯৭১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল সালদা নদী ও কসবায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে একযোগে হামলা চালায়। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন কে ফোর্সের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম)। কয়েক দিন সেখানে যুদ্ধ চলে। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা বাংকারগুলো ছিল খুবই মজবুত। আর্টিলারির গোলাবর্ষণ করেও সেগুলো ধ্বংস করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অবরোধ করে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনাদের পালানোর পথ ছিল রুদ্ধ। কিন্তু তাদের প্রতি বাংকারেই মজুদ ছিল বিপুল রসদ। সেগুলোর সাহায্যে তাদের পক্ষে অনেক দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। পাকিস্তানি সেনারা সুরক্ষিত বাংকারে অবস্থান করে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলা অবস্থায় ২১ বা ২২ অক্টোবর খালেদ মোশাররফ গোলার স্প্লিন্টারে আহত হন। কয়েক দিনের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন শহীদ হন। তাঁরা কেউ গুলিতে, কেউ গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে শহীদ হন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুল ইসলাম শিকদার, বীর বিক্রম

গ্রাম দক্ষিণ বাঁশগাড়ী (পরিপত্তর), ইউনিয়ন বাঁশগাড়ী, কালকিনি, মাদারীপুর। বাবা লাল মিয়া শিকদার, মা জহুরা বেগম। স্ত্রী ফাতেমা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০৪। গেজেটে নাম মো. নূরুল ইসলাম। শহীদ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

মাদারীপুরের অন্তর্গত কালকিনি বর্তমানে উপজেলা। জেলা সদর থেকে দক্ষিণে কালকিনির অবস্থান। নূরুল ইসলাম শিকদারসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা একদিন ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের একটি সেতু মাইন দিয়ে ধ্বংস করেন। সেতুটি ছিল কালকিনি-গোপালপুর অংশে। সেতু ধ্বংসের পর তাঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন নিজেদের গোপন শিবিরে। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য, তখন কাছাকাছি টহলে ছিল একদল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার। তারা মাইন বিস্ফোরণের শব্দ শুনে দ্রুত এসে তাঁদের আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় ছিলেন কম। নূরুল ইসলাম শিকদারসহ দু-তিনজন ছাড়া বাকি সবাই স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণবাহিনীর যোদ্ধা। তাঁদের কাছে আধুনিক অস্ত্রও তেমন ছিল না। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার মিলে তাদের সংখ্যা অনেক। সেনারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তারপরও মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে নূরুল ইসলাম শিকদার শহীদ এবং দু-তিনজন আহত হন। প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় নূরুল ইসলাম শিকদারের সহযোদ্ধারা জীবন বাঁচাতে তাঁর মরদেহ ফেলেই পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা তাঁর মরদেহ নিয়ে যায়। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরে ঘটেছিল কালকিনিতে।

নূরুল ইসলাম শিকদার চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে চাকরিরত ছিলেন ঢাকার পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তরে। ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র অবস্থায় পিলখানা ইপিআর হাসপাতালে দায়িত্বরত অবস্থায় তিনি আক্রান্ত হন। সেখান থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রথম দিকে তিনি আহত প্রতিরোধযোদ্ধাদের সেবা করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে ভারতে চলে যান। জুলাইয়ের প্রথম দিকে ভারত থেকে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল পাঠানো হয় মাদারীপুরে। একটি দলে নূরুল ইসলাম শিকদারকেও পাঠানো হয়। তাঁরা কালকিনি এলাকায় গোপন শিবির করে গেরিলা কায়দায় অপারেশন চালাতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যাতায়াতের পথে অ্যামবুশ পেতে আক্রমণ করে সরে পড়া, টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, মাইন দিয়ে সড়কসেতু ধ্বংস করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মতো অপারেশনই বেশি করতেন তাঁরা। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন তাঁরা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের একটি সেতু ধ্বংস করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলু মিয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম চেউলিয়া, ইউনিয়ন পূর্ব চন্দ্রপুর, দাগনভূঞা, ফেনী।
বাবা বসু মিয়া, মা সরবতের নেছা। স্ত্রী আরজাহান বেগম।
তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২। মৃত্যু ২০০৮।

ভোর চারটার আগেই ভুলু মিয়া তাঁর দল নিয়ে অবস্থান নিলেন বাহাদুরাবাদ রেলঘাটের জংশন পয়েন্টে। তাঁরা কয়েকটি দলে একযোগে আক্রমণ করবেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাহাদুরাবাদ ঘাট অবস্থানে। তাঁদের সবার নেতৃত্বে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট এস আই এম নূরুন্নবী খান (বীর বিক্রম)। নির্দিষ্ট সময়ে ভুলু মিয়া সহযোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাদের আবাসিক কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত যাত্রীবাহী রেলবগিতে। রকেট লঞ্চার দিয়ে গোলাবর্ষণ এবং একযোগে অনেকগুলো হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়লেন। পাঁচটি রেলবগি ধ্বংস হয়ে গেল। বগিতে ঘুমিয়ে থাকা বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হলো। কিছু পাকিস্তানি সেনা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সাঁতার না জানায় তাদের বেশির ভাগই ডুবে মারা গেল।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাইয়ের। বাহাদুরাবাদ ঘাট তখন ছিল দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান যোগাযোগমাধ্যম। সেদিন মুক্তিবাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা হকচকিত হয়ে পড়লেও কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ভুলু মিয়া সেটা উপেক্ষা করে সহযোদ্ধাদের নিয়ে অপারেশন চালিয়ে যান। একটি শানটিং ইঞ্জিনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন তিনি। সম্মুখযুদ্ধও করতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি স্থাপনা ধ্বংস করে তিনি সামনাসামনি যুদ্ধ করছিলেন। তখনই পাকিস্তানি সেনাদের খুব কাছে থেকে ছোড়া একটি বুলেট তাঁর বুকের বাঁ পাশে লেগে পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। পিঠের পেছনে তখন বড় গর্ত। গায়ের গেঞ্জি খুলে দলা করে পিঠের গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে লাগলেন। এ সময় তাঁদের অধিনায়ক অপারেশন শেষ করার সিগন্যাল দিলেন। এরপর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে ক্রল করে পেছনে যেতে থাকলেন। তখনো তাঁর সহযোদ্ধারা বুঝতে পারেননি তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত। পেছনে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের দলনেতা আহত। সে সময় তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এরপর সহযোদ্ধারা তাঁকে ফিল্ড চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠান। সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবার যুদ্ধে যোগ দেন। পরে যুদ্ধ করেন বৃহত্তর সিলেটের গোয়াইনঘাট, ছাতক, রাধানগরসহ কয়েকটি জায়গায়।

ভুলু মিয়া ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। ২৮ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে। দুর্যোগপূর্ণ ওই মুহূর্তে ভুলু মিয়া বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত বাঙালি ইপিআর সেনারা বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে যাওয়ার পর তাঁদের নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজিবুর রহমান, বীর বিক্রম

গ্রাম কমলাপুর, ইউনিয়ন গুঠিয়া, উজিরপুর, বরিশাল। বাবা সিরাজউদ্দিন হাওলাদার, মা হাসনা বানু। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৮১। শহীদ ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের অধিনায়ক একদল পাকিস্তানি সেনাকে নির্দেশ দিলেন আত্মসমর্পণের। তারা অস্ত্রসহ হাত উঁচু করল। কিন্তু আসলে সেটা ছিল তাদের অভিনয়। মিনিটও যায়নি, তারা হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করল। পাকিস্তানি সেনারা যে এমনটা করবে, মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমানসহ তাঁর সহযোদ্ধাদের ধারণারও অতীত ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়লেও দ্রুত তাঁরাও পাল্টা আক্রমণ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার পূর্ব দিকে শাহবাজপুরের পাশেই চান্দুরা। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সীমান্ত এলাকা থেকে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভোরে সেখানে পৌঁছায়। বিকেলে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এস ফোর্সের অধিনায়ক মেজর কে এম সফিউল্লাহ (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম প্রধান)। মুক্তিবাহিনীর একটি দল (সি কোম্পানি) যখন ইসলামপুরে পৌঁছায়, তখন পেছন থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটি মিলিটারি লরি। লরিতে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ১৪-১৫ জন সেনা। এ সময় কে এম সফিউল্লাহও সেখানে ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের আদেশ দেন তিনি। তারা অস্ত্রসহ হাত উঁচু করে লরি থেকে লাফ দিয়ে নেমে হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। কয়েক মিনিট পর পেছন থেকে পাকিস্তানি সেনাভর্তি আরেকটি বাস সেখানে আসে। এরপর শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর দলটি কিছুটা বিশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। মজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা ছিলেন এক কোম্পানি। তাঁদের একটি প্লাটুন জীবন বাঁচাতে পাশের নদীর ওপাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বাকি দুই প্লাটুনের একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটি প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকে। এই প্লাটুনেই ছিলেন মজিবুর রহমান। এ সময় কয়েকটি গুলি হঠাৎ এসে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগে। সেদিন মুক্তিবাহিনীর মজিবুর রহমানসহ আরেকজন শহীদ এবং ক্যাপ্টেন এ এস এম নাসিম (বীর বিক্রম, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও সেনাপ্রধান), লেফটেন্যান্ট মঈনুল হোসেনসহ (একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেডিকেল অফিসার) ১১-১২ জন আহত হন। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাদের ২৫ জন নিহত ও ১৪ জন বন্দী হয়। অন্যরা পালিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে মজিবুর রহমান ও তাঁর আরেক সহযোদ্ধাকে সমাহিত করা হয় চান্দুরা সেতুর পাশে।

মজিবুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ৩ নম্বর সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন। এস ফোর্স গঠিত হলে তাঁকে একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিউর রহমান, বীর বিক্রম

গ্রাম বানিয়াহাটি, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।
বাবা কিনু মিয়া, মা হীরা বানু। স্ত্রী রাবেয়া রহমান।
তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৭।

মতিউর রহমান একটি কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন। তাঁর কোম্পানির নাম ছিল 'কোবরা'। সাচনাবাজারের যুদ্ধে তিনি প্রথম অংশ নেন। এরপর সুরমা নদী ও তাহিরপুর উপজেলার কাউকান্দি বাজারে যুদ্ধ করেন। সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান সাচনাবাজার। ১৯৭১ সালের ৮ আগস্ট সেখানে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় রকমের এক সংঘর্ষ হয়। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ওই অবস্থানে আক্রমণ চালান। এই দলে মতিউর রহমানও ছিলেন। সহযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম ও আরেকজন যোদ্ধা পাকিস্তানি বাহিনীর বাংকার লক্ষ্য করে গ্রেনেড চার্জ করছিলেন। মতিউর রহমান শত্রুপক্ষের বাংকারের মুখ বরাবর এলএমজির গুলি চালিয়ে নিজেদের কাভার দিচ্ছিলেন। সেদিন এ যুদ্ধে সিরাজুল ইসলামসহ ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

সাচনাবাজারে আক্রমণ করার পর মুক্তিযোদ্ধারা ক্রল করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের প্রবল গুলিবর্ষণের কারণে তাঁরা সামনে এগোতে পারছিলেন না। এ সময় কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যান তাঁরা। তাঁদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এ পরিস্থিতিতে মতিউর রহমানের সহযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম একাই এগিয়ে যান শত্রুর বাংকারের দিকে। তাঁর চোখের সামনেই গুলিবিদ্ধ হন সিরাজুল ইসলাম। মতিউর রহমান পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেও বাঁচাতে পারেননি।

মতিউর রহমান ১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজের এলাকায় গিয়ে ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করতে থাকেন। পরে তিনি ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে ৫ নম্বর সেক্টরের অধীনে বড়ছড়া সাব-সেক্টরে পাঠানো হয়। পরে তিনি কোবরা কোম্পানির যোদ্ধাদের নিয়ে ৩ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন কিশোরগঞ্জ এলাকায় আসেন। ২০ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী এবং ৯ নভেম্বর করিমগঞ্জের ইটনায় তিনি যুদ্ধ করেন। ২৭ নভেম্বর তাঁর কোবরা কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অষ্টগ্রাম মুক্ত করে কিশোরগঞ্জের ভাটি এলাকায় এক বিরাট মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলেন। গচিহাটাতেও তাঁর কোবরা কোম্পানি যুদ্ধ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনিরুজ্জামান খান, বীর বিক্রম

গ্রাম বাথুলিসাদী, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। বাবা আকমল খান, মা আমেনা বেগম। স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯৩। শহীদ ২৭ জুন ১৯৭১।

সীমান্ত এলাকায় অন্যত্র টহলে ছিলেন মনিরুজ্জামান খান। শিবিরে ফিরেই খবর পেলেন, কাশিপুরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। এ খবর পেয়ে তিনি যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন সেদিকে। কাশিপুর যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। কাশিপুরে আছে একটি সেতু। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রায়ই ওই সেতুর ওপর দিয়ে সীমান্ত এলাকায় যাতায়াত করত। ১৯৭১ সালের ২৭ জুনেও আসে একদল পাকিস্তানি সেনা। সেদিন তারা সংখ্যায় ছিল বিপুল। সেতুর ওপারে গাড়ি রেখে তারা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দিকে। সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। কাশিপুরের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ চলতে থাকে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের তাড়া খেয়ে কাশিপুরের এক জঙ্গলে লুকিয়েছিল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। এর পাশ দিয়েই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আসছিলেন মনিরুজ্জামান খান। ওখানে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আক্রমণ করে। আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তাঁরা। তিনি খবর পেয়েছিলেন, পাকিস্তানি সেনারা গঙ্গানন্দপুরের দিকে পালিয়ে গেছে। ফলে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। মনে করেন, মুক্তিযোদ্ধারাই ভুল করে তাঁদের পাকিস্তানি সেনা মনে করে আক্রমণ করেছেন। কারণ, তাঁদের ও পাকিস্তানি সেনাদের পোশাক একই রকম। পরে তাঁরা বুঝতে পারেন যে এরা পাকিস্তানি সেনা। তখন সাহসী মনিরুজ্জামান পাল্টা গুলি করে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তিনি ছিলেন সবার সামনে। মনিরুজ্জামান অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলে যান বেশ আগে। আর ঠিক তখনই পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া কয়েকটি গুলি এসে লাগে তাঁর বুকে। শহীদ হন মনিরুজ্জামান খান। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং দলনেতাকে হারিয়ে তাঁর সহযোদ্ধারা কিছুটা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। এ সুযোগে সেখানে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়। পরে সহযোদ্ধারা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে কাশিপুরে সমাহিত করেন।

মনিরুজ্জামান খান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ৪ নম্বর উইংয়ে। তিনি তখন ছিলেন নায়েক সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। ওই সময় কুষ্টিয়ার যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা (ইপিআর) কুষ্টিয়া মোহিনী মিলে অবস্থিত পাকিস্তানি ওয়্যারলেস স্টেশনের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ১ এপ্রিল কুষ্টিয়া মুক্ত হয়। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে মনিরুজ্জামান খান তাঁর দলের সঙ্গে ভারতে চলে যান। সেখানে তাঁদের দলকে পুনর্গঠিত করার পর ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টর এলাকায় তাঁরা যুদ্ধ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছুটিপুর, হিজলী ও বর্নিতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহসীন উদ্দীন আহমেদ, বীর বিক্রম

গ্রাম দামলা, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ। বাবা মহিউদ্দীন আহমেদ, মা বেগম নুরুন্নাহার। স্ত্রী হোসনে আরা। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬। ১৯৮১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জিয়া হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

টেংরাটিলা সিলেট জেলার অন্তর্গত। এর পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাতকে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। ছাতকের ঠিক উত্তরে সীমান্ত ঘেঁষে বাঁশতলায় ছিল মুক্তিবাহিনীর ৫ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার। ওই সেক্টরের শেলা সাব-সেক্টরের হেডকোয়ার্টারও ছিল সেখানে। ১২ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী বাঁশতলা ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। তিনি যেদিন বাঁশতলায় যান, এর এক দিন আগে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভারতের তেলঢালা ক্যাম্প থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে আসে। কর্নেল ওসমানী তাদের ছাতক আক্রমণের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে প্রয়োজনীয় রেকি ও পরিকল্পনা ছাড়াই তাঁরা আক্রমণ রচনা করেন। মূল আক্রমণকারী দল হিসেবে থাকে আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি। আক্রমণের সময় দোয়ারাবাজার হয়ে ওয়াপদার বেড়িবাঁধ ধরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোনো রি-এনফোর্সমেন্ট যাতে আসতে না পারে, সে জন্য টেংরাটিলায় অবস্থান নিয়ে চার্লি কোম্পানিকে কাট অফ পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়।

এ কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন মহসীন উদ্দীন আহমেদ। তাঁরা ১৩ অক্টোবর রাতে বাঁশতলা ক্যাম্প থেকে রওনা হন। শেলা সাব-সেক্টরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সেদিন সকাল পর্যন্ত টেংরাটিলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা ভোরে টেংরাটিলায় যাওয়ামাত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়েন। তারা সব কটি নৌকার ওপর একযোগে গুলি করতে থাকে। এমন পরিস্থিতির জন্য মহসীন উদ্দীন আহমেদ ও তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত ছিলেন না। চারদিকে গভীর পানি। হুড়োহুড়িতে বেশির ভাগ নৌকা ডুবে যায়। অনেক মুক্তিযোদ্ধা সাঁতার জানতেন না। পাল্টা আক্রমণের বদলে প্রাণ বাঁচানোই তাঁদের কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে পড়ে। যাঁরা সাঁতার জানতেন, তাঁদের অনেকে অস্ত্র ফেলে সাঁতরে নিরাপদ স্থানে যেতে থাকেন। চরম প্রতিকূলতার মধ্যে মহসীন উদ্দীন আহমেদ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে পানির ভেতর থেকেই পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। এতে অনেক মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ বেঁচে যায়। সেদিন মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও ২৫-২৬ জন আহত হন। মহসীন উদ্দীন আহমেদও আহত হন।

মহসীন উদ্দীন আহমেদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে চলে যান। সেখানে তাঁকে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়ে যথেষ্ট রণনৈপুণ্য দেখান।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজবাহউদ্দীন আহমেদ, বীর বিক্রম

ধাপ, সদর, রংপুর। বর্তমান ঠিকানা ১৭ পূর্ব রাজাবাজার ঢাকা। বাবা আইন উদ্দীন আহমেদ মা জাহানারা বেগম। স্ত্রী কানিজ আহমেদ। তাঁদের তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৪।

হাতীবান্ধা লালমনিরহাট জেলার অন্তর্গত উপজেলা। পশ্চিম দিকে তিস্তা নদী। পাটগ্রাম থেকে রেল ও সড়কপথ চলে গেছে হাতীবান্ধার ওপর দিয়ে এবং যুক্ত হয়েছে লালমনিরহাটের সঙ্গে। হাতীবান্ধার বড়খাতা ও থানা সদরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান। সেখানে কয়েকবার মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে ব্যর্থ হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি মুক্তিযোদ্ধারা আবার সেখানে আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০-২১ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা থানা সদর ও বড়খাতার উদ্দেশে সীমান্ত এলাকা থেকে রওনা হন। একটি দলের নেতৃত্বে আছেন মেজবাহউদ্দীন আহমেদ ফারুক। তাঁদের সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বীর বিক্রম)।

সেদিন ছিল ঈদ। সকাল আটটায় একযোগে তাঁরা অতর্কিতে আক্রমণ চালান। কিন্তু সময়টা আক্রমণের উপযোগী ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা ভেবেছিলেন, ঈদের দিন পাকিস্তানি সেনারা কিছুটা রিলাক্সড মুডে থাকবে। এই সুযোগ নিতে পারলে তাঁদের আক্রমণ সফল হবে। কিন্তু তা হয়নি। পাকিস্তানি সেনারা পুরোপুরি সতর্কাবস্থায় ছিল। আরেকটি ঘটনা, সেদিন ক্যাম্পে পাকিস্তানি সেনা বদল হচ্ছিল। অর্থাৎ নতুন একটা দল লালমনিরহাট থেকে এসে সেখানে অবস্থান নিচ্ছিল। সেখানে যারা ছিল, তারা লালমনিরহাটে চলে যাচ্ছিল। এ রকম এক অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে আক্রমণ করেন। আকস্মিক আক্রমণে প্রথমেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দলনেতাসহ (কোম্পানি কমান্ডার) কয়েকজন নিহত হয়। এ ঘটনা ঘটে হাতীবান্ধার বড়খাতায় ১৯৭১ সালের ২০ বা ২১ নভেম্বরে। এরপর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তারা পিছু হটতে থাকে। এই সুযোগে মেজবাহউদ্দীনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বড়খাতা ঘাঁটি দখল করেন। কয়েক দিন সেখানে যুদ্ধ হয়। ২৪ নভেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল হাতীবান্ধা থেকে পালিয়ে যায়।

মেজবাহউদ্দীন আহমেদ ১৯৭১ সালে ব্যবসা করতেন, সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তও ছিলেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাডেট অফিসার হিসেবে যোগ দিয়ে কাকুলে প্রশিক্ষণ নেন। কিন্তু তাঁকে সেনাবাহিনীতে কমিশন দেওয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যোগ দেন যুদ্ধে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতের সাহেবগঞ্জে কিছুদিন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। পরে যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের পাটগ্রাম সাব-সেক্টরের অধীনে। বড়খাতা, পাটগ্রামসহ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেন। ৫ ডিসেম্বর লালমনিরহাট মুক্ত করার পর মেজবাহউদ্দীন তাঁর দলবল নিয়ে অগ্রসর হন রংপুরের দিকে। ১৬ ডিসেম্বর রংপুর পুলিশ লাইন দখল করে তিনি সেখানে পতাকা ওড়ান।

স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম

গ্রাম সুতিয়াখালী, সদর, ময়মনসিংহ। বাবা আফতাবউদ্দীন আহমেদ, মা রওশন আরা। স্ত্রী রেহেনা মান্নান। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৯।

সীমান্তসংলগ্ন

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে সরাসরি আক্রমণ করা হবে, এ জন্য ঘাঁটির চারপাশ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ছদ্মবেশে দিনে রেকি করল। রাতের বাস্তব অবস্থাও দেখা প্রয়োজন। সীমান্তের ওপারের মুক্তিবাহিনীর শিবির থেকে বেরিয়ে পড়লেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের মধ্যে আছেন মো. আবদুল মান্নান। তাঁদের দলনেতা সালাহ্উদ্দীন মমতাজ (বীর উত্তম)।

সাড়াশব্দহীন অন্ধকার রাত। রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটির আশপাশ পর্যবেক্ষণ করছেন। অন্ধকারে ভুল করে তাঁরা চলে গেলেন পাকিস্তানি এক পর্যবেক্ষণ চৌকির কাছে। সেখানে ছিল দুই পাকিস্তানি সেনা। দুজনের একজন 'হল্ট' বলে চিৎকার করে উঠল। তাঁরা তাদের আটক করে হত্যা করলেন। এরপর তাঁরা দুই পাকিস্তানি সেনার মাথার ক্যাপ ও অস্ত্র নিয়ে ফিরে গেলেন নিজেদের শিবিরে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৮ জুলাই ঘটেছিল কামালপুর বিওপিতে। কামালপুর জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত। ৩১ জুলাই মো. আবদুল মান্নান ও তাঁর সহযোদ্ধারা সেখানে আক্রমণ করেন। তার আগে তাঁরা সেখানে সেদিন রেকি করেন। ৩১ জুলাই কামালপুরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মো. আবদুল মান্নান সি কোম্পানির নেতৃত্ব দেন। তাঁর কোম্পানি এফইউপি প্রোটেকশন ও গাইড হিসেবে কাজ করে। আক্রমণের জন্য পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে ৬০০ গজ দূরে এফইউপি নির্ধারণ করা হয়। আগের দিন রাতে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে পৌঁছাতে দেরি হয়। বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারে গাইডরা পথ হারিয়ে ফেলেন। এই অতিরিক্ত সময় যুদ্ধের পরিকল্পনায় না থাকায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই তাঁরা নিজেরাই নিজেদের প্রিএইচ আওয়ার বোমার শিকার হন। নিজেদের গোলা ও পাকিস্তানি গোলা তাঁদের ওপর এসে পড়তে থাকে। এতে সেখানে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন মো. আবদুল মান্নানের প্রচেষ্টা ও প্রেরণায় মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ৪০ জন শহীদ এবং আবদুল মান্নানসহ ৭০-৮০ জন আহত হন। আবদুল মান্নানের উরুতে গুলি লাগে।

মো. আবদুল মান্নান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। ভারতে পুনর্গঠিত হওয়ার পর তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানির নেতৃত্ব দেওয়া হয়। কামালপুর যুদ্ধ ছাড়াও কয়েকটি জায়গায় তিনি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল হক, বীর বিক্রম

গ্রাম সাকোকাঠি, গৌরনদী, বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা মেরুল বাড্ডা, ঢাকা। বাবা কফিলউদ্দীন মোল্লা মা জমিলা খাতুন। স্ত্রী মাহমুদা হক। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪০।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাস। বৃহত্তর বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধারা একেকটি এলাকা মুক্ত করছেন আর এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। দলের সহ-অধিনায়ক মো. আবদুল হক। নভেম্বরের মাঝামাঝি ঝালকাঠি জেলার চাচৈরে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর তাঁরা হাজির হন রাজাপুর থানা এলাকায়। সেখানে ছিল একদল পাকিস্তানি পুলিশ ও বাঙালি রাজাকার। রাজাপুর থানার অবস্থান পিরোজপুর জেলার সীমান্তের কাছাকাছি ঝালকাঠি সদরের দক্ষিণে।

ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন থানার আশপাশের ধানখেতসহ বিভিন্ন স্থানে। মো. আবদুল হক ও দলনেতা শাহজাহান ওমর ছিলেন ধানখেতে। সকাল হতেই শুরু হলো যুদ্ধ। দুই পক্ষের মধ্যেই চলে পাল্টাপাল্টি গুলির ঘটনা। পাকিস্তানি পুলিশ ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। লড়াইয়ের একপর্যায়ে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হলেন তাঁর দলনেতা। আবদুল হক তাঁর পাশেই ছিলেন। এতে তিনি বিচলিত না হয়ে আহত দলনেতাকে কাঁধে নিয়ে ক্রল করে ধানখেত পেরিয়ে চলে এলেন নিরাপদ দূরত্বে। চিকিৎসকের কাছে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। মুক্তিযোদ্ধারা আবদুল হকের নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে চলা যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি পুলিশ ও রাজাকাররা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তারা পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের পালানোর পথ ছিল রুদ্ধ। পালাতে গিয়ে তাদের বেশির ভাগ সদস্যই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে। বাকি সবাই আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই মুক্ত হয় রাজাপুর থানা।

পরে মুক্তিযোদ্ধারা আটক ও আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি পুলিশ ও রাজাকারদের হাত বেঁধে নিয়ে যান পার্শ্ববর্তী জীবন দাসকাঠি স্কুলে। সেখানে প্রকাশ্য গণ-আদালতে তাদের বিচার করা হয়। গণ-আদালতে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সেই দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করেন।

মো. আবদুল হক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে নায়েক পদে চাকরি করতেন। কর্মস্থল ছিল পাকিস্তানের লাহোর। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তিন মাসের ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি চাকরিতে আর যোগ দেননি। সে সময় তিনি ঢাকাতেই ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা থেকে পালিয়ে বরিশাল গিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি প্রথম দিকে ৯ নম্বর সেক্টরের অধীন বসন্তপুর, খাঞ্জা, বাঁশঝাড়ি, উকসা, কৈখালী ও ভেটখালীতে যুদ্ধ করেন। পরে বৃহত্তর বরিশালজুড়ে যুদ্ধ করেন। ভেটখালীর যুদ্ধে তিনি আহত হন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি নেন। অবসর নেওয়ার সময় তাঁর পদমর্যাদা ছিল অনারারি ক্যাপ্টেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবুল হাসেম, বীর বিক্রম

গ্রাম সাহেলপুর, ইউনিয়ন নোয়ান্নই, সুধারাম, নোয়াখালী।
বর্তমান ঠিকানা ১৮৯ পশ্চিম কাফরুল, ঢাকা।
বাবা আবদুল জব্বার, মা তরিকুন নেছা।
স্ত্রী শামীমা আক্তার। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৯।

ধলই বিওপি মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য এক ঘাঁটি। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দুই কোম্পানি, টসি এবং স্থানীয় রাজাকারের সমন্বয়ে গঠিত দুই কোম্পানি। সবকিছু মিলে এক ব্যাটালিয়ন জনবল। ঘাঁটির অবস্থান ছিল সমতল থেকে বেশ উঁচু জায়গায়। চারদিকে ছিল ঘন বাঁশবন, চা-বাগান, জঙ্গল ও জলাশয়। সেখানে দিনের বেলায়ও আক্রমণ চালানো কঠিন ছিল।

২৮ অক্টোবর ভোরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল (প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা, ব্রাভো, চার্লি ও ডেলটা কোম্পানি) একযোগে ধলই বিওপিতে আক্রমণ করে। চার্লি কোম্পানির একটি প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন মো. আবুল হাসেম। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ডান দিক দিয়ে আক্রমণ করেন। মো. আবুল হাসেম তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঝোড়োগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে তাঁদের অগ্রযাত্রা একপর্যায়ে থমকে যায়। তখন তিনি ফায়ার অ্যান্ড মুভ পদ্ধতিতে এগোতে থাকেন। কিন্তু উঁচু টিলার ওপর স্থাপিত একটি এলএমজি পোস্ট থেকে পাকিস্তানি সেনারা প্রায় নিখুঁত নিশানায় গুলিবর্ষণ করছিল। মো. আবুল হাসেমের দলের কয়েকজন ওই এলএমজির গুলিতে আহত হন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা করেন এলএমজি পোস্টটি ধ্বংস করতে। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাতেও তিনি দমেননি। সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যান।

মো. আবুল হাসেম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। যশোরের বেনাপোল, নাভারন, জামালপুর জেলার কামালপুরসহ বৃহত্তর সিলেট জেলার বিভিন্ন জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেন। নভেম্বরের শেষ দিকে সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত আটগ্রাম সেতু আক্রমণ ও দখলে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখান। ওই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। তাঁরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কানাইঘাট যুদ্ধে তিনি আবার আহত হন।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বীরত্বের জন্য তিনি 'তঘমায়ে জুমরাত' (টিজে) খেতাব পান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আমানউল্লাহ, বীর বিক্রম

গ্রাম হাটগাঁও, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। বাবা ইসমাইল মিয়া, মা শরবৎ বানু। স্ত্রী সালেমা খাতুন। তাঁদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩০। শহীদ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত খানসামা। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গড়া যৌথ বাহিনী ৫ ডিসেম্বর দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁওয়ের মাঝামাঝি বীরগঞ্জ মুক্ত করে দিনাজপুরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ৯ ডিসেম্বর তারা দিনাজপুর শহরের কাছে পৌঁছে যায়। ১০ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী সিদ্ধান্ত নেয় দিনাজপুর শহর দখল না করে খানসামা হয়ে নীলফামারীর দিকে যাওয়ার। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যৌথ বাহিনী ১৩ ডিসেম্বর খানসামায় আক্রমণ করে। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা অবস্থান। যৌথ বাহিনী সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তখন উভয় পক্ষে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মো. আমানউল্লাহ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। পাকিস্তানি সেনাদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়। যৌথ বাহিনী খানসামা দখল করে। যুদ্ধ শেষে সহযোদ্ধারা গ্রামবাসীর সহায়তায় মো. আমানউল্লাহকে সেখানেই সমাহিত করেন।

AMARBOI.COM

মো. আমানউল্লাহর শহীদ হওয়ার ঘটনা তাঁর পরিবার জানতে পারে দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরফ থেকে একটি চিঠি পেয়ে।

মো. আমানউল্লাহ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে ওই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। দিনাজপুরের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি জেড ফোর্সে না গিয়ে ৭ নম্বর সেক্টরের অধীনেই যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. জামালউদ্দীন, বীর বিক্রম

গ্রাম আড়ালিয়া, সদর, জামালপুর।
বাবা নাছিরউদ্দীন, মা জয়তুন নেছা। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৯।
শহীদ ২৬ জুলাই ১৯৭১।

জামালউদ্দীনের দলনেতা গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল বিরিশিরি থেকে গোলাবারুদ ও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে কলমাকান্দা থানায় যাবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করার। বিরিশিরি ও কলমাকান্দা নেত্রকোনার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে যানবাহন চলার জন্য সেখানে কোনো পাকা রাস্তা ছিল না। সোমেশ্বরী নদী পার হয়ে নাজিরপুর গ্রামের ভেতর দিয়ে একটি গ্রামীণ পথ ধরে যেতে হতো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীর তিনটি দল রওনা হলো নাজিরপুরে। একটি দলের নেতৃত্বে ইপিআরের আবদুল গনি। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে পুলিশের রহমতউল্লাহ। তৃতীয় দলের নেতৃত্বে নাজমুল হক। তাঁর দলে জামালউদ্দীনসহ ৩০ জন। সিদ্ধান্ত মতো, তাঁরা নাজিরপুরে অবস্থান নেবেন তিনটি পৃথক স্থানে। ২৫ জুলাই রাতের মধ্যেই তাঁরা নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিলেন।

জঙ্গলের ভেতর কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পাকিস্তানি সেনাদের কোনো সন্ধান না পেয়ে আবদুল গনির দল কোনো খবর না দিয়েই ফিরে যান নিজেদের ক্যাম্পে। রহমতউল্লাহর দলের সামনে দিয়ে খাদ্যসামগ্রীসহ যাচ্ছিল একদল রাজাকার। তাদের বেশির ভাগকে রহমতউল্লাহর দল প্রায় বিনা যুদ্ধে আটক করে। এরপর তিনি তাঁর দল নিয়ে অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করেন। এর মধ্যে পালিয়ে যাওয়া রাজাকাররা পাকিস্তানি সেনাদের কাছে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়।

২৬ জুলাই সকাল নয়টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল চারদিক থেকে গুলি করতে করতে সেদিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এতে জামালউদ্দীনের দলনেতা বিভ্রান্ত হন। পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করা হচ্ছে। সেদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকার কথা। যখন বুঝতে পারলেন তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা ক্রল করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে ঢুকে পড়ে। জামালউদ্দীন ছিলেন এলএমজিম্যান। তিনি তাঁর এলএমজি দিয়ে বীর বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে লাগলেন। জামালউদ্দীনের সাহস ও রণকৌশল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা জামালউদ্দীনের এলএমজি অবস্থান চিহ্নিত করে চারদিক থেকে তাঁর ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন তিনি।

জামালউদ্দীন ১৯৭১ সালে ছিলেন ১৭-১৮ বছরের যুবক। কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসের প্রথমার্ধে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তুরায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেশখোলা সাব-সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম সরাসরি যুদ্ধ। এর আগে তিনি কয়েকটি ছোটখাটো অপারেশনে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. শাহজাহান, বীর বিক্রম

গ্রাম চর ভাটিয়ালী (গুণের বাড়ি), ইউনিয়ন সিধুলী
মাদারগঞ্জ, জামালপুর। বাবা জসিমউদ্দীন সরকার,
মা তছিরন বেওয়া। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৪। শহীদ অক্টোবর ১৯৭১।

মধ্যরাতে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিলেন সীমান্তসংলগ্ন বিরাট এক আখখেতের বিভিন্ন জায়গায়। অদূরেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সুরক্ষিত ঘাঁটি। পাকিস্তানি সেনাদের প্রলুব্ধ করার জন্য তাঁরা আখখেত থেকে কয়েকটি গুলি ছুড়লেন। প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে পাকিস্তানি সেনারা সুরক্ষিত স্থান থেকে বেরিয়ে গুলি করতে করতে ঘাঁটির চারদিকে অবস্থান নিল। মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে তাদের ওপর আক্রমণ চালালেন। তারাও পাল্টা আক্রমণ চালাল। শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ।

আখখেতের এক জায়গায় পরিখায় ছিলেন মো. শাহজাহানসহ দুজন। তাঁদের অস্ত্রের গুলিতে হতাহত হলো দু-তিনজন পাকিস্তানি সেনা। তাদের আর্তচিৎকার শুনে মো. শাহজাহান আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। এরই মধ্যে তাঁদের দলের বেশির ভাগ সদস্য পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। নিবিষ্ট মনে তিনি ও তাঁর এক সহযোদ্ধা গুলি করে চলেছেন। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ঘেরাও করে ফেলে। মো. শাহজাহান সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁদের গুলি শেষ হয়ে গেল। এর পরও তিনি মনোবল হারালেন না। সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে বেয়নেট নিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের বাংকার লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকে। গুলিতে তাঁদের দুজনের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। বাংকারেই শহীদ হলেন তাঁরা।

এ ঘটনা ঘটেছিল কামালপুরে। ১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে। আগস্টের শুরু থেকে মুক্তিবাহিনী কয়েক দিন পর পর কামালপুর ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে থাকে। এসব আক্রমণের বেশির ভাগই ছিল হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতির। এর মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাদের তটস্থ ও হয়রানি করাই ছিল মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্য। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন মুক্তিবাহিনী কামালপুরে আক্রমণ করে। সন্ধ্যার পর মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্তের ওপারের মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্প থেকে রওনা হয়ে রাতে সেখানে পৌঁছান। তারপর আখখেতের মধ্যে পরিখা খনন করে তাতে অবস্থান নেন। মধ্যরাত থেকে যুদ্ধ শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে ওই যুদ্ধ।

মো. শাহজাহান ১৯৭১ সালে ছিলেন ১৬ বছরের কিশোর। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসের দিকে তিনি ভারতে চলে যান। তেলঢালায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. হায়দার আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম শ্রীপুর মাইজহাটি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
বাবা জবেদ আলী ফকির, মা হাজেরা খাতুন।
স্ত্রী উম্মে কুলসুম। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭৪।

অন্ধকারে খালি চোখে দূরে কিছু দেখা যায় না। শেষ রাত। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চা-বাগানের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। মো. হায়দার আলীসহ পরিশ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পে ঘুমিয়ে আছেন। কয়েকজন সহযোদ্ধা সতর্ক প্রহরায়। এ সময় গোলাগুলির শব্দে ভেঙে পড়ল রাতের নিস্তব্ধতা। মুক্তিযোদ্ধারা জেগে জানতে পারলেন, পাকিস্তানি সেনারা পেছন দিক থেকে তাঁদের আক্রমণ করেছে। আকস্মিক এই আক্রমণে তাঁরা কিছুটা হকচকিত। কিন্তু আর ভাবার সময় নেই। যে যেভাবে পারলেন দ্রুত অবস্থান নিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। মুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সিলেটের তেলিয়াপাড়ার একটি চা-বাগানের।

মো. হায়দার আলীসহ তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ব্যর্থ হন। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের ক্যাম্প পাকিস্তানি সেনারা দখল করে নেয়। ১৬ জন যোদ্ধা শহীদ হন। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য অধিনায়ক তাঁদের পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন। সে সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অবস্থানের ওপর বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করছে। তাঁরা কাভারিং ফায়ারের আড়ালে পেছনে যান। কেউ ক্রল করে, কেউ মাথা নিচু করে দৌড়ে।

নিরাপদ স্থানে সমবেত হওয়ার পর অধিনায়ক তাঁদের যেকোনো মূল্যে ওই ক্যাম্প দখল করতে নির্দেশ দেন। মো. হায়দার আলী ও তাঁর সহযোদ্ধারা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে পরদিন ভোর চারটায় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। শুরু হয় আবার প্রচণ্ড যুদ্ধ। একটি টিলার ওপর ছিল পাকিস্তানি সেনাদের মেশিনগান পোস্ট। তারা সেখান থেকে গুলি করছিল। এর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা সামনে এগোতে পারছিলেন না। মো. হায়দার আলী পাহাড়ি নালার মধ্য দিয়ে ক্রল করে একাই এগিয়ে যান সেদিকে। পাকিস্তানি সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি সেই মেশিনগান পোস্টে দুটি গ্রেনেড চার্জ করেন। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে গুলি বন্ধ হয়ে যায়। হায়দার আলী ক্রল করে কাছে গিয়ে দেখেন, চার পাকিস্তানি সেনা আহত অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি এসএমজি ব্রাশফায়ারে তাদের হত্যা করেন। মেশিনগান পোস্ট ধ্বংস হওয়ায় তাঁদের পক্ষে ওই ক্যাম্প পুনর্দখল করা সহজ হয়।

মো. হায়দার আলী ১৯৭১ সালে ইপিআরে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা বিওপিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। পরে ভারতে যান। সেখানে তাঁকে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি ৩ নম্বর সেক্টর ও এস ফোর্সের অধীনে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন।

১৯৯০ সালে বিডিআরের চাকরি থেকে অবসর নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাসিম বিল্লাহ্, বীর বিক্রম

গ্রাম মলামারী, ইউনিয়ন কাকিলাকুড়া, শ্রীবরদী, শেরপুর।
বাবা শাহ মোশাররফ হোসেন, মা ফজিলাতুন নেছা।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৮।
গেজেটে নাম খুররম। শহীদ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটি ছিল জামালপুরের পিটিআই ভবনে। পাকিস্তানি সেনাদের কামালপুর ঘাঁটির পতনের পর ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো জামালপুরে আসতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল মিত্রবাহিনী। তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। এদিকে সীমান্তবর্তী সব ঘাঁটি থেকে সরে আসা পাকিস্তানি সেনারা জামালপুরে সমবেত হওয়ায় সেখানকার পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ সামনে রেখে পাকিস্তানি সেনারা প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলে। ৬ বা ৭ ডিসেম্বর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা জামালপুর শহর ঘেরাও করতে থাকেন। তাঁরা বেষ্টনী গড়ে তোলেন হাটচন্দ্রা, বগাবাইদ, যোগীরগুফা, তিরুটিয়া, পলাশগড়, কালাবো মোল্লাপাড়া হয়ে বেলটিয়া, শাহপুর, লাঙ্গলজোড়া, মাহিমপুর ও হরিপুর পর্যন্ত। ৮ ডিসেম্বরের মধ্যেই বেষ্টনী রচনার কাজ শেষ হয়।

পাকিস্তানি সেনারা প্রথমে এটা বুঝতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ পারে এসে তারা গুলি ছুড়তে থাকে। এর মধ্যে মিত্রবাহিনী কয়েকবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান মাহমুদ তা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। তারপর পাকিস্তানি সেনারা বেলটিয়া গ্রামের কাছে সমবেত হয় এবং যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু তারা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চরমভাবে মার খায়। তারা পালানোর চেষ্টা করতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা বেলটিয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে সেদিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় নির্ভীক মোতাসিম বিল্লাহ্ খুররম বাংকার থেকে বেরিয়ে অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করতে যান। তখন পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে। শহীদ হন তিনি। এ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বরে ঘটেছিল জামালপুরে। পরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে সহযোদ্ধারা পাঠিয়ে দেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মোতাসিম বিল্লাহ ১৯৭১ সালে বিএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর দলের উপদলনেতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান, বীর বিক্রম

গ্রাম তেঘরিয়া, ইউনিয়ন রাজানগর, সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জ। বাবা নওশের আলী খান, মা হাবিবুন নেছা। স্ত্রী সুলতানা খান। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬১।

গভীর রাতে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে একদল মুক্তিযোদ্ধা প্রবেশ করলেন বাংলাদেশের ভেতরে। তাঁদের নেতৃত্বে মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান। দ্রুত তাঁরা পৌঁছে গেলেন নির্দিষ্ট জায়গায়। তাঁরা অন্ধকারে শুরু করলেন পরিখা খননের কাজ। সকাল হওয়ার আগেই প্রস্তুতি শেষ করে অবস্থান নিলেন পরিখার ভেতর। সামনেই একটি রেলপথ। সময় গড়াতে লাগল। তাঁরা ওত পেতে ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন। বেলা আনুমানিক ১১টা। একটু পর একটি ট্রেন আসতে দেখা গেল। মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। ট্রেনটি আওতার মধ্যে আসামাত্র গর্জে উঠল তাঁদের আরআর গান ও রকেট লঞ্চার। নির্ভুল গোলাবর্ষণে ট্রেনের বেশির ভাগ বগি বিধ্বস্ত ও অর্ধেক বগি লাইনচ্যুত হলো। ওই ট্রেনে ছিল অনেক পাকিস্তানি সেনা ও বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র বিহারি। অ্যামবুশে প্রায় ৮০ জন পাকিস্তানি সেনা ও সশস্ত্র বিহারি হতাহত হয়। যারা বেঁচে যায়, তারা নিরাপদে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা সময়ক্ষেপণ না করে দ্রুত সরে পড়েন সেখান থেকে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৫ মে ঘটেছিল গোবিন্দপুরে। গোবিন্দপুর জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার অন্তর্গত। পার্বতীপুর-সান্তাহার রেলপথ পাঁচবিবি এলাকায় ভারতীয় সীমান্তের খুব কাছে। সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খানের নেতৃত্বে সেখানে চলন্ত ট্রেনে অ্যামবুশ করেন। ২৪ মে গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের অভ্যন্তরের সোবরা ক্যাম্প থেকে গোবিন্দপুরে যান। সোবরা থেকে গোবিন্দপুরের দূরত্ব কম ছিল না। এই অপারেশনের জন্য মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান নিজের উদ্যোগে ভারতের বালুরঘাটে একটি লেদ মেশিনের দোকানে হাই কার্বন স্টিলের এমএস পাইপ দিয়ে ছয়টি তিন ইঞ্চি মর্টার ব্যারেল তৈরি করেন। সেগুলো দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা নিখুঁতভাবে গোলা নিক্ষেপ করেন। এ ছাড়া মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাঁদের আরআর গান, রকেট লঞ্চার এবং সেগুলো চালানোর জন্য লোকবল দিয়ে সাহায্য করে।

মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান ১৯৭১ সালে জয়পুরহাট চিনিকলে কর্মরত ছিলেন। সেখানে যোগ দেওয়ার আগে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইএমই কোরে চাকরি করেন। সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। এ সময় বৃহত্তর বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অ্যামবুশে তিনি নেতৃত্ব দেন। পরে মুক্তিবাহিনীর ৭ নম্বর সেক্টরের হামজাপুর সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তিনি কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধেও প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। ১০ ডিসেম্বর দিনাজপুরের বিরলে এক যুদ্ধে তিনি আহত হন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

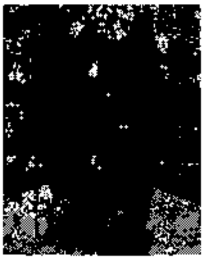

মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বীর বিক্রম

গ্রাম মধুপুর, ইউনিয়ন গোপালপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। বাবা আইয়ুব আলী, মা হালিমা খাতুন। স্ত্রী সাফিয়া বেগম। তাঁদের ছয় মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩১। মৃত্যু ২৫ মার্চ ২০০৯।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্বে মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি তাঁর দল নিয়ে দ্রুত আক্রমণ শুরু করলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে। মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দলও আক্রমণ শুরু করল। মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে নিহত ও আহত হলো বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। কিছুক্ষণ প্রতিরোধ চালানোর পর বাকি পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় ফেলে গেল বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বরে ঘটেছিল আটগ্রামে।

আটগ্রাম সিলেটের জকিগঞ্জ থানার (বর্তমানে উপজেলা) অন্তর্গত। জকিগঞ্জ থানা সদর থেকে উত্তর দিকে। আটগ্রামের পাশেই চারগ্রাম। ১৯৭১ সালে আটগ্রাম ও চারগ্রাম—দুই জায়গায়ই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সেনারা। নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রাভো ও চার্লি কোম্পানি আটগ্রাম ও চারগ্রামে আক্রমণ করে। চার্লি কোম্পানিতে একটি প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম লিখেছেন, 'নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিলেটের চারগ্রাম ও আটগ্রাম এলাকার শত্রুঘাঁটির ওপর আক্রমণের জন্য আমরা সব কমান্ডিং অফিসার এবং কোম্পানি কমান্ডারগণ এ এলাকা ভালোভাবে রেকি করি। ২২ নভেম্বর সকালে আমি বি কোম্পানি নিয়ে আর্টিলারির সাহায্যে চারগ্রাম ঘাঁটি আক্রমণ করি। সারা দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আমরা উক্ত ঘাঁটি দখল করে নিই। শত্রুপক্ষের প্রায় ৩০ জন হতাহত হয় এবং কয়েকজনকে আমরা জীবিত অবস্থায় বন্দী করি। এ ঘাঁটি থেকে আমরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, খাদ্যদ্রব্য এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দখল করি। এ আক্রমণে সাফল্য লাভ করায় আমাদের সৈন্যদের মনোবল অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ যুদ্ধে বি কোম্পানি অত্যন্ত সাহস ও রণকৌশল প্রদর্শন করে। একই দিনে সি কোম্পানি ক্যাপ্টেন নূরের নেতৃত্বে আটগ্রাম ব্রিজ এলাকা আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। এই স্থানেও আমরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি দখল করতে সক্ষম হই। এভাবে আমরা চারগ্রাম ও আটগ্রাম এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করি।'

মোহাম্মদ ইব্রাহিম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধকালে যশোরের বেনাপোলে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি সামান্য আহত হন। পরে ভারতে গিয়ে পুনরায় সংগঠিত হয়ে যুদ্ধ করেন জামালপুর জেলার কামালপুর, মৌলভীবাজার জেলার ধলই বিওপি, সিলেট এমসি কলেজসহ কয়েকটি জায়গায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমজান আলী, বীর বিক্রম

মির্জানগর, পরশুরাম, ফেনী।
বাবা লাল মিয়া, মা মেহের নেছা। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৮৩। শহীদ নভেম্বর ১৯৭১।

একসঙ্গে অনেক অস্ত্রের গর্জন। চারপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তার ভেতর থেকেই ভেসে আসছে আর্তনাদ আর চিৎকারের শব্দ। শত্রুপক্ষের বেশির ভাগ লোকই নিহত। দু-তিনজন কোনোমতে জানে বেঁচে গেছে। তারা পালানোর পথ খুঁজছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তা হতে দিলেন না। শেষ পর্যন্ত একজন শত্রুও প্রাণে বাঁচতে পারল না।

এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ৮ বা ৯ নভেম্বর। ভোরে। ফেনী জেলার বিলোনিয়ায়। সেখান থেকে রেললাইনের পাশ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে ফেনী পর্যন্ত। চিথলিয়া-পরশুরামের মাঝামাঝি এ রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় আগের রাতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছেন রমজান আলীসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। মুক্তিযোদ্ধারা বাংকারে বসে বাইরের দিকে নজর রেখেছেন। চারদিকে সুনসান নীরবতা। সাড়াশব্দ নেই। ঘড়ির কাঁটা এক, দুই, তিন করে ঘুরতে লাগল। এভাবে কেটে গেল বেশ কিছু সময়। হঠাৎ চিথলিয়ার দিক থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। কিছু সময় পর দেখা গেল, ওদিক থেকে রেলের একটি ট্রলি এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে ট্রলিটি আরও কাছে এগিয়ে এল। মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পেলেন, ট্রলিতে বসে আছে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা।

তারপর একসঙ্গে অস্ত্রের গর্জন। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে ট্রলিটি ধ্বংস হয়ে গেল। গোলাগুলির শব্দ শুনে চিথলিয়া ও পরশুরাম থেকে শত্রুপক্ষ এগিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাল। পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণে রমজান আলীর সহযোদ্ধা এয়ার আহমদ শহীদ হন। তাঁকে হারিয়ে কিছুটা মুহ্যমান হয়ে পড়লেও মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর হামলার প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলেন। শত্রুরা তাঁদের ওপর একের পর এক আক্রমণ চালাচ্ছিল।

সারা দিন এখানে যুদ্ধ চলে। শত্রুরা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে বৃষ্টির মতো আর্টিলারি শেলিং করে। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে রমজান আলী আহত হন। সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত ফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা রমজান আলীকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু ওই দিন রাতেই তিনি মারা যান। তাঁর বাড়ি ছিল ওই এলাকাতেই। পরদিন কয়েকজন সহযোদ্ধা রমজান আলীর লাশ তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। নিজ গ্রামেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

রমজান আলী ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে আক্রান্ত হওয়ার পর সেখান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকার মির্জানগর, কাউতলী, বিলোনিয়া, মুন্সিরহাট, সলিয়াদীঘিসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধে অংশ নেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমিজ উদ্দীন, বীর বিক্রম

গ্রাম জগন্নাথপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
বাবা পানাউল্লাহ, মা হাজেরা খাতুন। স্ত্রী জোবেদা খাতুন।
তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮৮।
শহীদ ১৬ মে ১৯৭১।

সীমান্তসংলগ্ন মুক্ত এলাকায় টহল দিচ্ছেন রমিজ উদ্দীনসহ তিন মুক্তিযোদ্ধা। হঠাৎ তাঁদের আক্রমণ করে একদল পাকিস্তানি সেনা। মুক্তিযোদ্ধারা দেখলেন, পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের চারদিক থেকে ঘেরাও করছে। রমিজ উদ্দীন বিচলিত হলেন না। সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকলেন। তাঁর মাথায় তখন একটাই চিন্তা, সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে হবে। কিন্তু বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারলেন না। শত শত গুলি ছুটে আসছে তাঁর দিকে। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তাঁর শরীর। নিজের জীবন দিয়ে দুই সহযোদ্ধা ও পেছনে মূল শিবিরে থাকা সহযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণ করার সুযোগ করে দিলেন। রক্ষা পেল ২১ জন সহযোদ্ধার প্রাণ। এ ঘটনা ১৬ মে ১৯৭১ সালে ঘটেছিল বালুমারা ফরেস্ট এলাকায়।

বালুমারা ফরেস্ট অফিস হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হবিগঞ্জ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর ১ বা ২ মে শায়েস্তাগঞ্জের খোয়াই নদীর তীরে রেললাইনের পাশে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করলেও বালুমারা ফরেস্ট অফিসসহ আশপাশের কিছু এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে ছিল। ফরেস্ট অফিসে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির। মুক্ত এলাকায় ছিলেন ২২ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দলসহ রমিজ উদ্দীন। তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মুক্ত এলাকার সীমান্তে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিলেন।

এদিকে পাকিস্তানি সেনারা বালুমারা এলাকায় তখন পর্যন্ত আক্রমণ না চালালেও মুক্ত এলাকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। তারা মুক্ত এলাকায় নিয়মিত গুপ্তচর পাঠাতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের এক সহযোগীর নাম ছিল তমাই মহালদার। মুক্ত এলাকায় সে গোপনে এসে তথ্য সংগ্রহ করে পাকিস্তানি সেনাদের কাছে পৌঁছে দিত। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে একদিন আটক করে প্রাণদণ্ড দেন। এরপর পাকিস্তানি সেনারা ১৬ মে আকস্মিকভাবে মুক্ত এলাকায় আক্রমণ করে।

রমিজ উদ্দীন কৃষিকাজ করতেন। তবে মুজাহিদ প্রশিক্ষণ নেওয়া ছিল তাঁর। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। তখন তাঁর স্ত্রী সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছর খানেক আগে তিনি বিয়ে করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহুল আমিন, বীর বিক্রম

গ্রাম সিংবাহুড়া, ইউনিয়ন, নোয়াখলা, চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা জালাল আহমেদ মুন্সী, মা ফাতেমা খাতুন।
স্ত্রী তাজনাহার বেগম। তাঁদের এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৯। শহীদ নভেম্বর ১৯৭১।

রুহুল আমিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ২ নম্বর সেক্টরের অধীন রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি, বগাদিয়া, বেগমগঞ্জ, চাটখিল ও রামগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও বীরত্ব দেখান। প্রতিরোধযুদ্ধকালে তাঁর দলনেতা ছিলেন সুবেদার লুৎফর রহমান। নভেম্বরে রুহুল আমিনকে মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলাদলের নেতা হিসেবে রামগঞ্জ এলাকায় পাঠানো হয়। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ।

২৫ নভেম্বর রুহুল আমিন তাঁর দলবল নিয়ে রামগঞ্জের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ চালান। বাজার ও গোডাউন এলাকায় ছিল শত্রুপক্ষের সেই অবস্থান। আক্রমণ শুরু করার আগে মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেন। ভোরে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে তাঁরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ করে। দুই দিন যুদ্ধ চলার পর ২৭ নভেম্বর থেকে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিবর্ষণ থেমে যায়। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে রুহুল আমিন সহযোদ্ধাদের গুলি চালানো বন্ধ করতে বলেন। এভাবে কাটে আরও কিছু সময়। সূর্য তখন পশ্চিম দিকে হেলতে শুরু করেছে। দুঃসাহসী রুহুল আমিন সহযোদ্ধাদের নিজ নিজ অবস্থানে থাকার নির্দেশ দিলেন। আর নিজেই ব্যাপারটা পরখ করতে ক্রল করে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তারপর দেড়-দুই মিনিটও যায়নি, হঠাৎ ব্রাশফায়ারের শব্দ। আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। গুলি এসে লাগল তাঁর তলপেট, বুক আর পায়ে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের দলনেতাকে হারিয়ে কিছুটা হকচকিত। এর পরই তাঁরা পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন। দুই পক্ষেই চলতে থাকল গোলাগুলি। এই ফাঁকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ক্রল করে এগিয়ে গেলেন রুহুল আমিনের কাছে। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি নেতিয়ে পড়েছেন। সহযোদ্ধারা চেষ্টা করলেন তাঁকে বাঁচাতে। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সন্ধ্যায় শহীদ হলেন তিনি। সেদিন রাতেই রামগঞ্জ মুক্ত হয়। পরে সহযোদ্ধারা তাঁর মরদেহ পাঠিয়ে দেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে। পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহ আলী আকন্দ, বীর বিক্রম

গ্রাম কুড়ালিয়া, সদর, সিরাজগঞ্জ। বাবা আশরাফ আলী আকন্দ, মা কুলসুম বেগম। স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১১। গেজেটে নাম শাহ আলী। মৃত্যু ২০০০।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের মুখে শাহ আলী আকন্দ ও তাঁর সহযোদ্ধারা বেশ বেকায়দায়। এমন প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। বৃষ্টির মতো এসে পড়ছে পাকিস্তানি আর্টিলারির গোলা। ক্রমেই তা তীব্র হচ্ছে। প্রস্তুতিহীনভাবে শুরু হলো তাঁদের প্রতিরোধ। তাঁরা চেষ্টা করছেন অবস্থান ধরে রাখতে। দিনভর যুদ্ধে আহত হলেন তাঁদের অনেকে। যুদ্ধ অব্যাহত থাকল। পরদিন আহত হলেন তাঁদের অধিনায়ক সফিকউল্লাহসহ কয়েকজন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অব্যাহত আর্টিলারির গোলায় মুক্তিযোদ্ধারা বেশির ভাগ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ পিছু হটে গেলেন। শাহ আলী আকন্দ, তবারকউল্লাহসহ কয়েকজন চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। পরদিন, তার পরদিনও যুদ্ধ চলল। পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন তিনিসহ বেশ কয়েকজন। তখন তাঁদের অস্ত্রের গুলিও শেষ। বিকেলের মধ্যে তাঁদের সবাইকে পাকিস্তানি সেনারা আটক করল। রাজাকারদের সহায়তায় তাঁদের হাত-পা বেঁধে তারা চলে গেল এলাকার দখল সুসংহত করতে। পাহারায় থাকল রাজাকাররা। তখন হঠাৎ শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি। বৃষ্টি শেষে ঘোর অন্ধকার। এ সময় বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে শাহ আলী আকন্দ এক কৌশল অবলম্বন করলেন। রাজাকারদের বললেন, তাঁর খুব পিপাসা পেয়েছে। সেখানে পাশেই ছিল এক বড় দিঘি। এক রাজাকার কী মনে করে তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে ওই দিঘি থেকে পানি খেয়ে আসতে বলল। সেই সুযোগে তিনি পানিতে নেমে নিঃশব্দে ডুব দিয়ে চলে যান অপর পাড়ে। সেখানে পৌঁছামাত্র রাজাকাররা তাঁর পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি টের পায়। তারা দিঘির ভেতরে ব্রাশফায়ার করে। একটি গুলি এসে লাগে তাঁর ডান হাতে। তিনি আহত অবস্থায়ই ক্রল করে গুলির আওতার বাইরে যাওয়ার পর দৌড় দেন ভারত সীমান্তের দিকে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৭ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরার কলারোয়া থানার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের।

শাহ আলী আকন্দ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর দলের সঙ্গে এতে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ, বসন্তপুর, তুলইগাছা, আশাশুনি, বুড়িগোয়ালিনী, হিজলদী, যশোরের ঝিকরগাছা, নাভারনসহ কয়েকটি জায়গায়। বালিয়াডাঙ্গা যুদ্ধের পর তিনি আর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। আহত অবস্থায় সীমান্তে পৌঁছার পর তাঁকে ভারতের ব্যারাকপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাঁচি হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁর চিকিৎসা চলা অবস্থায় দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার চার মাস পর দেশে ফেরেন তিনি। তাঁর সহযোদ্ধারা মনে করেছিলেন তিনি বালিয়াডাঙ্গার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সে জন্য গেজেটে তাঁকে শহীদ হিসেবে দেখানো হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহজাহান সিদ্দিকী, বীর বিক্রম

গ্রাম সাতমোড়া, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা ১০ নম্বর সড়ক, ৭ নম্বর সেক্টর উত্তরা, ঢাকা। বাবা আবদুর রাজ্জাক সিদ্দিকী, মা মার্জিয়া সিদ্দিকী। স্ত্রী আশরাফুননেসা সিদ্দিকী। তাঁদের তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৯।

ফেরিঘাটে প্রহরায় পাকিস্তানি সেনা আর তাদের সহযোগীরা। পাশেই তাদের ক্যাম্প। নৌ-কমান্ডো শাহজাহান সিদ্দিকী ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে লিমপেট মাইন লাগালেন দুটি ফেরি আর পন্টুনে। তারপর সাঁতরে রওনা হলেন স্রোতের উজানে, নদীর উত্তর দিক-ঘেঁষা পূর্ব পাড়ে। নৌ-কমান্ডোরা ছইঅলা নৌকার কাছে যখন পৌঁছালেন, তখন রাত আনুমানিক দুইটা ৪০ মিনিট। এর একটু পর শুরু হলো একের পর এক বিস্ফোরণ।

শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ফেরিঘাট ও আশপাশের তিন-চার কিলোমিটার এলাকা প্রকম্পিত হলো। নদীর জল ও দুই পাড় কাঁপিয়ে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো নয়টি লিমপেট মাইন। ফেরিঘাটে প্রহরারত পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি আর ছোটাছুটি। এরপর একটানা গোলাগুলি।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট শেষ রাতের, অর্থাৎ ঘড়ির সময় অনুসারে ১৭ আগস্ট ঘটেছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে। কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দাউদকান্দি লাগোয়া মেঘনা নদীর ফেরিঘাট ছিল ঘটনার মূল স্থান। এখন সেখানে নির্মিত হয়েছে সেতু।

এই অভিযানে অংশ নেন আটজন নৌ-কমান্ডো। তাঁদের দলনেতা শাহজাহান সিদ্দিকী। তাঁরা ভারত থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন দাউদকান্দির বন্ধরামপুর গ্রামে। প্রত্যেক কমান্ডোর সঙ্গে একটি করে স্টেনগান, লিমপেট মাইন, ছুরি ও জোড়া ফিনস।

নির্ধারিত দিন রেডিওর গানের মাধ্যমে সিগন্যাল পেয়ে শাহজাহান সিদ্দিকী অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তাঁদের অপারেশন করার কথা ছিল ১৫ আগস্ট মধ্য রাতে। নানা কারণে সেদিন তারা সে অপারেশন করতে পারেননি। পরদিন ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় নৌ-কমান্ডোরা আহারপর্ব শেষে একটি ছইঅলা নৌকায় করে রওনা হলেন দাউদকান্দির ফেরিঘাটের উদ্দেশে। দূরত্ব আট-নয় কিলোমিটার। ফেরিঘাট থেকে দেড়-দুই কিলোমিটার দূরত্বে এসে ছইঅলা নৌকা রেখে তাঁরা উঠলেন খোলা নৌকায়। ওখান থেকে ফেরিঘাটে পৌঁছাতে তাঁদের সময় লাগে ২০ থেকে ২৫ মিনিট।

১৯৭১ সালে শাহজাহান সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজ এলাকা হয়ে ভারতে যান। মে মাস থেকে তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তিনি পরে আরও কয়েকটি স্থানে সাফল্যের সঙ্গে অপারেশন করেন।

২০০৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার আফজাল হোসেন

বীর বিক্রম

গ্রাম ধোপাদহ, ইউনিয়ন কাশিপুর, লোহাগড়া, নড়াইল। বাবা জসিমউদ্দীন, মা আয়মনা খাতুন। স্ত্রী রাবেয়া বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫০। গেজেটে নাম এস আফজাল হোসেন।

১৯৭১ সালের ২১ জুলাই খুব সকালে শিকদার আফজাল হোসেন খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী একদল ইপিসিএএফ কুমিল্লা থেকে বুড়িচং আসছে। খবর পেয়েই সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের অ্যামবুশ করার। তখন বুড়িচং থানা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বুড়িচং কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত। পাশেই ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত। এই এলাকা দিয়েই ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করতেন। সে জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা এই এলাকায় বেশি বিচরণ করত। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালাতেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিকদার আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে ২৭ জন মুক্তিযোদ্ধা গোপনে অবস্থান নিলেন বুড়িচং থানার এক গ্রামে। গাছের লতাপাতা, ঝোপঝাড় বা গাছের আড়ালে তাঁরা ওত পেতে থাকেন। তারপর সময় গড়াতে থাকে। একসময় তাঁরা দেখতে পান, মাঠের ভেতর দিয়ে ইপিসিএএফ সদস্যরা দল বেঁধে আসছে। বেশ নিশ্চিন্তেই এগিয়ে আসছে তারা। তখন সকাল আনুমানিক নয়টা। শিকদার আফজাল হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের আঙুল অস্ত্রের ট্রিগারে। তারা অস্ত্রের আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল কয়েকজন। হকচকিত ইপিসিএএফ সদস্যরা দৌড়াদৌড়ি করে যে যেখানে পারল অবস্থান নিল। বিপর্যয় কাটিয়ে ইপিসিএএফ সদস্যরাও প্রবলভাবে পাল্টা আক্রমণ করলে শুরু হয় যুদ্ধ। চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ইপিসিএএফ ছিল তাঁদের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি। আর তাঁরা ছিলেন মাত্র ২৮ জন। সন্ধ্যার পর ইপিসিএএফ সদস্যরা পিছু হটে বুড়িচং থানায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধে ইপিসিএএফের ৩০ জন নিহত হয়। ছয়জন তাঁদের হাতে ধরা পড়ে। মুক্তিবাহিনীর নায়েক কবির শহীদ হন এবং শেখ আলম ও আবদুল আলিম আহত হন।

শিকদার আফজাল হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসে। ২৫ মার্চ আক্রান্ত হওয়ার পর অন্যদের সঙ্গে বিদ্রোহ করে সেনানিবাসের ভেতরে শুরু হওয়া প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি সেনানিবাস ছেড়ে আসেন। পরে ২ নম্বর সেক্টরের মতিনগর সাব-সেক্টর এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ করেন। তাঁকে একটি গেরিলাদল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বুড়িচং, দেবীদ্বার, মুরাদনগর ও চান্দিনা থানার কিছু অংশে তাঁরা গেরিলাযুদ্ধ করেন। বেশ কয়েকটি সফল অপারেশনে নেতৃত্ব দেন তিনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহিদউল্লাহ ভূঁইয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম শেফালীপাড়া, ইউনিয়ন কাঞ্চনপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। বাবা ছফিউল্লাহ ভূঁইয়া, মা জাহেদা খাতুন। স্ত্রী মনোয়ারা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮। শহীদ ১২ আগস্ট ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল হিলিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। হিলি দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযোদ্ধারা বেশির ভাগ ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা আর কিছু ইপিআর সদস্য। হিলির অদূরে ভারতীয় সীমান্তে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হেডকোয়ার্টার। এপ্রিল ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক সময়। তখন মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন অসংগঠিত। সে জন্য তাঁদের আক্রমণগুলোও ছিল অসংগঠিত ও দুর্বল। এ ছাড়া তাঁদের ছিল না আধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৩-১৪ এপ্রিল বগুড়া দখল করলে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল) একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে হিলিতে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলেন। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানি অবস্থান নেয় চরখাই এলাকায়। ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাঁচবিবির দিক থেকে হিলিতে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ করেন। চার ঘণ্টাব্যাপী পাল্টাপাল্টি আক্রমণ ও যুদ্ধে বারুদের গন্ধে হিলির বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে।

এরপর চরখাইয়ে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাপ্টেন আনোয়ার হিলিতে এসে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেন। চরখাইয়ে সহিদউল্লাহ ভূঁইয়া, সুবেদার হাফিজ ও নায়েব সুবেদার করম আলী নিজ নিজ দল নিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন। ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নির্দেশে তাঁরা ২০ এপ্রিল সকালে হিলিতে সমবেত হন। সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবার আক্রমণ করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ছয়জন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন।

সহিদউল্লাহ ভূঁইয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মার্চের শুরুতে সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের কথা বলে তাঁদের বেশির ভাগ সেনাকে সেনানিবাসের বাইরে সীমান্তবর্তী এলাকায় মোতায়েন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর দল নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। কোনো এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। পরিবারের কাছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরফ থেকে দেওয়া একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, তিনি ১২ আগস্ট দিনাজপুর জেলার মনোহরপুরে সংঘটিত এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম

গ্রাম খড়গমারা, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি ৯, সড়ক ১৪সি, সেক্টর ৪, উত্তরা, ঢাকা। বাবা এ এইচ এম করিমউল্লাহ, মা লায়লা জোহরা বেগম। স্ত্রী রাশিদা সাফায়াত। তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩।

১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫/৫ গোর্খা রেজিমেন্টের তিনটি কোম্পানি সিলেটের রাধানগরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে তারা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। এরপর মিত্রবাহিনীর জেনারেল গিল সিলেটের রাধানগর এলাকার ছোটখেল মুক্ত করার দায়িত্ব দেন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক সাফায়াত জামিলকে।

২৭ নভেম্বর গভীর রাতে শুরু হলো সেই ঐতিহাসিক অভিযান। ধানখেতের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে চললেন পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের দিকে। সবার সামনে সাফায়াত জামিল ও একটি কোম্পানির অধিনায়ক এস আই এম নূরুন্নবী খান। পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের কাছাকাছি গিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন বাঁ দিক থেকে। এস আই এম নূরুন্নবী ডান দিক দিয়ে অগ্রসর হলেন। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গুলি করতে করতে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন বাংকারের দিকে এগিয়ে চললেন। কয়েকটি বাংকারে হাতাহাতি যুদ্ধ হলো। প্রচণ্ড আক্রমণের তীব্রতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল। মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই ছোটখেল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে এল।

যোদ্ধা হিসেবে গোর্খাদের সুনাম পৃথিবীব্যাপী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্ট যা পারেনি, বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা তা-ই সম্ভব করেন। ছোটখেল অভিযানে নিহত হলো অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা। ধরা পড়ল কয়েকজন। তখনো আশপাশে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলছে। চারপাশে পাকিস্তানি সেনাদের লাশ, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ভোরের আলোয় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার কাজ তদারক করছেন সাফায়াত জামিল। এমন সময় তাঁর কোমরের ডান পাশে গুলি লাগে। ছিটকে পড়েন তিনি, গুরুতর আহত হন। সহযোদ্ধারা তাঁকে ফিল্ড হাসপাতালে পাঠান।

সাফায়াত জামিল ইস্ট চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসনের কথা বলে পাকিস্তানি সেনারা এই রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানিকে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠায়। একটি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর ও অপর কোম্পানির সবাইকে নিয়ে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধপর্বে আশুগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া-গঙ্গাসাগর এলাকায় যুদ্ধ করেন। এরপর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মতিনগরে যান। পরে তাঁকে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি দেওয়ানগঞ্জ, সিলেটের ছাতকসহ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল ইসলাম, বীর বিক্রম

গ্রাম ফিলনী, ইউনিয়ন এলংজুরি, ইটনা, কিশোরগঞ্জ।
বাবা মকতুল হোসেন, মা গফুরন নেছা।
অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৫। শহীদ ৮ আগস্ট ১৯৭১।

শ্রাবণ মাস। ভোর। মেঘে ঢাকা আকাশ। সারা রাত থেমে থেমে হালকা বৃষ্টি হয়েছে। চারদিকে কাদা আর পানি। এরই মধ্যে নিঃশব্দে একদল মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে চলেছেন। এই দলে আছেন সিরাজুল ইসলাম। তাঁদের লক্ষ্য পাকিস্তানি সেনাদের একটি ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা কীভাবে যেন তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। বাংকার থেকে তারা ব্যাপক গুলি শুরু করে। আকস্মিক এই আক্রমণের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা হকচকিত হয়ে পড়েন। তবে নিজেদের সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন।

মুক্তিযোদ্ধারা ক্রল করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের ছোড়া প্রবল গুলিবর্ষণের মুখে তাঁরা সামনে এগোতে পারছিলেন না। কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যান তাঁরা। হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আর্তনাদ আর চিৎকার। গুলিতে ইতিমধ্যে একজন সহযোদ্ধা শহীদ এবং দুজন আহত হন। এ অবস্থায় সিরাজুল ইসলাম সহযোদ্ধাদের সামনে আর না এগিয়ে একই অবস্থানে থেকে গুলি চালাতে বলেন। তারপর কয়েকটি গ্রেনেড নিয়ে তিনি একাই ক্রল করে এগিয়ে যান শত্রুর বাংকার অভিমুখে। শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে সফলতার সঙ্গেই তিনি গ্রেনেড চার্জ করেন। তাঁর সফল গ্রেনেড চার্জে শত্রুর দুটি বাংকার ধ্বংস হয়ে যায়। এ ঘটনায় পাকিস্তানি সেনারা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই অবস্থা টের পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের আক্রমণ আরও জোরদার করেন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনারাই কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

এই সাফল্য ও জয়ে সিরাজুল ইসলাম কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েন। জয়ের অদম্য নেশায় তিনি পাকিস্তানি সেনাদের তৃতীয় বাংকার লক্ষ্য করে গ্রেনেড চার্জ করতে যান। আর ঠিক তখনই শত্রুর একটি গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে।

আহত সিরাজুল ইসলামকে তাঁর সহযোদ্ধারা মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়। কিন্তু পথেই তিনি শহীদ হন। সেদিনের এ যুদ্ধে সিরাজুল ইসলামসহ ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং কয়েকজন আহত হন। পাকিস্তানি বাহিনীরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৮ আগস্টে ঘটেছিল সাচনাবাজারে। সাচনা সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী একটি ঘাঁটি ছিল।

সিরাজুল ইসলামকে সীমান্তবর্তী টেকেরহাটের একটি পাহাড়ে সমাহিত করা হয়।

সিরাজুল ইসলাম ১৯৭১ সালে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আসামের ইকো ওয়ান সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ৫ নম্বর সেক্টরের বড়ছড়া সাব-সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল হক, বীর বিক্রম

গ্রাম কাপড়চতলী, ইউনিয়ন চিওড়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
বাবা লাল মিয়া, মা হাজেরা খাতুন।
স্ত্রী শরীফা খাতুন। খেতাবের সনদ নম্বর ৮৭।
শহীদ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

দরিদ্র কৃষকের সন্তান সিরাজুল হক কৃষিকাজ করতেন। অনিয়মিত মুজাহিদ বাহিনীতেও প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২৭-২৮ বছর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রথমে নিজ এলাকা চৌদ্দগ্রামে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। এ সময় চৌদ্দগ্রামে বেশ কয়েকটি প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৪ মে ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩৯ বালুচ রেজিমেন্টের একাংশ চৌদ্দগ্রাম বাজার আক্রমণ করে। তখন সেখানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। সিরাজুল হক এ যুদ্ধে অংশ নিয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩০ থেকে ৩৫ জন নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর আটজন শহীদ হন। এরপর ২৬ মে, ২৯ মে ও ৩০ মে তারিখে সেখানে আবার যুদ্ধ হয়।

চৌদ্দগ্রামের পতন হলে সিরাজুল হক প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতে চলে যান। সেখানে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর তিনি যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের মন্দভাগ সাব-সেক্টরে। এই সাব-সেক্টর এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মন্দভাগ রেলস্টেশন থেকে কুটি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বায়েক, কাইমপুর, কসবা থানার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত মন্দভাগ সাব-সেক্টরে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সেপ্টেম্বরে একদিন মন্দভাগ এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় ধরনের একটা যুদ্ধ হয়। সেদিন একটা বাংকারে সিরাজুল হকসহ তাঁর তিন সহযোদ্ধা অবস্থান নিয়ে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা ওই বাংকার চিহ্নিত করে মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। গোলার আঘাতে সিরাজুল হকসহ চারজনই শহীদ হন। পরে অন্য সহযোদ্ধারা তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে ভারতে নিয়ে যান। মেলাঘরে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের পাশে তাঁদের সমাহিত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতান আহমেদ, বীর বিক্রম

গ্রাম ফতেয়াবাদ, ১ নম্বর দক্ষিণ পাহাড়তলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। বাবা মোখলেসুর রহমান সরকার, মা আজব খাতুন। স্ত্রী জরিনা খাতুন। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯৪। মৃত্যু ১৯৭৯।

একদল প্রতিরোধযোদ্ধা অবস্থান নিয়েছেন ঢাকার অদূরে। ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে কাছাকাছিই ছিলেন সুলতান আহমেদ। তাঁরা সবাই ইপিআর সদস্য। তিনি তাঁর দল নিয়ে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। এরপর অবস্থান নিলেন ডাঙ্গা নামের জায়গায়। পরদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের অবস্থানের কাছে আসামাত্র তাঁরা আক্রমণ চালালেন। নিহত হলো অনেক পাকিস্তানি সেনা। পাল্টাপাল্টি আক্রমণের একপর্যায়ে চারদিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় ঘেরাও করে ফেললেন তাঁরা। বিপৎসংকুল হয়ে পড়ল পাকিস্তানি সেনাদের পশ্চাদপসরণ। শেষে আর্টিলারি ফায়ারের সাহায্য নিয়ে তারা পালিয়ে গেল।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথমার্ধের। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের ২ নম্বর ইপিআর উইংয়ের দুই কোম্পানি ইপিআর সদস্য নরসিংদীর পাঁচদোনায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। সুলতান আহমেদ তাঁর দল নিয়ে সেখানে ১ এপ্রিল যোগ দেন। তাঁরা অবস্থান নেন পাঁচদোনার চার মাইল পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পারে ডাঙ্গা নামের জায়গায়। পরদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল ঢাকা থেকে নরসিংদী যাচ্ছিল। সুলতান আহমেদ তাঁর ক্ষুদ্র দল নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেন। ফলে পাকিস্তানি সেনারা পশ্চাদপসরণ করতে পারছিল না। এরপর পাকিস্তানি সেনাদের নতুন দল এসে ব্যাপক আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তার পরও মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাও করে রাখেন। যুদ্ধ চলতে থাকে। পরদিন পাকিস্তানি বিমান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এর মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা আরও কয়েক দিন তাঁদের অবস্থান ধরে রাখেন। ১১ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন দল বিমানবাহিনীর সহায়তা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ করে। কয়েক দিনের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদ কমে এসেছিল। কয়েকটি প্রতিরক্ষা অবস্থান একদম গুলিশূন্য হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় তাঁরা পশ্চাদপসরণ করে মাধবপুরে সমবেত হন।

সুলতান আহমেদ চাকরি করতেন ইপিআরে। নায়েব সুবেদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন ঢাকার পিলখানা সদর দপ্তরে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২২ বালুচ রেজিমেন্ট তাঁদের আক্রমণ করে। ঘুমন্ত অবস্থায় ইপিআরের অনেক সদস্য শহীদ হন। অনেকে আটক হন। সুলতান আহমেদসহ কয়েকজন বেঁচে যান। তাঁরা পিলখানা থেকে বেরিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে নিরাপদ স্থানে সমবেত হন। এরপর নরসিংদীর পাঁচদোনায় যান। সেখানে অবস্থানকালে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। পরে ৩ নম্বর সেক্টর ও নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। মাধবপুর, আখাউড়া, আশুগঞ্জসহ কয়েকটি স্থানে সুলতান আহমেদ যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ আমীরুজ্জামান, বীর বিক্রম

গ্রাম হরিন্দী, শ্রীপুর, মাগুরা।
বাবা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ, মা আলতাফুননেছা।
স্ত্রী রিজিয়া খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯৫। মৃত্যু ২০০৯।

যুদ্ধ শেষে সৈয়দ আমীরুজ্জামান তাঁর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ক্যাম্পে ফিরছিলেন। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সফল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাঁরা যখন ক্যাম্পের কাছাকাছি তখন একজন এসে খবর দিল, তাঁদের অপর একটি দলকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ করেছে। সেখানে যুদ্ধ চলছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের গুলি শেষ হওয়ার পথে। সাহায্য না পাঠালে তাঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই চরম বিপদের সম্মুখীন হবেন। জায়গাটা কয়েক কিলোমিটার দূরে।

এ খবর কতটা সঠিক, সে ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিত হতে পারছেন না। এটা পাকিস্তানি সেনাদের ফাঁদ পাতার মতো ব্যাপারও হতে পারে। তাঁরা কী করবেন, চিন্তা করছেন। তা ছাড়া তাঁদের অধিনায়ক সঙ্গে নেই। আমীরুজ্জামানের মনে হলো, খবরটা সঠিক। এরপর তিনি এককভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সহযোদ্ধাদের নিয়ে রওনা হলেন ঘটনাস্থলের দিকে। কিছুদূর যেতেই শুনতে পেলেন গোলাগুলির শব্দ। দ্রুত তাঁরা এগিয়ে যেতে থাকলেন ঘটনাস্থলের দিকে। সেখানে পৌঁছেই পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন তাঁরা। এতক্ষণ আক্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের প্রবল প্রতিরোধ করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের পেয়ে তাঁরাও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করলেন। দুই পক্ষে চলতে লাগল প্রচণ্ড যুদ্ধ।

সৈয়দ আমীরুজ্জামান সাহসের সঙ্গে মর্টার লঞ্চার দিয়ে গোলাবর্ষণ করতে করতে একদম পাকিস্তানি সেনাদের কাছাকাছি গিয়ে অবস্থান নিলেন। তাঁর সঙ্গে এগিয়ে গেলেন আরও কয়েকজন। তাঁদের সবার পাল্টা ঝটিকা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা প্রায় দিশেহারা হয়ে পিছু হটতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একটি গুলি এসে বিদ্ধ হলো সৈয়দ আমীরুজ্জামানের কোমরে। তিনি পড়ে গেলেন। সহযোদ্ধারা তাঁকে নিয়ে গেলেন নিরাপদ জায়গায়। একটু পর পাকিস্তানি সেনাদের পালিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেল। এরপর তাঁরা তাঁকে নিয়ে দ্রুত রওনা হলেন সীমান্তসংলগ্ন ক্যাম্পে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে পাঠানো হলো বহরমপুর হাসপাতালে।

এ ঘটনা ঘটেছিল ইসলামপুরে। ১৯৭১ সালের ১২ নভেম্বরে। ইসলামপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটা ঘাঁটি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকবার ইসলামপুরের পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালান। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীনের (বীর বিক্রম, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) নেতৃত্বে সেখানে আক্রমণ চালান। সফল অপারেশন শেষে ক্যাম্পে ফেরার পথে পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিতে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলকে মরা পদ্মার কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাল্টা আক্রমণ করে। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ইসলামপুর মুক্ত হয়।

সৈয়দ আমীরুজ্জামান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রাজশাহী ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের সিগন্যাল ইউনিটে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কারও নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে সিগন্যাল বেতারের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বার্তা ছড়িয়ে দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন।

হাবিবুর রহমান, বীর বিক্রম

গ্রাম সাধুর গলগণ্ডা, ইউনিয়ন জামুরিয়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। বাবা মো. কলিমুদ্দিন, মা সৈয়দুন্নেছা। স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমীন। তাঁর ছয় মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৫। মৃত্যু ১৯৯৮।

AMARBOI.COM

১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট রাতে সাতটি ছোট-বড় জাহাজ হঠাৎ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ধলেশ্বরী নদীর সিরাজকান্দি ঘাটে নোঙর করে। এ খবর দ্রুত পৌঁছাল স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের যে দলটি ছিল, তার দলনেতা ছিলেন হাবিবুর রহমান। তাঁরা সবাই কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্য। হাবিবুর রহমান জানতে পারেন, নোঙর করা জাহাজে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। এটা জেনে তাঁরা পুলকিত হলেন। কারণ, তাঁদের উন্নত অস্ত্র নেই। তাঁরা শুধু বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন।

টাঙ্গাইল অঞ্চলে যুদ্ধরত কাদেরিয়া বাহিনীর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী হাবিবুর রহমানকে জানালেন, ওই জাহাজে আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র দখল করতে পারলে ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সহজ হবে। এ জন্য তিনি রেজাউল করিমের নেতৃত্বে আরও একটি দলকে তাঁর কাছে পাঠালেন। কাজটা অত সহজ ছিল না। উত্তরে মাটিকাটায় তাঁরা অবস্থান নেন। ১১ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে জাহাজগুলো তাঁদের অবস্থানের কাছাকাছি চলে আসে।

তাঁরা নদীর যে পাড়ে অবস্থান নিয়েছিলেন, তার পাশ দিয়েই ওই জাহাজগুলো যাচ্ছিল। হাবিব সহযোদ্ধাদের বলে দিলেন তাঁর সংকেতের আগে কেউ যেন গুলি না করেন। তাই সবাই অ্যামবুশস্থলে চুপ করে ছিলেন। এর মধ্যে দুটি জাহাজ চলে যায়। সবাই অস্ত্রের ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় সবচেয়ে বড় দুটি জাহাজ তাঁদের সামনে আসে। তখন জাহাজে পাকিস্তানি সেনারা গল্পগুজবে মশগুল। হাবিবের এলএমজি গর্জে ওঠামাত্র সহযোদ্ধারা মর্টার, এলএমজি ও রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করেন। ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা আঘাত করে সারেঙের কেবিন ও পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে। হতাহত হয় বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা। বেঁচে যাওয়া অন্য পাকিস্তানি সেনারা প্রতিরোধের চেষ্টা না করে স্পিডবোটে করে পালিয়ে যায়। সামনের দুটি ও পেছনে থাকা বাকি জাহাজও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যে এগিয়ে না এসে পালাতে থাকে।

হাবিবের নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা জাহাজ দুটি থেকে সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে নিতে থাকেন। ছয় ঘণ্টায় তাঁরা প্রায় ৫০০ অস্ত্র ও গোলাবারুদের বাক্স নামাতে সক্ষম হন। এর পরও বিপুল অস্ত্র জাহাজে থেকে যায়। সেগুলো তাঁরা নেননি। কারণ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁরা চলে আসেন। আগুনে গোলাবারুদ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে দুটি জাহাজই ধ্বংস হয়। এর পর থেকে হাবিবুর রহমানের নাম হয়ে যায় জাহাজমারা হাবিব।

হাবিবুর রহমান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। পরে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেন। টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তিনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীর প্রতীক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলিক কুমারগুপ্ত, বীর প্রতীক

গ্রাম মহেন্দ্রপুর, রাজবাড়ী।
বাবা মনোরঞ্জন গুপ্ত, মা নমিতা গুপ্ত। স্ত্রী কান্তা নন্দী।
তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৭।

১৯৭১ সালে অলিক কুমারগুপ্তের বয়স ছিল ২৩। লেখাপড়া শেষ করেছেন। কিছুদিন পর শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। ৭ মে তিনি ভারতের করিমপুরে (বেতাগী) যান। সেখানে একটি শিবিরে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় তাঁকে প্রথম বাংলাদেশ কমিশন অফিসার ওয়ার কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিশন লাভের পর তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে ৮ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর কল্যাণীতে পাঠানো হয়। ১৩ অক্টোবর তিনি ওই সেক্টরের অধীন বয়রা সাব-সেক্টরে সহকারী অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান। সাব-সেক্টরটির অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল)।

১৭ অক্টোবর ছুটিপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩৮ এফএফ রেজিমেন্টের এক প্লাটুন শক্তিসম্পন্ন একটি প্রতিরক্ষা অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করেন। অলিক কুমারগুপ্ত এ যুদ্ধে অংশ নেন। ২৬ অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা যশোর-চুড়ামনকাঠি-চৌগাছা সড়কের সলুয়া বাজার সেতু রক্ষায় নিয়োজিত পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও রাজাকারদের আক্রমণ করেন এবং আংশিকভাবে সেতুটি ধ্বংস করেন। ১১ নভেম্বর তাঁরা চৌগাছা সীমান্তসংলগ্ন মাসলিয়া-চৌগাছা সড়কে অ্যামবুশের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩৮ এফএফ রেজিমেন্টের একটি অগ্রবর্তী দলকে আক্রমণ করে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন। যুদ্ধের পর তাঁরা ওই রেজিমেন্টের বিভিন্ন পদবির নয়জন সেনার মৃতদেহ ও তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে ভারতে নিয়ে যান। এর পর থেকে তাঁরা ভারতীয় বাহিনীর অধীনে যুদ্ধ করেন।

অলিক কুমারগুপ্ত স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন। পরে মেজর পদ থেকে অবসর নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখতার আহমেদ, বীর প্রতীক

৬ নম্বর অভয় দাস লেন, ঢাকা। বর্তমান ঠিকানা পুরোনো ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা। বাবা আবদুস সুলতান মল্লিক, মা মনিরুন্নেছা মল্লিক। স্ত্রী খুকু আহমেদ। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১২।

আখতার আহমেদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে চাকরি করতেন। চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসে। এখানে ছিল চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। মার্চের মাঝামাঝি সম্ভাব্য ভারতীয় হামলা মোকাবিলার কথা বলে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সেনানিবাসের বাইরে পাঠানো হয়। তাঁকেও যুক্ত করা হয় এই ইউনিটের সঙ্গে।

২৫ মার্চের আগে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একাংশের অবস্থান ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আখতার আহমেদও ছিলেন সেখানে। ২৭ মার্চ মেজর সাফায়াত জামিলের (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল) নেতৃত্বে তাঁরা বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এ বিদ্রোহে আখতার আহমেদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খালেদ মোশাররফের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) নেতৃত্বে ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ যখন তীব্রতর হচ্ছিল, তখন তাঁর সেনাদলে আহত ও নিহত সেনার সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সেনা ও গণবাহিনীর সদস্যদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল না। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন আখতার আহমেদ। অফিসার বেশি না থাকায় তিনি তাঁকেও একটা কোম্পানির কমান্ডার বানিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করেন। ক্যাপ্টেন আখতার যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

খালেদ মোশাররফের যুদ্ধদলে দ্রুত চিকিৎসার অভাবে অনেক নিয়মিত সেনা ও গণবাহিনীর সদস্যরা রক্তক্ষরণে মারা যেতে থাকেন। তিনি নিজের সেক্টরেই চিকিৎসাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে এনে তাঁর হেডকোয়ার্টারের কাছে হাসপাতাল স্থাপনের নির্দেশ দেন তিনি। ঢাকা থেকে কিছুসংখ্যক ছেলেমেয়ে ওই সেক্টরে এসে আশ্রয় নেন। দু-একজন শিক্ষানবিশ চিকিৎসক ছিলেন তাঁদের মধ্যে। তাঁদের নিয়ে ক্যাপ্টেন আখতার কয়েকটি তাঁবুতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম বাংলাদেশ হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। হাসপাতালটি ছিল একটি সুন্দর বাগানের ভেতর উঁচু ও শান্ত পরিবেশে।

হাসপাতালটির নাম ছিল 'বাংলাদেশ হাসপাতাল'। এটি মে মাসে আগরতলার মতিনগরে স্থাপন করা হয়। জুলাইয়ে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে হাসপাতালটি সীমান্ত এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। পরে বিশ্রামগঞ্জে আবার স্থানান্তর করে তা আরও প্রসারিত করা হয়। তখন এই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ছিল ২০০। অন্যান্য সেক্টরের চেয়ে ২ নম্বর সেক্টরের বাংলাদেশ হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল অনেক ভালো ও কার্যকর। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় আখতার আহমেদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আখতার আহমেদের ছোট ভাই মঞ্জুর আহমেদও বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজুল হক, বীর প্রতীক

রামকৃষ্ণ মিশন রোড, জেলা শহর, লালমনিরহাট।
বাবা ছখিউদ্দিন আহমেদ, মা আছিয়া খাতুন।
স্ত্রী ফরিদা হক। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৯।

১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর সকালে নাগেশ্বরী-ভূরুঙ্গামারী সড়কসংলগ্ন সন্তোষপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর দুজন সশস্ত্র সেনাসদস্যকে দেখতে পান আজিজুল হক এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের ধরে ফেলেন। তাঁদের একজনের নাম আতা মোহাম্মদ, সে ৪৮ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সৈনিক এবং অন্যজন সেপাই আসলাম খান নেওয়াজি। তারা ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সদস্য ছিল।

আজিজুল হক ১৯৭১ সালে রংপুর ইপিআরের ১০ নম্বর উইংয়ের সঙ্গে সংযুক্ত মুজাহিদ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চের ১০ দিন আগে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে লালমনিরহাট শহরে বাবার বাড়িতে আসেন। ছুটি শেষে চাকরিতে আর যোগ দেননি।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে তিনি ভারতে যান। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ৮ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরে হাজির হন তিনি। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ তাঁকে কোম্পানির কমান্ডার পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর যুদ্ধ এলাকা ছিল কুড়িগ্রাম জেলার জয়মনিরহাট, ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, পাটেশ্বরী, রায়গঞ্জ ও সন্তোষপুর।

১৯৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ন্যাশনাল মিলিশিয়া গঠিত হলে তিনি গাইবান্ধার ন্যাশনাল মিলিশিয়ার ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট নিযুক্ত হন। পরে তাঁকে অনারারি ক্যাপ্টেন পদমর্যাদা দেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

আনিসুল হক আকন্দ, বীর প্রতীক

গ্রাম লংপুর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
বাবা আবদুল আজিজ আকন্দ, মা মুসলিমা খাতুন।
স্ত্রী নূর নাহার। তাঁদের ছয় ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৯৮। মৃত্যু ২০০৮।

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম কামালপুর। ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা। এ গ্রামের মাঝামাঝি আছে সীমান্ত ফাঁড়ি (বিওপি)। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৪ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সিদ্ধান্ত নেয়, কামালপুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে হবে। এ জন্য তাদের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বানসংবলিত চিঠি পাঠানো হবে। মুক্তিযোদ্ধা বশির আহমেদ মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে দায়িত্ব নিলেন এই দুরূহ কাজের। রওনা হলেন পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প অভিমুখে। সময় গড়াতে লাগল, কিন্তু তিনি ফিরে এলেন না। এরপর সেখানে আরেকজনের যাওয়ার পালা এল। এবার দায়িত্ব নিলেন আনিসুল হক আকন্দ। সহযোদ্ধারা তাঁকে সঞ্জু নামে চিনতেন।

সঞ্জুও ফিরে এলেন না। সহযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সবাই ভাবলেন, হয় পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে, না হয় মাইন বিস্ফোরণে মারা গেছেন তাঁরা দুজনই। এমন সময় সবাই সঞ্জুকে ফিরে আসতে দেখলেন। তিনি প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে এলেন। এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণে রাজি হয়েছে আর বশির আহমদ পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে আছেন। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রথম আত্মসমর্পণ করে কামালপুরে।

আনিসুল হক আকন্দ ১৯৭১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। পরে প্রশিক্ষণ নিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে যোগ দেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী গণযোদ্ধা। বেশ কটি সম্মুখযুদ্ধেও অংশ নেন। এর মধ্যে ৩১ জুলাইয়ের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বরের গেজেটে বীর প্রতীকের তালিকায় ৩৯২ নম্বরে লেখা আছে মো. আনিসুর রহমান (সঞ্জু) এবং ৩৯৮ নম্বরে লেখা আছে আনিসুল হক আকন্দ। মো. আনিসুর রহমান (সঞ্জু) নামের কেউ বীর প্রতীক খেতাব দাবি করেননি। এ দুই নাম সম্ভবত একই ব্যক্তির।

WWW.AMARBOI.COM

আবদুর রউফ মজুমদার, বীর প্রতীক

গ্রাম জঙ্গলঘোনা, ইউনিয়ন চিথলিয়া, পরশুরাম, ফেনী। বাবা আনু মিয়া মজুমদার, স্ত্রী শামসুন নাহার। তাঁদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৮৫। মৃত্যু ৫ নভেম্বর ১৯৯৫।

১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ ভোরে আবদুর রউফ মজুমদারের নেতৃত্বে একদল ইপিআর সেনাসদস্য পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রাভিযান রোধ করতে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট এলাকায় অবস্থান নেন। সকাল আটটায় তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর মুখোমুখি হন। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। লড়াই চলে টানা তিন ঘণ্টা। এ যুদ্ধে তাঁরা সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রাভিযান রোধ করা সম্ভব হয়নি। সেদিনের যুদ্ধে ইপিআরের চারজন শহীদ এবং আবদুর রউফ মজুমদারসহ দুজন আহত হন। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে ফেনীতে নিয়ে যান। ফেনী তখন মুক্ত ছিল। পরে তিনি ভারতে উন্নত চিকিৎসা নেন।

ইপিআর বাহিনীর নায়েক সুবেদার আবদুর রউফ মজুমদার ১৯৭১ সালে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় সীমান্ত এলাকায় কর্মরত ছিলেন। চট্টগ্রাম ইপিআর হেডকোয়ার্টারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিকের (রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, পরে মেজর) বার্তা পেয়ে তিনি এক প্লাটুনের বেশি ইপিআর সেনা নিয়ে ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম শহরের ওয়াপদা গেস্ট হাউসে অবস্থানরত ইপিআর সেনাদের সঙ্গে মিলিত হন। পরে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন।

সুস্থ হওয়ার পর আবদুর রউফ আবার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি পরে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকায়। বিলোনিয়া, মুন্সিরহাট, ফুলগাজীসহ কয়েকটি জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেন।

১৯৭৮ সালে তিনি বিডিআরের চাকরি থেকে অবসর নেন।

আবদুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম চিওটা, সদর, বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম কড়িয়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট। বাবা আজিমউদ্দীন হাওলাদার, মা জমিলা খাতুন। স্ত্রী [illegible] বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২০৫।

খুব ভোরে শীতের কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে চলেছেন আবদুর রহমানসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে ফাঁদ (অ্যামবুশ) পাতলেন হিজলীতে। সকাল গড়ালে পাকিস্তানি সেনারা এদিকে টহল দিতে আসবে। তখন তাঁরা অতর্কিতে আক্রমণ করবেন। গণবাহিনী ও ইপিআর মিলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ৪২। চারটি দলে বিভক্ত তাঁরা। একটি উপদলের নেতৃত্বে আবদুর রহমান। তিনি ইপিআরের সদস্য।

এদিকে বেলা বাড়তে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করতে থাকেন। সকাল নয়টার দিকে সেখানে হাজির হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি প্যাট্রোল পার্টি। গুলির আওতায় তারা আসামাত্র গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন পাকিস্তানি সেনা লুটিয়ে পড়ে। বাকি সেনারা দ্রুত পজিশন নিয়ে শুরু করে পাল্টা আক্রমণ। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের বেশির ভাগই হতাহত হয়। এ সময় গোলাগুলির শব্দ পেয়ে পার্শ্ববর্তী ঘাঁটি থেকে দ্রুত হাজির হয় নতুন আরেক দল পাকিস্তানি সেনা। সংখ্যায় তারা অনেক। ঘটনাস্থলে এসেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ বিপদেই পড়েন। তবে আবদুর রহমান মনোবল ও সাহস হারাননি। তিনি অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁর অসাধারণ রণনৈপুণ্যে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রাভিযান থেমে যায়। ফলে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৩ নভেম্বরের।

হিজলী যশোরের চৌগাছা উপজেলার অন্তর্গত। জেলা সদর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এর অবস্থান। সেখানে বিওপিতে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধির ওপর নজরদারি করত। টহল দল নিয়মিত টহল দিত। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায়ই পাকিস্তানি টহল দলের ওপর আক্রমণ চালাতেন। চৌগাছা ছিল মুক্তিবাহিনীর ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরের অধীন এলাকা। সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন দল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘেরাও করে। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ চলে। পরে খবর পেয়ে বয়রা সাব-সেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল) অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করে। এরপর পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে ১৮-১৯ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর একজন আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামবাসীর সহায়তায় নিহত পাকিস্তানি সেনাদের লাশ ভারতে নিয়ে যান।

আবদুর রহমান ১৯৭১ সালে যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে সীমান্ত এলাকায় কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। পরে ভারতে পুনর্গঠিত হওয়ার পর বয়রা সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন। চৌগাছা, হাজীপুর, সাদিপুরসহ কয়েকটি জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

আবদুর রাজ্জাক, বীর প্রতীক

গ্রাম ছয়ানী টবগা, চাটখিল, নোয়াখালী। বাবা জবেদউল্লা ভূঁইয়া, মা রোকেয়া বানু। স্ত্রী রোকেয়া বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৯। মৃত্যু ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।

AMARBOI.COM

টেংরাটিলা সিলেট জেলার অন্তর্গত। পার্শ্ববর্তী ছাতকে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। সুরমা নদীর তীরে ছাতক সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১২ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী (পরে জেনারেল) নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ছাতক আক্রমণের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে প্রয়োজনীয় রেকি ও পরিকল্পনা ছাড়াই তাঁরা ছাতক আক্রমণ করেন। মূল আক্রমণকারী দল হিসেবে থাকে আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি। আক্রমণের সময় দোয়ারাবাজার হয়ে ওয়াপদার বেড়িবাঁধ ধরে যাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোনো রি-এনফোর্সমেন্ট না আসতে পারে, সে জন্য টেংরাটিলায় অবস্থান নিয়ে চার্লি কোম্পানিকে কাট অফ পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। এ কোম্পানিতে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। তাঁরা ১৩ অক্টোবর রাতে সীমান্তের ওপারের বাঁশতলা ক্যাম্প থেকে রওনা হন। বাঁশতলা ক্যাম্প ছিল মুক্তিবাহিনীর ৫ নম্বর সেক্টরের শেলা সাব-সেক্টরের অধীন। ওই সাব-সেক্টরের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সেদিন সকাল পর্যন্ত টেংরাটিলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে কিছু পথ হেঁটে যান। তারপর নৌকায় করে ভোরে টেংরাটিলায় যাওয়ামাত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে পড়েন। পাকিস্তানি সেনারা সব কটি নৌকা লক্ষ্য করে একযোগে গুলি চালাতে থাকে। এমন পরিস্থিতির জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত ছিলেন না। চারদিকে গভীর পানি। তাঁদের বেশির ভাগ নৌকা ডুবে যায়। অনেক মুক্তিযোদ্ধা সাঁতার জানতেন না। তখন যুদ্ধের বদলে প্রাণ বাঁচানোই তাঁদের জন্য মুখ্য হয়ে পড়ে। অস্ত্র ফেলে অনেকে সাঁতরে নিরাপদ স্থানের দিকে যেতে থাকেন। চরম প্রতিকূলতার মধ্যে আবদুর রাজ্জাকসহ কয়েকজন ভয় না পেয়ে পানির মধ্যে থেকেই পাল্টা গুলি চালিয়ে যান। এ সুযোগে অনেক মুক্তিযোদ্ধা নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সক্ষম হন। সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও ২৫-২৬ জন আহত হন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৪ অক্টোবর সকালের।

আবদুর রাজ্জাক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করতেন। ১৯৭১-এ এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রাথমিক প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান এবং পরে জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

আবদুল আউয়াল, বীর প্রতীক

গ্রাম মান্দারপুর, ইউনিয়ন বাদৈর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা মুন্সি [illegible]র আলী, মা শাহেদা খাতুন।
স্ত্রী [illegible] বেগম। তাঁদের ছয় ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯৬। মৃত্যু ১ জুন ২০০৮।

আবদুল আউয়াল গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টরের গোপীনাথপুর, উজানিসার, চরনাল গ্রাম, কসবার ডাকবাংলো, দ্বিতীয় চারগাছ গ্রাম, তৃতীয় চারগাছ গ্রাম, চতুর্থ চারগাছ ও নিবরা গ্রাম, নবীনগরের দৌলতপুর গ্রাম, মুরাদনগরের চাপিতলা এবং কসবার শিমরাইলের পূর্ব বিলে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল) নির্দেশে আবদুল আউয়াল এক দিন তাঁর দলবল নিয়ে অবস্থান নেন গোপীনাথপুর গ্রামের একটা উঁচু টিলায়। সেদিন পাকিস্তানি বাহিনীর একটি কোম্পানি রেললাইনের দুই পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে ফায়ার করতে করতে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের দুটি প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশের ভেতর পড়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা একটা মেশিনগান, ছয়টা এলএমজি ও কিছু রাইফেল দিয়ে একসঙ্গে ফায়ার করতে থাকেন। সেদিন পাকিস্তানি বাহিনীর বেশ কজন সেনা নিহত এবং কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়।

ওই অপারেশনের কয়েক দিন পর পাকিস্তানি বাহিনী উজানিসার সেতুর পশ্চিম পাশে অবস্থান নেয়। আবদুল আউয়ালের দল রাত ঠিক আটটায় তাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। অবশ্য সেদিন মুক্তিবাহিনীরও ছয়জন সদস্য শহীদ হন এবং আহত হন আরও কয়েকজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল আউয়াল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ দুই মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। পরে ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

আবদুল আউয়াল ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সুবেদার পদ থেকে অবসর নেন।

আবদুল ওয়াহিদ, বীর প্রতীক

গ্রাম বড়ইকান্দি, সদর, সিলেট। বাবা আবদুর রহমান, মা রইছা খাতুন। স্ত্রী রেজিয়া বেগম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২১৬। মারা গেছেন, মৃত্যুর সাল জানা যায়নি।

ধলই বিওপি দখলের যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের সহযোদ্ধা ছিলেন আবদুল ওয়াহিদসহ কয়েকজন। একপর্যায়ে তাঁরা এগোতে পারেন, পাকিস্তানি সেনাদের গুলির আওতায় পড়ে গেছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি তাঁরা। তখন হামিদুর রহমান তাঁদের বলেন, 'আমি খান সেনাদের (পাকিস্তানি সেনা) মোকাবিলা করছি, তোমরা যে যেভাবে পারো, নিরাপদ স্থানে সরে যাও।' আবদুল ওয়াহিদ হামিদুর রহমানকে একা রেখে যেতে রাজি ছিলেন না। তিনি হামিদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়েই নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হামিদুর রহমান তাঁর কথা শোনেননি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটি যুদ্ধ আমাদের বিজয়ের পটভূমি তৈরি করে। এর মধ্যে ধলই বিওপি দখলের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের ২৭ অক্টোবর শেষ রাত থেকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ধলই বিওপি দখলের জন্য যুদ্ধ শুরু করে। পাঁচ দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ধলই বিওপি মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ধলই মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার অন্তর্গত। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী একটি ঘাঁটি। দুই কোম্পানি ৩০ এফএফ, রাজাকার ও টসি ব্যাটালিয়নের দুই কোম্পানি। সব মিলিয়ে প্রায় এক ব্যাটালিয়ন শক্তি।

২৭ অক্টোবর সন্ধ্যার পরপরই মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল সীমান্তের ওপার থেকে আক্রমণস্থলে রওনা হয়। শেষ রাতে আক্রমণ শুরু করার মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর একটি দলকে পাকিস্তানি সেনারা আগে আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে এতে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হন। উঁচু টিলার ওপর ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি এলএমজি পোস্ট। সেখান থেকে নিখুঁত নিশানায় গুলিবর্ষণ হচ্ছিল। এতে মুক্তিবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ওই এলএমজি পোস্ট ধ্বংসের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তখন সেটা ধ্বংসের দায়িত্ব পড়ে লেফটেন্যান্ট কাইয়ুমের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর দলের ওপর। এই দলে ছিলেন হামিদুর রহমান, আবদুল ওয়াহিদসহ কয়েকজন। তাঁরা যান ওই এলএমজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোস্ট ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু তাঁরাও প্রচণ্ড গুলির মুখে পড়েন। তখন তাঁদেরও অগ্রযাত্রা থেমে যায়। একপর্যায়ে হামিদুর রহমান একাই সেদিকে এগিয়ে যান আর তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা কাভারিং ফায়ার করতে থাকেন। হামিদুর রহমান ওই এলএমজি পোস্ট ধ্বংস করতে সক্ষম হলেও শহীদ হন তিনি।

আবদুল ওয়াহিদ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিলেট হেডকোয়ার্টারের অধীনে তেলিয়াপাড়া সীমান্তে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যোগ দেন যুদ্ধে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ৩ নম্বর সেক্টরের মনতলা সাব-সেক্টরে এবং পরে জেড ব্রিগেডের অধীনে যুদ্ধ করেন।

আবদুল ওহাব, বীর প্রতীক

গ্রাম শ্রীমন্তপুর, ইউনিয়ন বাকশীমূল, বুড়িচং, কুমিল্লা।
বাবা হায়দার আলী, মা চান বানু। স্ত্রী রৌশন আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৮।

WWW.AMARBOI.COM

হবিগঞ্জের মাধবপুর থানার অন্তর্গত একটি এলাকা হরষপুর। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তেলিয়াপাড়া দখল করার পর পার্শ্ববর্তী মনতলা কমপ্লেক্স মুক্তিবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়। কমপ্লেক্সের উত্তরে মনতলা রেলস্টেশন। হরষপুর রেলস্টেশনটি এর দক্ষিণে। পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত। তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এরপর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তিনটি কোম্পানি মনতলায় বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়। লেফটেন্যান্ট হেলাল মোরশেদ খানের (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল) নেতৃত্বে একটি কোম্পানি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান নিয়েছিল হরষপুরে। মুক্তিবাহিনীর এই দলে ছিলেন আবদুল ওহাব। ১৫ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মনতলা এলাকায় আক্রমণ শুরু করে। পাঁচ দিন একটানা সেখানে যুদ্ধ চলে।

২০ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল মুক্তিবাহিনীর একেবারে সামনে এসে অবস্থান নেয়। হেলিকপ্টারের সাহায্যে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান নির্ণয় করে। এরপর মুকুন্দপুর, অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বড় দল আবদুল ওহাবদের অবস্থান লক্ষ্য করে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। একই সঙ্গে চান্দুরার দিক থেকেও পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারের সাহায্যে আবদুল ওহাবদের অবস্থানের পেছনে ছত্রীসেনা নামায়। তখন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ভীত না হয়ে আবদুল ওহাব ও তাঁর সহযোদ্ধারা লেফটেন্যান্ট হেলাল মোরশেদ খানের নেতৃত্বে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। পরে মেজর সফিউল্লাহর (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম প্রধান) নির্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিবাহিনীর অপর একটি দল পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং পিছু হটে। ওহাবের সহযোদ্ধা দৌলা মিয়া ছিলেন তাঁদের এলএমজি ম্যান। সেদিন তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে তাঁর এলএমজি দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রাখেন। একপর্যায়ে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁর সঙ্গে থাকা সহযোদ্ধারা মৃত ভেবে তাঁকে সেখানে রেখেই চলে যান। পরে ওহাবসহ কয়েকজন তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

আবদুল ওহাব পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে নায়েক (বর্তমানে করপোরাল) পদে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। পরে পুনঃসংগঠিত হয়ে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরের অধীন নরসিংদী এলাকা ও কলকলিয়া সাব-সেক্টরে। গেরিলাযুদ্ধের পাশাপাশি সরাসরি যুদ্ধেও তিনি অংশ নেন। নরসিংদীর বেলাবতে একটি গেরিলা অপারেশনে তিনি যথেষ্ট রণনৈপুণ্য দেখান।

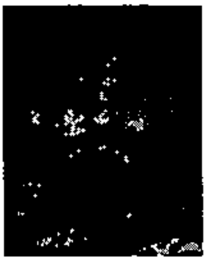

আবদুল খালেক বীর প্রতীক

গ্রাম পূর্ব বাতাবাড়িয়া, ইউনিয়ন খিলা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা। বাবা আমিনউদ্দিন ভূঁইয়া, মা নূরজাহান বিবি। স্ত্রী আছিয়া খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩২। মৃত্যু ১৯৯৭।

সালদা নদীর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের খুব কাছাকাছিই ছিল মুক্তিবাহিনীর গোপন অগ্রবর্তী স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোল পার্টি। এ দলের সদস্য ছিলেন আবদুল খালেক। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৎপরতা লক্ষ করতেন। মাঝেমধ্যে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আবার চলে যেতেন তাঁদের গোপন অবস্থানে। ১৯৭১ সালের আগস্টের শেষ থেকে এভাবে তাঁরা বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন চালান। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় তাঁদের সন্ধান পেয়ে যায়। ২৫ সেপ্টেম্বর একদল পাকিস্তানি সেনা তিন দিক থেকে তাঁদের আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। শুরু হয় যুদ্ধ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার অন্তর্গত সালদা নদী। সীমান্তবর্তী এলাকা। ঢাকা থেকে সালদা রেলস্টেশন দিয়ে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল যোগাযোগ। এ কারণে ১৯৭১ সালে সালদা নদী ও সালদা রেলস্টেশন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান। মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের সালদা নদী সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করতেন। সেখানে যুদ্ধ ছিল তখন নিয়মিত ঘটনা। সেদিন সামগ্রিক পরিস্থিতি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে ছিল না। তার পরও তাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে থাকেন। আবদুল খালেক ও তাঁর সহযোদ্ধারা সীমিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়েই পাকিস্তানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করেন। হঠাৎ গুলি এসে লাগে তাঁর মাথা ও বুকে। কয়েকটি শেলের টুকরাও লাগে তাঁর গায়ে। কাছাকাছি থাকা এক সহযোদ্ধা তাঁকে নিয়ে যান পেছনে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ভর্তি করা হয় আগরতলার এক হাসপাতালে। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় লক্ষ্ণৌর হাসপাতালে। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

১৯৭১-এ আবদুল খালেক পাকিস্তান ইউনাইটেড ব্যাংকের চট্টগ্রাম শাখায় নিরাপত্তা প্রহরী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুদ্ধ করেন কসবা, মন্দভাগ, কইখোলা, নয়নপুরসহ আরও কয়েকটি জায়গায়।

স্বাধীনতার পর কয়েক মাস পরিবারের লোকজন আবদুল খালেকের সন্ধান পাননি। বাড়ির লোকজন ধরে নিয়েছিলেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। চিকিৎসাশেষে স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ মাস পর বাড়ি ফেরেন তিনি। তারপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। চিকিৎসা নেওয়ার পরও শরীরে থাকা শেলের টুকরা ও গুলির কারণে তাঁর শারীরিক সমস্যা থেকেই যায়। চিকিৎসা করেও লাভ হয়নি। পরে দুটি পা-ই হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়।

AMARBOI.COM

আবদুল গফুর, বীর প্রতীক

গ্রাম রাজপাট (পশ্চিমপাড়া), কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
বাবা হাতেম মোল্লা, মা সাজু খাতুন। স্ত্রী মমতাজ বেগম।
তাঁদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৮৮।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সিলেটের চারগ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আবদুল গফুর এ যুদ্ধে অংশ নেন। নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রাভো কোম্পানি আটগ্রাম-চারঘাট-সিলেট অক্ষ ধরে চূড়ান্ত অভিযান শুরু করলে সেদিন চারগ্রামে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ব্রাভো কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা একপর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলি উপেক্ষা করে সেখানকার ঘাঁটির ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং ২০ জন পাকিস্তানি সেনাকে তাঁরা বন্দী করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর বাকি সেনারা পালিয়ে যায়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পাঁচজন আহত হন। আটগ্রাম যুদ্ধে আবদুল গফুর অসীম সাহস দেখান।

আবদুল গফুর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে হাবিলদার পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এই রেজিমেন্টকে পাকিস্তানের শিয়ালকোটে বদলি করা হয়। সে কারণে তাঁদের বেশির ভাগ ছুটিতে এবং বাকিরা যশোরের চৌগাছায় শীতকালীন প্রশিক্ষণে ছিলেন। আবদুল গফুরও তখন প্রশিক্ষণরত। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রশিক্ষণরত সেনাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনানিবাসে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৯ মার্চ গভীর রাতে তাঁরা সেনানিবাসে ফিরে আসেন। পরদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ বালুচ রেজিমেন্ট ও ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তাঁদের আক্রমণ করে। তখন তাঁরা প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর তাঁরা সেনানিবাস থেকে বের হয়ে চৌগাছায় একত্র হন এবং ক্যাপ্টেন হাফিজের (হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম, পরে মেজর) নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। পরে তাঁরা ভারতে যান।

ভারতে পুনর্গঠিত হওয়ার পর আবদুল গফুর প্রথম যুদ্ধ করেন জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার কামালপুরে। ৩০-৩১ জুলাইয়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর তাঁরা সিলেট এলাকায় চলে আসেন। তিনি সিলেট এলাকায় প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রাভো কোম্পানির অধীনে আটগ্রাম, কানাইঘাট, এমসি কলেজসহ কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সম্মুখযুদ্ধে আবদুল গফুর যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন।

আবদুল গফুর ১৯৮১ সালে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেন।

আবদুল গফুর, বীর প্রতীক

গ্রাম ছয়ানী টগবা (জামটার সরদারবাড়ি), নোয়াখালী।
বাবা বশির উল্লাহ সরদার, মা বদরের নেছা।
স্ত্রী সাফিয়া খাতুন। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২১০। গেজেটে নাম আবদুল গাফফার। শহীদ ৮ আগস্ট ১৯৭১।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে ধোপাখালী বিওপি দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। মুক্তিবাহিনীর একটি দল ৮ আগস্ট এখানে আক্রমণ করে। এ দলে ছিলেন আবদুল গফুর। গফুরসহ এখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগই ইপিআর সদস্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেদিন দুপুরের পর ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমানের (বীর বিক্রম, পরে জেনারেল ও সেনাপ্রধান) নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প থেকে রওনা হন। সন্ধ্যার আগে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে আক্রমণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই আক্রমণের সংবাদ পাকিস্তানি সেনারা তাদের বাঙালি দোসরদের মাধ্যমে আগেই পেয়ে যায়। তারা সুরক্ষিত বাংকারে অবস্থান নিয়ে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে অনবরত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মাথা তোলাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার হাতে অস্ত্র বলতে পুরোনো থ্রি নট থ্রি রাইফেল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দেওয়া এসএলআর ও স্টেনগান। মাত্র কয়েকজনের কাছে উন্নত অস্ত্র। তাঁরা চরম প্রতিকূলতার মধ্যেই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। কয়েকজন এ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখান। আবদুল গফুর গুলি করতে করতে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছাকাছি চলে যান। তাঁর সামনেই শহীদ হন দুই সহযোদ্ধা। এতে তিনি দমে যাননি। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। হঠাৎ গুলি এসে লাগে আবদুল গফুরের বুকে। তিনি শহীদ হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোপাখালী ছিল মুক্তিবাহিনীর ৮ নম্বর সেক্টরের বানপুর সাব-সেক্টরের অধীন এলাকা। এখানকার পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের কারণে মুক্তিবাহিনীর গণযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভেতরে গেরিলা কার্যক্রম চালাতে পারছিলেন না। ফলে ওই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাদের সেখান থেকে বিতাড়ন বা তাদের পরিধি সীমিত করার জন্য পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনী। সেদিন যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আবদুল গফুর, রশিদ আলী (বীর প্রতীক, সিলেট), আবু বাকের (যশোর), সিদ্দিক আলী ও আবদুল আজিজ (বৃহত্তর ঢাকা) শহীদ হন এবং চারজন গুরুতর আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা আবদুল গফুর, রশিদ আলীসহ চারজনের মরদেহ যুদ্ধস্থল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। পরে বাংলাদেশের মাটিতে ধোপাখালীর পার্শ্ববর্তী জীবননগরে তাঁদের সমাহিত করা হয়।

আবদুল গফুর ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরের অধীন ৪ নম্বর উইংয়ে। তাঁর দলের সঙ্গে তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে তাঁদের পুনঃসংগঠিত করা হয়। এরপর তাঁরা বানপুর সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

আবদুল জব্বার খান, বীর প্রতীক

গ্রাম আনাখণ্ড (চকদারবাড়ি), নড়িয়া, শরীয়তপুর।
বর্তমান ঠিকানা বিডিআর জয়েন্ট কোয়ার্টার, ব্লক-এফ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। বাবা ওয়াছিউদ্দীন খান, মা কিরণ নেছা।
স্ত্রী [illegible] নেছা। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭১। মৃত্যু ১৯৯৮।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবদুল জব্বার খান ও তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে বারবার ঝটিকা আক্রমণ চালায়। তাঁরা সেই আক্রমণ প্রতিবারই প্রতিহত করেন। যুদ্ধ চলতে থাকে। পরদিন শুরু হয় তাঁদের ওপর বিমান থেকে আক্রমণ। এই আক্রমণেও তাঁরা বিচলিত হলেন না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের নভেম্বরের প্রথমার্ধের। ঘটেছিল বিলোনিয়ায়।

ফেনী জেলার অন্তর্গত বিলোনিয়া। প্রায় ২৬ কিলোমিটার লম্বা ও ১০ কিলোমিটার প্রশস্ত এই এলাকার একদিকে ভারতের ভূখণ্ড। উপদ্বীপের মতো দেখতে এই এলাকা লম্বালম্বি ভারতের ভেতরে প্রবেশ করেছে। মুহুরী নদী বিলোনিয়ার ভেতর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। ১৯৭১ সালে বিলোনিয়া এলাকায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ। সেখানে নিয়োজিত ছিল তাদের ১৫ বালুচ রেজিমেন্টের পূর্ণাঙ্গ ব্যাটালিয়ন। আরও ছিল ইপিসিএএফ, পাকিস্তানি পুলিশ ও স্থানীয় রাজাকার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিলোনিয়া এলাকা ২২ জুন পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল। এরপর ওই এলাকা পাকিস্তানি সেনাদের দখলে চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিলোনিয়া মুক্ত করার জন্য মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল বিলোনিয়ার তিন দিকে অবস্থান নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণের নির্ধারিত তারিখ ছিল ২ নভেম্বর। ৩১ অক্টোবর থেকে সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। এর মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা বিলোনিয়ার তিন দিকে অবস্থান নেন। বৃষ্টির জন্য আক্রমণের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি সেনারা ৩ নভেম্বর ভোর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পায়নি। পরে উপস্থিতি টের পেয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর একযোগে আক্রমণ শুরু করে। আবদুল জব্বার খান ও তাঁর দল ছিল সালিয়ায়। তিনি ছিলেন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানিতে। বিলোনিয়া আক্রমণে ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কে ফোর্সের অধীন দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ এস ফোর্সের দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একাংশ এবং ১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারাও অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধারা বিলোনিয়ার উত্তরাংশে চন্দনা, সালিয়া ও গুতুমা পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, আবদুল জব্বার খান ও তাঁর দল (দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানি) মুহুরী নদীর পূর্ব তীরে ধনীকুণ্ড এলাকা দিয়ে বিলোনিয়ায় প্রবেশ করে পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে। মূল আক্রমণকারী দলের বাঁ দিক সুরক্ষিত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু হওয়ার পর হতভম্ব পাকিস্তানি সেনারা পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সবদিকেই মুক্তিযোদ্ধারা থাকায় তাদের ওই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফাঁদে আটকে পড়া পাকিস্তানি সেনাদের উদ্ধারে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর চারটি এফ-৮৬ স্যাবর জঙ্গিবিমান মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ চালায়। আবদুল জব্বার খানসহ মুক্তিযোদ্ধারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সাহস ও বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের ভারী মেশিনগান পাকিস্তানি বিমান হামলায় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। শহীদ ও আহত হন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। আবদুল জব্বার খান নিজেও সেদিন গুলিতে আহত হন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৭ নভেম্বর বিলোনিয়া মুক্ত হয়।

আবদুল জব্বার খান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টর, পরে এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। মাধবপুর, মুকুন্দপুরসহ বিলোনিয়ার যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

AMARBOI.COM

আবদুল জব্বার মিজি, বীর প্রতীক

গ্রাম কামরাঙ্গা, ইউনিয়ন রামপুর, সদর, চাঁদপুর। বাবা ইসমাইল হোসেন মিজি, মা শহর বানু। স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৪০। গেজেটে নাম আবদুল জব্বার।

আবদুল জব্বার মিজি ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রাজশাহী সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে নওগাঁ উইংয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। জয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিরোধযুদ্ধ করেন তিনি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জয়পুরহাট দখল করলে তিনি তাঁর দলের সঙ্গে ভারতে চলে যান। সেখানে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৩১ জুলাই জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণে তিনি অংশ নেন। তিনি ছিলেন আলফা কোম্পানিতে। তাঁর প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন সুবেদার হাফিজ। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আবদুল জব্বার পরবর্তী সময়ে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী, কোদালকাটি এবং বৃহত্তর সিলেটের ছাতক, গোয়াইনঘাট, গোবিন্দগঞ্জসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন।

১৯৭১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি ছাতকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আবদুল জব্বার মিজি অংশ নেন এবং তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ও সংলগ্ন শহর এলাকায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি। তাদের সহযোগী হিসেবে আরও ছিল দুই কোম্পানি ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স ও রাজাকার। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গলের আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ পর পর তারা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর একের পর এক হামলা চালিয়ে যায়। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনীর আরআর গোলায় পাকিস্তানি সেনাদের বেশির ভাগ বাংকার ধ্বংস হয়।

যুদ্ধ শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু পাকিস্তানি সেনাদের লাশ। ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় জীবিত পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়। সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে আসে। এ সময় সিলেট থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন দল এসে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘেরাও করে। তাঁরা বিরাট ঝুঁকিতে পড়েন। এ অবস্থায় ক্যাপ্টেন আনোয়ার তাঁদের পিছিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা পাহাড়ি চোরাপথে কোথাও হাঁটুপানি, কোথাও গলাপানি অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্তে চলে যান। এভাবে পাঁচ দিনের ছাতক অপারেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ অপারেশনে দুই পক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে পাকিস্তানি সেনাদের ক্ষতির পরিমাণই ছিল বেশি। এই আক্রমণের খবর বিবিসিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়।

AMARBOI.COM

আবদুল জলিল, বীর প্রতীক

গ্রাম পাল্লা, ঝিকরগাছা, যশোর। বাবা মোহর আলী মোড়ল, মা ইয়ার বানু। স্ত্রী হালিমা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৫৬।

যশোর জেলা সদরের পশ্চিমে ঝিকরগাছা উপজেলা। ১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষ দিক। সন্ধ্যা। চারদিকে হালকা কুয়াশা। খালি চোখে দূরের কিছুই দেখা যায় না। অতি সন্তর্পণে মুক্তিবাহিনীর একটি দল এগিয়ে যাচ্ছে। দলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণবাহিনীর ১৫ জন ও ইপিআরের কয়েকজন। তাঁরা দোসহাতিনায় (স্থানীয় কেউ কেউ বলেন দশাতিনা) এসে অবস্থান নেন। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট অলিক কুমারগুপ্ত। সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন ইপিআরের আবদুল জলিল।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান লক্ষ্য করে একযোগে গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের সব অস্ত্র। পাকিস্তানি বাহিনী প্রথম দিকে পাল্টা আক্রমণের তেমন সুযোগ পেল না। তাদের দিক থেকে কেবল শোনা গেল চিৎকার আর আর্তনাদ। বিপর্যস্ত হয়ে গেল শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থান। অবশ্য নিজেদের সামলে নিয়ে খানিকক্ষণ পর তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

এবার দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। আবদুল জলিল ও অন্য মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ১০ জন সেনা নিহত হয়। তাদের পাঁচটি চায়নিজ রাইফেল, কয়েকটি হেলমেট ও কিছু খাদ্যসামগ্রী মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। যুদ্ধে অবশ্য একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন।

মুক্তিযোদ্ধা আবদুল জলিল ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরের অধীন ঝিকরগাছা ও শার্শা এলাকায় যুদ্ধ করেন। বেশির ভাগ সময় তিনি ঝিকরগাছায় অবস্থান করতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত যুদ্ধ হয়। মে মাসের দিকে পাকিস্তানি সেনারা ঝিকরগাছা উপজেলার আজমপুর, বোদখানা, দোসহাতিনা ও গঙ্গাধরপুর গ্রামে বিভিন্ন দিন আক্রমণ চালায়। আবদুল জলিল ইপিআর সেনাদের সঙ্গে নিয়ে তখন পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি সেনারা জানতে পারে, এসব আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইপিআরের আবদুল জলিল। তখন তারা লোকজনের সামনে বলে, 'জলিল জিন নাহি হ্যায়, রকেট হ্যায়।' সেই থেকে আবদুল জলিল হয়ে যান 'রকেট জলিল'।

AMARBOI.COM

আবদুল জলিল একবার ঝিকরগাছার সিংড়ি ইউনিয়নের মধুখালী গ্রামে রাস্তায় মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত্রুপক্ষের কয়েকজনকে হতাহত করেন। এক দিন বেনেয়ালী এলাকা থেকে এক বিদেশি নারী যাজককে পাকিস্তানি তিন সেনা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে আবদুল জলিল সহযোদ্ধা হাজারী লাল তরফদারকে (তিনিও বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছেন) সঙ্গে নিয়ে তাদের আক্রমণ করেন এবং নারী যাজককে উদ্ধার করেন। দুজন পাকিস্তানি সেনা তাঁদের হাতে নিহত হয়। একজনকে তাঁরা জীবিত আটক করেন।

আবদুল জলিল ১৯৭১ সালে ইপিআরের ৭ নম্বর উইংয়ের অধীনে জয়পুরহাটের পাঁচবিবি সীমান্ত বিওপিতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে নিজ এলাকা যশোরের ঝিকরগাছায় চলে আসেন। পরে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। এরপর তিনি ভারতে চলে যান প্রশিক্ষণ নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল জলিল শিকদার, বীর প্রতীক

গ্রাম চাচই, লোহাগড়া, নড়াইল। বর্তমান ঠিকানা চানমারী, রূপসা, খুলনা। বাবা আবদুল হক শিকদার, মা পুটি বেগম। স্ত্রী নূরজাহান বেগম। তাঁদের সাত ছেলেমেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭১। মৃত্যু ২০০৬।

১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল। আবদুল জলিল শিকদার খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বড় একটি দল সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে রাস্তার দুই পাশের বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে আসছে। তিনি একদল মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন ঝিকরগাছার লাউজানিতে। খবর পেয়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে তাঁর দলের দুই প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধাকে সামনের দিকে পাঠালেন। যশোর-বেনাপোল সড়ক ধরে তাঁরা কিছুদূর অগ্রসর হতেই পড়ে গেলেন পাকিস্তানি সেনাদের সামনে। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণ করল। প্রবল আক্রমণে তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা হাজির হলো আবদুল জলিল শিকদারের প্রতিরক্ষা অবস্থানের সামনে। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দলটি অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সে তুলনায় তাঁদের অস্ত্র খুবই কম। তার পরও তাঁরা প্রতিরোধ চালিয়ে গেলেন। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা আর্টিলারির সাহায্যে তাঁদের আক্রমণ করল। এতে শহীদ হলেন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। ফলে তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থান ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে আবদুল জলিল শিকদার পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঝিকরগাছা যশোরের অন্তর্গত একটি উপজেলা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ৩০ মার্চ থেকে যশোরে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীন বেশির ভাগ বাঙালি ইপিআর সদস্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হেডকোয়ার্টারের অধীন খুলনার ৫ নম্বর উইংয়ের তিন কোম্পানি ইপিআর সদস্যও যশোরে সমবেত হয়ে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর (পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) নির্দেশে ৫ নম্বর উইংয়ের তিন কোম্পানি ইপিআর সদস্যের একাংশ যশোর শহরে এবং অপর অংশ ঝিকরগাছায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। দুই দলের সার্বিক নেতৃত্বে থাকেন (সুবেদার) আবদুল জলিল শিকদার। তাঁর নির্দেশে সুবেদার হাসান উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন 'সি' কোম্পানি যশোর সেনানিবাসে মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণে পিছু হটে নড়াইলের দিকে চলে যান। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের এক দল আরেক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঝিকরগাছার পতন হলে সেখানকার মুক্তিযোদ্ধারা ভারত সীমান্তসংলগ্ন বেনাপোলে আশ্রয় নেন। কয়েক দিন পর বেনাপোলও পাকিস্তানি সেনাদের দখলে চলে যায়। তখন মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে অবস্থান নেন।

আবদুল জলিল শিকদার ভারতে অবস্থানকালে কিছুদিন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। বিহারের চাকুলিয়ায় প্রথম ব্যাচের মুক্তিযোদ্ধাদের ২৪ দিন প্রশিক্ষণ দেন। এরপর ৯ নম্বর সেক্টরের অধীন হিঙ্গলগঞ্জ সাব-সেক্টরে প্রশিক্ষক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের ভেতরে গেরিলা অপারেশনে পাঠানো, তাঁদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কাজ তিনিই করতেন।

১৯৭১ সালে আবদুল জলিল শিকদার যশোর ইপিআর সেক্টরের ৫ নম্বর উইংয়ের 'এ' কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন। পদবি ছিল সুবেদার। কোম্পানির অবস্থান ছিল সাতক্ষীরার কলারোয়ায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সেখান থেকে যশোরে এসে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন।

আবদুল নূর, বীর প্রতীক

গ্রাম বাহাদুরপুর, ইউনিয়ন লক্ষ্মণশ্রী, সদর, সুনামগঞ্জ। বাবা আশ্রম আলী, মা কনাই বিবি। বিবাহিত। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১২। শহীদ ২২ নভেম্বর ১৯৭১।

আবদুল নূর সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর তিনি পালিয়ে ভারতে যান। ২ নম্বর সেক্টরে এসে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধ করেন গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টর এলাকায়।

চন্দ্রপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার অন্তর্গত। কসবা রেলস্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে। ১৯৭১ সালে সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। ২২ নভেম্বর সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৮ নভেম্বর মিত্রবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুক্তিবাহিনীর গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টরের অধিনায়ক আইন উদ্দিনকে (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল) সেখানে আক্রমণের নির্দেশ দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনী ভেতর থেকে এবং ভারতীয় সেনারা সীমান্তের দিক থেকে চন্দ্রপুরের পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনীর দলে আবদুল নূরও ছিলেন। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চেয়ে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যোদ্ধারাই শহীদ হন বেশি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার শিখ মেজর, তিনজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ প্রায় ৪৫ জন এবং মুক্তিবাহিনীর আবদুল নূরসহ ২২ জন শহীদ হন। আহত হন প্রায় ৩৪ জন। যৌথ বাহিনী চন্দ্রপুর সাময়িকভাবে দখল করলেও পাকিস্তানি সেনারা তা পুনর্দখল করে। পরদিন মুক্তিবাহিনীর একটি দল শহীদ সহযোদ্ধাদের লাশ উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা মাত্র আটজনের লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হন। এ সময় যেসব মুক্তিযোদ্ধা সহযোদ্ধাদের লাশ আনতে যান, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। উদ্ধারকৃত লাশের মধ্যে শহীদ আবদুল নূরের লাশ ছিল না।

উল্লেখ্য, আবদুল নূরের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার খবর তাঁর পরিবারের কেউ জানতেন না। তাঁর মা-বাবা মনে করতেন, ছেলে পাকিস্তানে। ১৯৯৬ সালে সিলেটের জালালাবাদ সেনানিবাস থেকে একটি চিঠি (স্মারক নম্বর ২০৮/১) আসে আবদুল নূরের বাড়িতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠিতে ভাতাসংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ করে জানানো হয়, আবদুল নূর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তখন তাঁর মা-বাবা বেঁচে নেই।

১৯৬৯ সালে আবদুল নূরের স্ত্রী হোসনে আরা নামের এক শিশুকন্যা রেখে মারা যান। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে বাবার কাছে চিঠি লিখে মেয়ের খবর জানতে চান তিনি। সেটিই ছিল শেষ যোগাযোগ। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তাঁর খোঁজে একদল পাকিস্তানি সেনা বাড়িতে আসে। তখন তাঁর বাবা অবাক হন। তিনি জানান, আবদুল নূর পশ্চিম পাকিস্তানে। সেনারা বাড়ি তল্লাশি করে চলে যায়।

আবদুল বাসেত, বীর প্রতীক

গ্রাম ও ইউনিয়ন ধর্মপুর, সদর, ফেনী।
বাবা সুলতান আহমেদ, মা মোস্তফা বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৪[illegible]। শহীদ নভেম্বর ১৯৭১।

সহযোদ্ধাদের সঙ্গে আবদুল বাসেত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। একটু একটু করে তাঁরা অগ্রসর হতে থাকেন সামনের দিকে। আর পাকিস্তানি সেনারা ক্রমেই হটতে থাকে পেছন দিকে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিলে পাকিস্তানি সেনারা হয়ে পড়ে পুরোপুরি দিশেহারা। মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় যখন সন্নিকটে, ঠিক তখনই হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হলেন আবদুল বাসেত। তিনি শহীদ হলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল কৃষ্ণপুরে।

কৃষ্ণপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কে ফোর্সের নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নভেম্বরের প্রথম দিকে সীমান্ত এলাকা থেকে কুমিল্লা অভিমুখে অভিযান শুরু করে। ১১ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা কৃষ্ণপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন। তখন তাঁরা (নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি) পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলে ছিলেন আবদুল বাসেত।

১১ ও ১২ নভেম্বর কৃষ্ণপুর ও পার্শ্ববর্তী বগাবাড়ীতে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দুই দিনের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আবদুল বাসেতসহ দুজন শহীদ ও একজন আহত হন। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৪ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। এরপর তারা সালদা নদী, কসবা, মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকার প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে নভেম্বরের শেষে কুমিল্লা সেনানিবাসে আশ্রয় নেয়।

সহযোদ্ধারা পরে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় মুক্তাঞ্চল কসবায় তাঁর মরদেহ সমাহিত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল বাসেত ১৯৭১ সালে কৃষিকাজ করতেন। আনসারের প্রশিক্ষণও ছিল তাঁর। আনসার বাহিনীর অনিয়মিত সদস্য ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের দলে যোগ দেন। পরে ভারতে চলে যান। ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তিনটি বিশেষ ফোর্স গঠন করা হয়। এর একটি ছিল কে ফোর্স। কে ফোর্সের জন্য তখন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা এবং ২ নম্বর সেক্টরের গণযোদ্ধাদের সমন্বয়ে নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হয়। আবদুল বাসেতকেও নবগঠিত এ রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আবদুল মজিদ, বীর প্রতীক

গ্রাম টেংরাটিলা (আজবপুর), দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
বাবা আবদুল গনি, মা সফিনা বেগম। স্ত্রী লুৎফা বেগম।
তাঁদের দুই ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬৬।

আবদুল মজিদ ১৯৭১ সালে ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থী। তাঁর বাড়ির পাশেই ছাতক (টেংরাটিলা) গ্যাসক্ষেত্র। এপ্রিলে ১২ জন পাকিস্তানি সেনা এই গ্যাসক্ষেত্র পাহারা দিতে আসে। এরপর আবদুল মজিদসহ কয়েকজন যুবক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পৌছান এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। তাঁদের পাঠানো হয় মেঘালয়ের ইকো ওয়ান ট্রেনিং ক্যাম্পে।

প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের পাঠানো হয় বালাটে। ওই ব্যাচের মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম অপারেশন করেন সুরমা নদীর উত্তর পারের বেরিগাঁওয়ে। কিন্তু এলাকাটি তাঁদের কাছে একেবারে অপরিচিত হওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ফলে এ যুদ্ধে তাঁদের পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

এরপর ওই ব্যাচের মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠানো হয় তাঁদের নিজ নিজ এলাকায়। আবদুল মজিদ ৫ নম্বর সেক্টরের শেলা সাব-সেক্টরের পাইওনিয়ার কোম্পানির অধীনে নরসিংহপুর, টেংরাটিলা, আজবপুর, বালিউড়া, রাউলি, জাউয়া ও রাধানগর এলাকায় যুদ্ধে অংশ নেন।

আবদুল মজিদ ছাতকের বুরকি এলাকার সম্মুখযুদ্ধে এক সঙ্গীকে হারান। সেদিন সারা রাত দুই পক্ষের মধ্যে গুলি-পাল্টা গুলির ঘটনা ঘটে। ছাতক-সিলেট সড়কের জাওয়া সেতু উড়িয়ে দেওয়ার অপারেশনে ছিলেন আবদুল মজিদ। পাকিস্তানি সেনারা জাওয়া সেতু রক্ষা করতে সেতুর ওপর স্থানীয় রাজাকারদের পাহারায় বসায়। অপারেশনের দিন কৌশলে পাঁচজন রাজাকারকে ধরে ফেলেন তাঁরা। এরপর বিস্ফোরকের সাহায্যে সেতুটি উড়িয়ে দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান, বীর প্রতীক

গ্রাম ঠাকুরমল্লিক, জাহাঙ্গীরনগর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
বর্তমান ঠিকানা গ্রাম আধুনা, শরিকল, গৌরনদী, বরিশাল।
বাবা আমিনুদ্দিন ফরাজী, মা জামেলা খাতুন।
স্ত্রী মমতাজ বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১২৬। মৃত্যু ২০০৮।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল যশোর জেলার কালীগঞ্জে। এখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা স্থানীয় মানুষের ওপর ব্যাপক অত্যাচার চালাত। মুক্তিবাহিনীর আবদুল মান্নান ও তাঁর দল ওই ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা করে। কিন্তু ক্যাম্প সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তাঁদের। শত্রুর শক্তি সম্পর্কে জেনে আক্রমণ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। এক দিন আবদুল মান্নান নিজেই গুপ্তচর হয়ে ক্যাম্পে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরির সুবাদে তিনি জানতেন, পাকিস্তানি সেনারা চিংড়ি মাছ পছন্দ করে। বাজার থেকে একটি সাজিসহ কিছু চিংড়ি মাছ কিনে আনেন তিনি। ওই সাজি নিয়ে মাছ বিক্রেতা হিসেবে ওদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়েন। ময়লা লুঙ্গি, সাজিতে মাছ দেখে সন্দেহ না করলেও বাঙালি হওয়ায় তাঁকে অনেক গালমন্দ করে পাকিস্তানি সেনারা। মারধরও করে। মান্নান তাদের বলেন, 'তিন দিন ধরে না খেয়ে আছি। পেটের দায়ে এসেছি।' এক পাকিস্তানি সেনা তাঁকে খাবার এনে দেয়। খেয়ে সব তথ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি।

শত্রুদের অবস্থা ও গোলাবারুদের অবস্থান জেনে সেদিন রাতেই আবদুল মান্নান ও তাঁর সহযোদ্ধারা আক্রমণ চালান পাকিস্তানি সেনাদের ওই ক্যাম্পে। হঠাৎ আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা। কিছুক্ষণ গুলি-পাল্টা গুলি চলে, তাতে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। একপর্যায়ে তাদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন আবদুল মান্নান। উপায় না দেখে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন আবদুল মান্নান। কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। ছুটি শেষ হলে ঢাকা সেনানিবাসের ট্রানজিট ক্যাম্পে যোগ দেন পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে আবদুল মান্নান ঢাকা থেকে পালিয়ে বরিশালে চলে আসেন। বরিশালে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে শামিল হন। পরে মুক্তিবাহিনীর ৯ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন ওমরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ করেন তিনি। বাবুগঞ্জের ঝুনাহার এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সরাসরি এক যুদ্ধে অংশ নেন আবদুল মান্নান। তাঁর গুলিতে এক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া একটি গুলি তাঁর পায়ে লাগে।

বাবুগঞ্জ উপজেলার শরিকল ইউনিয়নের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী রাজাকার খাদেম মীরা নির্বিচারে মানুষ মারার জন্য নিজের বাড়িতে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের ঘাঁটি গড়ে তোলে। এক দিন খাদেম মীরার বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলেন আবদুল মান্নান ও তাঁর সহযোদ্ধারা। আবদুল মান্নান খেজুরগাছ বেয়ে ওই বাড়িতে ঢুকে প্রথম আক্রমণ চালান। সেখানে ১৮ জন রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। অন্যরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মালেক, বীর প্রতীক

মহল্লা গোকর্ণ, পৌর এলাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা করম উদ্দিন, মা পঙ্খীরাজ বেগম। তাঁর দুই স্ত্রী ফাতেমা বেগম ও আঙ্গুরা বেগম। তাঁদের সাত ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৬। মৃত্যু ২০০৫।

আবদুল মালেক চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। যশোরে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে আশ্রয় নেন। পরে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের অধীনে। যশোর জেলায় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন তিনি।

মার্চ-এপ্রিলে যশোর সেক্টরের ইপিআর সদস্যরা মূলত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করেন। হাবিলদার তফাজ্জল আলীর নেতৃত্বে ৩২ জনের একটি দল যশোরের সন্ন্যাসদিঘিতে যান। সেক্টর প্রতিরক্ষার জন্য ৬০ জন ইপিআর সদস্য নিয়ে থেকে গেলেন নায়েব সুবেদার আবদুল মালেক।

১ এপ্রিল আবদুল মালেক, হাবিলদার আবদুল [illegible] ও সেপাই মজিবুল্লাহ পাঠান ভারতীয় সাহায্যের প্রত্যাশায় বেনাপোল হয়ে ভারতে যান। কিন্তু ভারত থেকে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় তাঁরা ফিরে আসেন।

৩ এপ্রিল থেকে পাকিস্তানি বাহিনী যশোরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অবস্থানে ব্যাপকভাবে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। মুক্তিযোদ্ধাদের সব কটি দল একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটি দল হাসান উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে নড়াইলের দিকে, অপর দল ঝিকরগাছার দিকে হটতে থাকে। ৬ এপ্রিল যশোরের নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায়।

ঝিকরগাছায় পিছু হটে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল মালেক। ১২ এপ্রিল যশোর-বেনাপোল সড়কের লাউজানিতে এবং ২৪ এপ্রিল কাগজপুকুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আবদুল মালেক প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। আবদুল মালেকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম হোসেনপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা সাভার সেনানিবাস এলাকা, ঢাকা। বাবা আলতাফ আলী, মা জুলেখা বিবি। স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা। তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৩১।

চারদিকে নিকষ অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টিও হচ্ছে। খালি চোখে কিছুই দেখা যায় না। চরম প্রতিকূল পরিবেশ। এর মধ্যেই ভারত থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকলেন আবদুল হকসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। অদূরেই আধা পাকা রাস্তা। সেই রাস্তায় তাঁরা দ্রুত মাইন স্থাপন করলেন। এরপর তাঁরা অবস্থান নিলেন সেই রাস্তারই আশপাশে। ভোরে সেখানে এল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সেনাভর্তি লরি। মাইন বিস্ফোরণের পাশাপাশি একই সঙ্গে গর্জে উঠল তাঁদের অস্ত্র। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাই, উঠানীপাড়ায়।

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত কামালপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। ৩০ জুলাই ভোরে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ৩১ জুলাই) মুক্তিবাহিনী সেখানে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে কাট অফ পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মুক্তিবাহিনীর অপর একটি দল। এ দলে ছিলেন আবদুল হক। আক্রমণের নির্ধারিত সময় ছিল রাত তিনটা ৩০ মিনিট। সন্ধ্যার পর মুক্তিযোদ্ধারা উঠানীপাড়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেদিন হঠাৎ শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকার উপেক্ষা করে আবদুল হকসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা (নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি) ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে সময়মতোই সীমান্ত অতিক্রম করেন। তাঁরা অবস্থান নেন কামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কের কামালপুরের এক মাইল দক্ষিণে কামালপুর-শ্রীবরদী সড়কের সংযোগস্থল ও উঠানীপাড়ায়। কামালপুর বিওপিতে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের সংবাদ শুনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বকশীগঞ্জ কোম্পানি হেডকোয়ার্টার থেকে সেনাভর্তি তিনটি লরি কামালপুরের উদ্দেশে যাত্রা করে। লরিগুলো ভোররাত সাড়ে চারটা বা পাঁচটার দিকে সেখানে উপস্থিত হয়। উঠানীপাড়া এলাকার সড়কে স্থাপন করা মাইন বিস্ফোরণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটি লরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবদুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর আক্রমণ শুরু করেন। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি (আটজন নিহত ও ১০-১১ জন আহত) হয়। মুক্তিবাহিনীর একজন শহীদ ও দু-তিনজন আহত হন। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করে সীমান্ত এলাকায় চলে যান।

আবদুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে এই ব্যাটালিয়নের পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমানে পাকিস্তান) বদলি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর আগে ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ থেকে ইউনিটের অর্ধেক সেনা ছুটিতে এবং বাকি সবাই শীতকালীন প্রশিক্ষণে ছিলেন। আবদুল হকও সে সময় ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। নিজ এলাকায় প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়ার পর তিনি ভারতে গিয়ে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। কামালপুর যুদ্ধের পর জেড ফোর্সের অধীনে কুড়িগ্রাম জেলার কোদালকাটিসহ আরও কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। কোদালকাটির যুদ্ধে তিনি আহত হন। তাঁর পায়ে গুলি লাগে। সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবার যুদ্ধে যোগ দেন।

আবদুল হাই, বীর প্রতীক

গ্রাম ডুমনি, খিলক্ষেত, ঢাকা। বাবা মাহমুদুর রহমান, মা মাঘবুলেন নেছা। স্ত্রী হাফিজা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮৪।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি। মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে তুমুল উত্তেজনা। সিদ্ধান্ত হয়েছে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কামালপুর ঘাঁটিতে আক্রমণের। কিন্তু ঘাঁটির শক্তি সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধারা কিছু জানেন না। তাই সিদ্ধান্ত হলো সেই ঘাঁটি পর্যবেক্ষণের।

কামালপুর জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত, সীমান্ত এলাকা। কামালপুর গ্রামের মাঝামাঝি সীমান্ত বিওপি। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য এক ঘাঁটি। কামালপুরে আক্রমণ করার আগে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের অধিনায়ক সালাহ্উদ্দীন মমতাজ (বীর উত্তম, শহীদ) সেখানে কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করেন। পর পর দুই দিন পর্যবেক্ষণ করার পরও আবদুল হাইসহ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আবার ২৮ জুলাই রাতে তিনি পর্যবেক্ষণে যান। রাতে পাকিস্তানি সেনারা দূরের বাংকার ছেড়ে সেকেন্ড লাইন প্রতিরক্ষা অবস্থানে চলে যেত। পর্যবেক্ষণের একপর্যায়ে সালাহউদ্দীন মমতাজ ও আবদুল হাই একটি খালি বাংকারের সামনে যান। আবদুল হাই বাংকারে কেউ আছে কি না দেখার জন্য উঁকি দিচ্ছেন, এমন সময় দুই পাকিস্তানি সেনা টহল দিতে দিতে সেখানে আসে। সালাহ্উদ্দীন মমতাজ তাদের দেখে ফেলেন। তিনি হ্যান্ডস আপ বলে একজনকে জাপটে ধরেন। ওই পাকিস্তানি সেনা ছিল বিশালদেহী। সে সালাহ্উদ্দীন মমতাজকে মাটিতে ফেলে তাঁর গলা চেপে ধরে। অপর পাকিস্তানি সেনা আবদুল হাইকে হ্যান্ডস আপ বলে গুলি করতে উদ্যত হয়। আবদুল হাই দ্রুত স্টেনগানের ব্যারেল দিয়ে ওই সেনার মাথায় আঘাত করে তার রাইফেল কেড়ে নেন। সে পালিয়ে বাংকারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে থাকা অস্ত্র দিয়ে সে গুলি করতে থাকে। আবদুল হাই বাংকার লক্ষ্য করে গুলি করেন। তারপর দ্রুত সালাহ্উদ্দীন মমতাজের কাছে গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরে থাকা পাকিস্তানি সেনার মাথায় রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে গুঁতো দেন। ওই পাকিস্তানি সেনা তখন সালাহ্উদ্দীন মমতাজকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়াতে থাকে। তখন তিনি ওই পাকিস্তানি সেনাকে গুলি করে হত্যা করেন। প্রাণে বেঁচে যান সালাহ্উদ্দীন মমতাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হাই চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। কামালপুরসহ কয়েকটি স্থানে তিনি যুদ্ধ করেন।

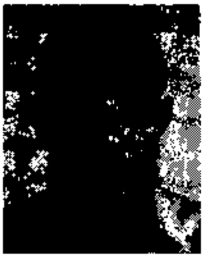

আবদুল হাই সরকার, বীর প্রতীক

গ্রাম মালভাঙা, ইউনিয়ন মোগলবাসা, সদর, কুড়িগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম মুক্তারাম, ইউনিয়ন বেলগাছা, সদর, কুড়িগ্রাম। বাবা রমজান আলী সরকার, মা হাফেজা খাতুন। স্ত্রী গুলশান আরা। তাঁদের সাত মেয়ে ও তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬২। গেজেটে নাম আবদুল হাই।

১৯৭১ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা আশপাশের প্রায় ৭০০ নিরীহ গ্রামবাসীকে ধরে এনে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ নিতে সুযোগ খুঁজছিলেন মুক্তিবাহিনীর সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরের হাই ও নজরুল কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা। হাই কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন আবদুল হাই সরকার। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেললাইনের উলিপুর অংশের হালাবটগাছে অ্যান্টি ট্যাংক মাইন পুঁতে পাকিস্তানি সেনা ও রসদবাহী ট্রেন অ্যামবুশ করবেন। এ জন্য সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে অ্যান্টি ট্যাংক মাইন সংগ্রহ করেন তাঁরা।

AMARBOI.COM

কয়েক দিন পর মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারেন, পাকিস্তানি সেনা ও রসদবাহী ট্রেন ২৭ নভেম্বর (মতান্তরে ২০ নভেম্বর) কুড়িগ্রাম থেকে উলিপুরে আসবে। খবর পেয়ে ২৬ নভেম্বর ভোরে আবদুল হাই সরকার তাঁর কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধা ও নজরুল কোম্পানির সেকশন কমান্ডার জসিমের অধীনের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে হালাবটগাছ এলাকায় যান। সেখানে ছিল এক বটগাছ। আশপাশে তেমন কোনো জনবসতি ছিল না। তাঁরা সেখানে রেললাইনের স্লিপারের নিচে অ্যান্টি ট্যাংক মাইন পোঁতেন। মাইনে তার লাগিয়ে সেই তার প্রায় আড়াই শ গজ দূরে নেন। তারের শেষ প্রান্তে লাগান ডেটোনেটর। সেখানে ছিল ঝোপঝাড়। মুক্তিযোদ্ধারা তার ভেতর ওত পেতে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

সকাল নয়টার দিকে কুড়িগ্রাম থেকে পাকিস্তানি সেনা ও রসদবাহী ট্রেন উলিপুরে আসছিল। ট্রেনের একেবারে সামনে মাটিভর্তি ওয়াগন। সেটি চিহ্নিত স্থান অতিক্রম করামাত্র মুক্তিযোদ্ধারা ডেটোনেটরের মাধ্যমে মাইনগুলোর বিস্ফোরণ ঘটান। সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকা গগনবিদারী শব্দে প্রকম্পিত হয়। একটি বগি দুমড়েমুচড়ে রেললাইনের পাশে পড়ে যায়। পেছনের বগিও উল্টে পড়ে। নিহত হয় ১৪-১৫ জন পাকিস্তানি সেনা। বেঁচে যাওয়া পাকিস্তানি সেনারা অবস্থান নিয়ে গুলি করতে থাকে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রগুলোও একসঙ্গে গর্জে ওঠে। নতুন এই আক্রমণে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনারা কুড়িগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। সেদিন মোট ১৯ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর পথপ্রদর্শকসহ আটজন সাধারণ গ্রামবাসী শহীদ হন।

আবদুল হাই সরকার ছিলেন একজন শ্রমিক। ১৯৭১ সালে পিটিসির (বর্তমানে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি—বিএটিসি) ঢাকার মহাখালী কারখানায় দিনভিত্তিক মজুরিতে কাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় যান। পরে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। ট্রেনিং শেষে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরের অধীন কুড়িগ্রাম এলাকায় যুদ্ধ করেন। তিনি হালাবটগাছ এলাকার অপারেশনের আগে ও পরে মোগলবাসা, গড়াইহাট, বুড়াবুড়িসহ আরও কয়েকটি স্থানে গেরিলা অপারেশন করেন।

আবদুল হালিম, বীর প্রতীক

গ্রাম দক্ষিণ রায়দেবপুর, ইউনিয়ন পরকোট, চাটখিল, নোয়াখালী। বাবা আজম আলী পালোয়ান, মা জরিনা খাতুন। স্ত্রী হাজেরা বেগম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৯৫।

রংপুর-সৈয়দপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের দশমাইল এলাকা। ১৯৭১ সাল। এপ্রিলের মাঝামাঝি। এখানে অবস্থান নিয়েছেন একদল প্রতিরোধযোদ্ধা। তাঁদের এই দলে আছেন ইপিআর, ছাত্র ও যুবক। ইপিআর সদস্য আবদুল হালিমও আছেন এই দলে। তিনি অ্যান্টি ট্যাংক (সিক্স পাউন্ডার) গান অপারেটর। ওদিকে সৈয়দপুর সেনানিবাস থেকে এগিয়ে আসছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বহর। এই বহরে আছে ট্যাংক, আর্টিলারি গান ও ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স।

পাকিস্তানি সেনাদের সামরিক শক্তি প্রতিরোধযোদ্ধাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। তার পরও প্রতিরোধযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ চালালেন। শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। কিন্তু সেদিনের যুদ্ধ ছিল অসম যুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ট্যাংক ও আর্টিলারির তীব্র গোলার সামনে প্রতিরোধযোদ্ধারা বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। একপর্যায়ে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হন। ১৬ এপ্রিল দিনাজপুরের পতন হয়।

দিনাজপুরের পতন হলে আবদুল হালিম আর মূল দলে যোগ দিতে পারেননি। এই দল থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে চলে যান। সেখান থেকে পরে তিনি নিজ এলাকায় চলে আসেন।

আবদুল হালিম পরে ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন। গণবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে তিনি ছিলেন। দলনেতা ছিলেন আবদুর রব চৌধুরী। আর তিনি ছিলেন সহদলনেতা। তাঁরা নোয়াখালী জেলার রায়গঞ্জ, দত্তপাড়াসহ কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী বা তাদের সহযোগী রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। দত্তপাড়ার যুদ্ধে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানীয় রাজাকার কমান্ডার ননী চেয়ারম্যান তাঁদের হাতে নিহত হন।

আবদুল হালিম ১৯৭১ সালে দিনাজপুর ইপিআর হেডকোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। ২৮ মার্চ বেলা তিনটায় প্যাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল দিনাজপুর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ চালায়। এরপর ইপিআর সদস্যরাও পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। আবদুল মজিদ ছিলেন অ্যান্টি ট্যাংক গানচালক। তিনি সে সময় পাকিস্তানি অবস্থানে গোলাবর্ষণ করেন। পরে তাঁরা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। ইপিআর সদস্যদের প্রথম প্রতিরোধের ফলে পাকিস্তানি সেনারা দিনাজপুর থেকে ৩১ মার্চ পালিয়ে যায়।

আবদুল্লাহ-আল-মাহমুদ, বীর প্রতীক

গ্রাম কাকিলাকুড়া, শ্রীবরদী, শেরপুর। বর্তমান ঠিকানা সড়ক-১৯, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা। বাবা মফিজল হক, মা রোকেয়া হক। স্ত্রী ডা. কামরুন্নেসা। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪০৫।

রাত সাড়ে তিনটা। একসঙ্গে গর্জে উঠল অস্ত্র। গোলাগুলির শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। চারদিকে বারুদের উৎকট গন্ধ। 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যাচ্ছেন শত্রুর বাংকার লক্ষ্য করে। তাঁদের সঙ্গে আছে মিত্রবাহিনীর রাজপুত রেজিমেন্ট। সব মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা প্রায় ৮০০। একটি দলের নেতৃত্বে আবদুল্লাহ-আল-মাহমুদ। তিনি কাট অফ পার্টির দায়িত্বে। সম্মিলিত আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিরোধ সেদিন একে একে ভেঙে পড়ে। একপর্যায়ে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তানি সেনাদের পালিয়ে যাওয়ার পথ ছিল রুদ্ধ। ভোর পাঁচটায় তাদের দিক থেকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। সেদিনকার যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর একজন ছাড়া সবাই নিহত হয়। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ১৯ জন ও মিত্রবাহিনীর ৫৬ জন শহীদ হন।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষে বা নভেম্বরের প্রথম দিকে। ঘটেছিল ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার তেলিখালীতে। এটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের দুর্ভেদ্য একটি ঘাঁটি। প্রতিরক্ষায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ১২৫ জন সেনাসদস্যের পাশাপাশি বেশ কিছু রেঞ্জার্স ও রাজাকার। সব মিলিয়ে তাদের সংখ্যা ২৩৭। দূরে বাঘাইতলীতে ছিল তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর একটি দল।

আবদুল্লাহ-আল-মাহমুদ ১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। পরে তাঁদের সঙ্গে ভারতের ঢালুতে গিয়ে আশ্রয় নেন। এখানে তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলেন। জুনের পর তাঁদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আগস্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে ১১ নম্বর সেক্টরের ঢালু সাব-সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সাব-সেক্টরের অপারেশনাল এলাকার আওতায় ছিল হালুয়াঘাট, ঢালু ও ময়মনসিংহ সড়ক এলাকা। এসব এলাকায় আগস্ট থেকে অনেক যুদ্ধ হয়। কয়েকটিতে তিনি সরাসরি অংশ নেন।

আবদুস সোবহান, বীর প্রতীক

গ্রাম চরলোহানিয়া, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা কালু মিয়া, মা ফজরন নেছা। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম।
তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৮৯।

অন্ধকারে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে আবদুস সোবহান ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা নিক্ষেপ করলেন বেশ কটি হ্যান্ড গ্রেনেড। অন্য সহযোদ্ধারা বর্ষণ করে চললেন একযোগে গুলি। হ্যান্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে হকচকিত শত্রুপক্ষ। তারপর তাদের দিক থেকেও এল বৃষ্টির মতো পাল্টা গুলি।

পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে আবদুস সোবহান ও অন্য মুক্তিযোদ্ধারা বেশ বেকায়দায় পড়েন। স্থানীয় সোর্সের ভুলের কারণে তাঁরা ঢুকে পড়েন একেবারে পাকিস্তানি সেনাদের হাতের নাগালে। পাল্টা গুলিতে তাঁদের অনেকে হতাহত হন। ব্রাশফায়ারের একঝাঁক গুলি এসে লাগে আবদুস সোবহানের পেটে, উরু ও হাতের আঙুলে। হাতের একটি আঙুল ও বাঁ পায়ের উরুর মাংসপেশি উড়ে যায়।

গুরুতর আহত হলেন আবদুস সোবহান। সহযোদ্ধা আরও অনেকে আহত হলেন। রক্তে ভেসে যেতে থাকল জায়গাটা। দেখলেন, গুলিবিদ্ধ তিন সহযোদ্ধা ছটফট করতে করতে শহীদ হলেন। তখনো তিনি জ্ঞান হারাননি। ভাবলেন, তাঁর জীবন বুঝি এখানেই শেষ। তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে ছিল হাঁটু পানি। তিনি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছেন, এমন সময় এক সহযোদ্ধা তাঁর কাছে ছুটে এলেন। তিনি তাঁকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে টেনে দূরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে উদ্ধারকর্মীর দল তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে রওনা হলো সীমান্তের দিকে। এ সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এর পরের ঘটনা তো আরেক কাহিনি।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ৩০ অক্টোবরের মধ্যরাতে। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার কমলগঞ্জ সীমান্তের ধলই বিওপিতে। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য একটি ঘাঁটি। ধলই বিওপির চারপাশে ছোট ছোট টিলা। চা-বাগান। মাঝেমধ্যে ঘন বাঁশবন। নালা-খানাখন্দ। বিওপি-সংলগ্ন চারদিক কাঁটাতারে ঘেরা। ভূমিতে পুঁতে রাখা হয়েছে মাইন। শত্রুর অবস্থান বিভিন্ন স্থানের গোপন বাংকারে। এসব বাংকার এতই মজবুত ছিল যে সেগুলো মাঝারি পাল্লার কামানের গোলার আঘাতে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ঘটনার দিন কয়েক আগে, অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় দল সেখানে আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণ সাফল্যের মুখ দেখেনি। সেদিন তাঁদের বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধা শহীদ ও আহত হন। ধলই বিওপিতে কয়েক দিন ধরে যুদ্ধ চলে এবং শেষ পর্যন্ত ৩ নভেম্বর মুক্ত হয় এই এলাকা।

আবদুস সোবহান ১৯৭১ সালে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা আক্রান্ত হন। তখন সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে তাঁরা চৌগাছায় সমবেত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি ধলই বিওপি ছাড়াও কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেছেন।

আবুল কালাম, বীর প্রতীক

গ্রাম লতিফপুর, ইউনিয়ন রসুলপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
বাবা আফজাল আলী, মা সালেহা খাতুন।
স্ত্রী জাকিয়া খাতুন। তাঁদের তিন মেয়ে ও ছয় ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর [illegible]। মৃত্যু ২০০৩।

আবুল কালাম ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। কুঠিবাড়িতে ছিল তাঁদের হেডকোয়ার্টার। ২৬ মার্চ খুব ভোরে তাঁরা ঢাকার খবর পেয়ে যান। সে সময় সেক্টর হেডকোয়ার্টারে বাঙালি কোনো কর্মকর্তা, এমনকি সেক্টরের সুবেদার মেজরও উপস্থিত ছিলেন না। ২৮ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কুঠিবাড়িতে গোলাবর্ষণ শুরু করে। হাবিলদার ভুলু মিয়ার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে পাকিস্তানি অবস্থানে পাল্টা গোলাবর্ষণ করেন। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁরা দিনাজপুর শহর শত্রুমুক্ত রাখতে সক্ষম হন। পরে পশ্চাদপসরণ করে ডালিমগাঁওয়ে অবস্থান নেন। সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করেন। এসব যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এরপর তাঁরা আশ্রয় নেন ভারতে।

ভারতে অবস্থানকালে আবুল কালামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তাঁকে হেডকোয়ার্টার কোম্পানির মর্টার প্লাটুনের কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মে-জুনে তিনি দিনাজপুর এলাকায়, জুলাই-আগস্টে বাহাদুরাবাদ ঘাট, দেওয়ানগঞ্জ রেলস্টেশন, সুগারমিলসহ রৌমারীর বেশ কয়েকটি স্থানের অপারেশনে অংশ নেন। সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের এনবিসি টেলিভিশন চ্যানেলের একটি দল রৌমারী আসে। ওই দলের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন রজার। দলটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ছবি চিত্রায়ণ করে। রৌমারীর হাজিরচরের একটি গোয়ালঘর থেকে কোদালকাটির পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আবুল কালাম গোলাবর্ষণ করছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও তাঁদের অবস্থানে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করছিল। এতে এনবিসি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকেরা পর্যন্ত ভড়কে যান। কিন্তু আবুল কালাম বিচলিত না হয়ে পাকিস্তানি অবস্থানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে চলেন। তাঁর এই সাহসিকতায় বিদেশি সাংবাদিকেরা পর্যন্ত বিস্মিত হন। পরে ওই প্রামাণ্যচিত্র বিশ্বব্যাপী প্রদর্শিত হয়। এতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠে।

আবুল কালাম অক্টোবর থেকে সিলেট এলাকায় যুদ্ধ করেন। ছাতক, গোয়াইনঘাট, ছোটখেল, রাধানগর, সালুটিকর, গোবিন্দগঞ্জ, লামাকাজিঘাটসহ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। তিনি মর্টারের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালাতেন।

মর্টার বাহিনীর কার্যকর ভূমিকার বিবরণ পাওয়া যায় এস আই এস নূরন্নবী খানের *অপারেশন রাধানগর* বইয়ে। তিনি লিখেছেন, '৮ নভেম্বর, ১৯৭১। সকাল থেকেই পাকিস্তানি সেনারা আমাদের লুনি গ্রামের সব কটি অবস্থানের ওপর মেশিনগানের অনবরত গুলি ও মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করতে লাগল। এর মধ্যে আরআর (রিকোয়েললেস রাইফেল) গোলা ছিল মারাত্মক। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের সম্মুখ অবস্থান থেকে পর্যাপ্তসংখ্যক দুই ইঞ্চি মর্টার গোলা ও এনারগা গ্রেনেড ছোড়া হলো। ক্লোজ ব্যাটেলে দুই ইঞ্চি মর্টারের গোলা ও এনারগা গ্রেনেড খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বারবার হামলা, অনবরত মর্টার ও আরআর গোলা নিক্ষেপ করেও ওরা (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) আমাদেরকে অবস্থান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও সরাতে পারেনি।'

WWW.AMARBOI.COM

আবুল কালাম, বীর প্রতীক

গ্রাম আদ্রা, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা। বাবা মো. ইদ্রিস ভূঁইয়া, মা আংকুরনেছা। স্ত্রী রিজিয়া বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৬।

আবুল কালাম কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। ১৯৭১ সালের মার্চে সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসনের কথা বলে তাঁদের কোম্পানিকে সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। ২৪ মার্চ তিনি কোম্পানির সঙ্গে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে ছিলেন। ২৬ মার্চ তাঁরা বিদ্রোহ করে বগুড়া-রংপুর সড়কে অবস্থান নেন। ২৮ মার্চ রংপুর সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের একাংশ বগুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে তাঁদের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট রফিককে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কৌশলে আটক করে। এতে তাঁরা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়লেও যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁদের প্রবল প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনারা রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অন্যদিকে তাঁর ১১ জন সহযোদ্ধা শহীদ হন।

পরে মুক্তিযোদ্ধারা রংপুরের উদ্দেশে রওনা হন। পথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যামবুশে পড়েন। এ সময় তাঁরা বেশ পরিশ্রান্ত ছিলেন। ক্লান্তিতে সবার চোখ বুজে আসছিল। তার পরও তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধে তাঁর বেশির ভাগ সহযোদ্ধাই শহীদ হন। আবুল কালাম আহত হন। দুই যুদ্ধে দলের ৩৫ জনের মধ্যে ৩৩ জনই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ হন। তিনি ও সহযোদ্ধা আবুল কাশেম বেঁচে যান। এর পরও আবুল কালাম দমে যাননি। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ভারতে গিয়ে মূল দলের সঙ্গে মিলিত হন। পুনর্গঠিত হওয়ার পর যুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টরের মানকারচর সাব-সেক্টরের অধীনে। কোদালকাটি, চিলমারী, উলিপুরসহ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন তিনি।

কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারীতে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। ১৮ অক্টোবর ভোরে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল একযোগে চিলমারীর পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ করে। একটি দলে ছিলেন আবুল কালাম। তাঁরা ভোর চারটায় ওয়াপদার প্রধান ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। মুহূর্তেই প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়। আগুনের লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বেলা ১১টার মধ্যে ওয়াপদার অবস্থান ছাড়া বাকি সব অবস্থান মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। কয়েক দিন যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী শেষ পর্যন্ত গোটা চিলমারীই মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, ইপিসিএএফ, রাজাকার ও পুলিশ মিলে প্রায় ১০০ জন মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। গোলার আঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটি স্পিডবোট ও তিনটি লঞ্চ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

আবুল বশর, বীর প্রতীক

গ্রাম শেখপাড়া, ইউনিয়ন নোয়াপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।
বাবা সৈয়দ হোসেন, মা সৈয়দা সাজেদা বেগম।
স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৯। গেজেটে নাম
মোহাম্মদ আবুল বাশার। শহীদ ১৪ জুলাই ১৯৭১।

বানার নদের পারের এক স্থানে ওত পেতে আছেন একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুবেদার আবুল বশর। তাঁরা খবর পেয়েছেন, নদীপথে লঞ্চে পাকিস্তানি সেনারা আসবে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভাগ্য, পাকিস্তানি সেনাদের কয়েকজন এদেশীয় দোসর তাঁদের অবস্থান ও গতিবিধি আগে থেকেই গোপনে পর্যবেক্ষণ করছিল। তারা মুক্তিবাহিনীর অবস্থান, সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে পাকিস্তানি সেনাদের কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়। খবর পেয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের জুলাইয়ের। ঘটেছিল নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায়।

পাকিস্তানি সেনারা সাধারণত লঞ্চযোগে যাতায়াত করত। ১৪ জুলাই তারা অন্য কায়দায় এল। এবার তারা লঞ্চ ছাড়াও ছোট ছোট দেশি নৌকায় করে আসে। লঞ্চগুলো ছিল নৌকার বেশ পেছনে। নৌকাগুলো যখন ওই জায়গা অতিক্রম করছিল, তখন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কারও না হলেও মমতাজ নামের একজনের সন্দেহজনক মনে হয় নৌকাগুলোর গতিবিধি। তিনি একটি নৌকাকে থামানোর নির্দেশ দেন। আর ঠিক তখনই পাকিস্তানি সেনারা নৌকা থেকে গুলি করতে শুরু করে। মমতাজ তাদের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হন। এর মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের পেছন থেকে ঘেরাও করে ফেলে এবং তাদের আক্রমণে বেশ কজন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হন। দলনেতা আবুল বশর যখন ঘটনা বুঝতে পারেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর শত্রুরাও তাঁদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। এ অবস্থায় লড়াই করার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। কৌশলগত কারণে পশ্চাদপসরণ করাই বরং শ্রেয়। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন নিখুঁত কাভারিং ফায়ার। উপায়ান্তরহীন হয়ে দলনেতা বশর নিজেই এ দায়িত্ব নিলেন। 'শেষ ব্যক্তি, শেষ গুলি' পর্যন্ত লড়াই করার জন্য তিনি মনস্থির করলেন। একসময় গুলি এসে লাগে তাঁর পেটে। গুলির আঘাতের জায়গায় গায়ের জামা পেঁচিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন অনেকক্ষণ। কিন্তু রক্তক্ষরণে তাঁর শরীর ক্রমেই অসাড় হয়ে পড়ে। হলুদের খেতে পড়ে থাকে দ্রোহী নির্ভীক যোদ্ধা আবুল বশরের প্রাণহীন দেহ। এ যুদ্ধে তিনি ছাড়াও শহীদ হন ছয়-সাতজন। আহত হন বেশ কয়েকজন। পাকিস্তানি সেনাদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়।

আবুল বশর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্লাটুনের সুবেদার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। ৩ নম্বর সেক্টরের বিভিন্ন স্থানে তিনি যুদ্ধ করেন।

আবুল হাসেম, বীর প্রতীক

গ্রাম ও ইউনিয়ন বাটইয়া, কবিরহাট, নোয়াখালী।
বাবা আবদুল কাদের, মা সাহারা খাতুন।
স্ত্রী ছায়েরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৯৮।

রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোট এক ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন আবুল হাসেমসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। প্রচণ্ড আক্রমণে একসময় পাকিস্তানি সেনারা অনেক গোলাবারুদ ও বেশ কিছু অস্ত্র ফেলে রাতের অন্ধকারে পালাতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ধাওয়া করলেন। কিন্তু বেশিদূর গেলেন না। কারণ, সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁরা বেশ ভেতরে চলে এসেছেন। তা ছাড়া সামনে আছে শত্রুদের মূল ঘাঁটি। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা পারবেন না। তাই পেছন ফিরে দ্রুত যেতে থাকলেন সীমান্তের দিকে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৮ জুলাইয়ের। ঘটেছিল চাওই নদের তীরে।

চাওই নদ পঞ্চগড় জেলার সীমান্তে। জেলার উত্তর-দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত। এই এলাকার সীমান্তসংলগ্ন স্থানগুলো মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে অনেক দিন মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। জুনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা মুক্ত এলাকায় অবস্থান করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেইড ও অ্যামবুশের মতো তৎপরতা চালান। জুলাই থেকে ওই এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৎপরতা বেড়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি এক দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বড় ধরনের আক্রমণ চালায়। সে সময় মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করছিলেন প্রধানপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া ও নুনিয়াপাড়া গ্রামে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একযোগে আক্রমণ শুরু করলে মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হন। তিনটি গ্রামে তাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও (১২০ জন) একই কোম্পানিভুক্ত ছিলেন। একটি দলে ছিলেন আবুল হাসেম। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে সেদিন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও আহত হন।

এ ঘটনায় আবুল হাসেম হতাশ হননি বা ভেঙে পড়েননি। তিনি তাঁর দল নিয়ে পেছনে এক জায়গায় সমবেত হন। কয়েক দিন পর মুক্তিযোদ্ধারা নদীর পূর্ব পারের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। এ আক্রমণে আবুল হাসেমও অংশ নেন। তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েকজন হতাহত হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে অগ্রবর্তী ঘাঁটির পাকিস্তানি সেনারা হতাহত সেনাদের নিয়ে পালিয়ে যায়।

আবুল হাসেম চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঠাকুরগাঁও উইংয়ে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সীমান্ত বিওপি থেকে এসে যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের ভজনপুর সাব-সেক্টরের অধীনে।

আবুল হোসেন, বীর প্রতীক

১২ মনেশ্বর রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা।
বাবা মো. ইসমাইল মিয়া, মা সাজেদা খাতুন। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২৯। মৃত্যু ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ বুড়িগঙ্গায় নৌকাডুবিতে।

ট্রাফিক সিগন্যালের লাল বাতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি গাড়ি। হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়াল একটি মোটরসাইকেল। তাতে দুজন আরোহী। আবুল হোসেন ও এনায়েত। তাঁরা দ্রুত একটি গাড়ির জানালা দিয়ে গ্রেনেড ও ফসফরাস বোমা ছুড়ে দ্রুত উধাও হয়ে গেলেন। চার-পাঁচ সেকেন্ড পরই ঘটল বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠল গাড়িটি। এসব কিছু ঘটল ৮ থেকে ১০ সেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের। ঘটেছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে।

২ নম্বর সেক্টরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা তখন গোপনে অবস্থান করছিলেন পুরান ঢাকায়। সেদিন বেলা ১১টার দিকে লালবাগের এক রেস্তোরাঁয় নাশতা করছিলেন এনায়েত। এ সময় একটি গাড়ি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই গাড়ির সামনে পতাকাদণ্ডে শোভা পাচ্ছে পাকিস্তানি পতাকা। গাড়িটি গিয়ে দাঁড়াল লালবাগের নেজামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামী অফিসের সামনে। এনায়েত ভাবলেন, এ ব্যাটা নিশ্চয়ই ডা. আবদুল মালিক মন্ত্রিসভার মন্ত্রী। তিনি খুঁজে বের করলেন সহযোদ্ধা আবুলকে। দ্রুত তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার গোপন জায়গা থেকে সংগ্রহ করলেন গ্রেনেড ও ফসফরাস বোমা। লালবাগের চৌরাস্তার মোড়ে তাঁরা প্রথম চেষ্টা করলেন গ্রেনেড ছোড়ার। ব্যর্থ হলেন। গাড়ি দ্রুত শাঁ করে চলে গেল। তাঁরা গাড়ির পিছু নিলেন। যেতে যেতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উত্তর পাশের চার রাস্তার মোড়ে (এখন সেখানে শহীদ মিনারের কারণে চার রাস্তা নেই) সিগন্যালের লাল বাতি জ্বলে উঠল। থেমে গেল গাড়ি। এনায়েত খোলা জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে গাড়িতে ছেড়ে দিলেন পিন খোলা গ্রেনেড আর আবুল ছাড়লেন ফসফরাস বোমা। তখন বেলা আনুমানিক একটা। গাড়িটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের মন্ত্রী মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাকের। এই অপারেশনে মাওলানা ইসহাক, গাড়ির চালকসহ কয়েকজন আহত হয়। পরদিন খবরের কাগজেও এ খবর প্রকাশিত হয়।

আবুল হোসেন ১৯৭১ সালে এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুনে ভারতে চলে যান। ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে গেরিলাযুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ছিলেন কেরানীগঞ্জে। ১৭ ডিসেম্বর ভোরে সেখান থেকে ঢাকায় আসার পথে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকাডুবিতে আবুল হোসেনসহ ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান। পরে তাঁদের সমাহিত করা হয় আজিমপুর নতুন কবরস্থানে।

WWW.AMARBOI.COM

আবুল হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম বাসাবাড়ি, মোল্লারহাট, বাগেরহাট। বর্তমান ঠিকানা বাগমারা, মহানগর, খুলনা। বাবা এসহাক গাজী, মা সোনাই বিবি। স্ত্রী আফরোজা হোসেন। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২০৯।

আবুল হোসেন ১৯৭১ সালে যশোর ইপিআর সেক্টরের অধীন যাদবপুর ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন। ২৭ মার্চ সকালে তাঁদের ক্যাম্পে সহকারী উইং কমান্ডার অবাঙালি ক্যাপ্টেন সাদেক পরিদর্শনে আসেন। এ সময় আবুল হোসেন কৌশলে চুয়াডাঙ্গা ইপিআর উইংয়ে যোগাযোগ করে করণীয় সম্পর্কে জানতে চান। সেখান থেকে নির্দেশ আসে, ক্যাপ্টেন সাদেককে অস্ত্রমুক্ত করা হোক। এর মধ্যে কয়েকজন বাঙালি ইপিআর সদস্য অস্ত্র হাতে ক্যাপ্টেন সাদেককে ঘেরাও করেন। সাদেকের সঙ্গে ছিল কয়েকজন অবাঙালি ইপিআর গার্ড। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন সাদেক তাঁর দলবলসহ নিহত হন।

এ ঘটনার মধ্য দিয়েই আবুল হোসেন মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এপ্রিলের শেষে (২৪ বা ২৬) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি বহর তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করে। তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাঁদের অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি। এই যুদ্ধে আবুল হোসেনের ডান পায়ে গুলি লাগে। ভারতে চিকিৎসা নিয়ে তিনি আবার যুদ্ধে যোগ দেন। ৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নম্বর সেক্টরের অধীন বয়রা সাব-সেক্টরে সম্মুখ ও গেরিলাযুদ্ধ করেন। জুন মাসের এক দিন তাঁদের কাছে খবর আসে, কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ছুটিপুর এসেছে। তারা বাঙালিদের মারধর করছে এবং জোর করে টাকাপয়সা নিচ্ছে। তিনি পাঁচজন সহযোদ্ধা নিয়ে গেরিলা কায়দায় অতর্কিতে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। তাতে দুই পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। একটি গাড়ি, পাঁচটি অস্ত্রসহ একজনকে তাঁরা জীবিত আটক করেন।

পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে তাঁদের একটা বড় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনিই নেতৃত্ব দেন। ঘটনাটা ঘটেছিল আগস্ট মাসে। এক দিন বয়রা ক্যাম্পে তাঁরা যুদ্ধকৌশল নিয়ে আলোচনা করছিলেন। খবর আসে, কাশিপুরে পাকিস্তানি সেনারা ঢুকে পড়েছে। আবুল হোসেনের ওপর দায়িত্ব পড়ে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার। তিনি আরব আলী (বীর বিক্রম), মোস্তফা কামালসহ (বীর প্রতীক) আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কাশিপুরের বেলতায় অ্যামবুশ করেন। পাকিস্তানি সেনারা আওতার মধ্যে আসামাত্র তাঁদের অস্ত্রগুলো একসঙ্গে গর্জে ওঠে। দুজন পাকিস্তানি সেনা সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনা ছিল ৩০-৩৫ জন। তারাও পাল্টা আক্রমণ করে। আবুল হোসেন ও তাঁর সঙ্গীরা কিছুটা বেকায়দায় পড়েন। তবে আরও কয়েকজন সহযোদ্ধা এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলে পাকিস্তানি সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং পালিয়ে যায়। একজন পাকিস্তানি সেনাকে তাঁরা আটক করতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধে তাঁর সহযোদ্ধা আরব আলীর হাতে গুলি লাগে। আবুল হোসেন আরও কয়েক স্থানে যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে একটি হলো গোয়ালহাটি-ছুটিপুরের যুদ্ধ।

WWW.AMARBOI.COM

আয়েজউদ্দিন আহমদ, বীর প্রতীক

গ্রাম কৃষ্ণকাঠি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা রূপাতলী, বরিশাল সিটি করপোরেশন। বাবা মফিজউদ্দিন মুন্সী, মা চন্দ্রভান বিবি। তাঁর দুই স্ত্রী, রেনু বেগম ও রানী বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৮৪। গেজেটে নাম আইনউদ্দিন আহমেদ।

সকাল হতেই শুরু হলো ব্যাপক গোলাবর্ষণ। প্রতিরোধযোদ্ধাদের কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ট্যাংক তাঁদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। একই সঙ্গে তাদের কামান থেকেও গোলাবর্ষণ চলল। পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে আয়েজউদ্দিন আহমদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা তখন রীতিমতো বিপর্যস্ত। কামান ও ট্যাংকের গোলা তখন সরাসরি এসে পড়ছে তাঁদের বাংকারে। গোলার আঘাতে বাংকার ধসে তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা মাটিচাপা পড়েন। শেলের স্প্লিন্টারের আঘাতেও সহযোদ্ধারা আহত হচ্ছেন। তার পরও তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মনোবল ভেঙে পড়েনি। একপর্যায়ে আয়েজউদ্দিনও আহত হন। ক্রমেই আহত যোদ্ধার সংখ্যা বাড়তে থাকে। দুপুরের মধ্যে তাঁদের প্রায় অর্ধেক সহযোদ্ধাই আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১২ মে মাসের। ঘটেছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীসংলগ্ন শুভপুর সেতুর কাছে। ২৫ এপ্রিল করেরহাটের পতন হলে প্রতিরোধযোদ্ধারা শুভপুর সেতুর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সরে উত্তর প্রান্তে অবস্থান নেন। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিলেন। আয়েজউদ্দিন ছিলেন একটি দলে। তাঁর কাছে ছিল মর্টারগান। তাঁদের অন্য দলটির কাছে ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র থাকলেও গোলার অভাবে সেটি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।

আয়েজউদ্দিন আহমদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শুভপুর দখল করার পর আশপাশের গোটা এলাকা নির্জন হয়ে পড়ে। শুভপুরের কাছেই ছিল ভারতীয় সীমান্ত। সেখান দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতিরোধযোদ্ধারা। তাঁরা কিছুটা উদাস-নির্বাক। নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছেন সীমান্তের দিকে। সবাই আহত। কেউ লাঠিতে, কেউ বা অন্য একজনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছেন। দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁদের মুখে হাসি।

আয়েজউদ্দিন আহমদ ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের হালিশহর ইপিআর উইংয়ে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনিসহ এক প্লাটুন ইপিআর সদস্য পাহাড়তলী রেলওয়ে বিল্ডিংয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। ২৬ মার্চ রাত ১০টা থেকে তাঁদের অবস্থানের ওপর পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ থেকে ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু হয়। নায়েক সুবেদার আয়েজউদ্দিন তিন ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। সারা রাত উভয় পক্ষে গোলাগুলি হয়। সকালের দিকে আয়েজউদ্দিন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের গোলাগুলি প্রায় শেষ হয়ে যায়। এ সময় পাকিস্তানি সেনারা তাদের আক্রমণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। তখন প্রতিরোধযোদ্ধারা ওই অবস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। শুভপুরের যুদ্ধে আহত হওয়ার পর আয়েজউদ্দিন ভারতে গিয়ে চিকিৎসা নেন। সেপ্টেম্বরে আবারও যুদ্ধে যোগ দেন তিনি। পরে তিনি উৎমা বিওপিসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

আলমগীর করিম, বীর প্রতীক

প্রধান সড়ক, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আবদুল করিম, মা সাহানা বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২৮। শহীদ ৭ নভেম্বর ১৯৭১।

গুলিবিদ্ধ আলমগীর করিম বললেন, যদি তিনি মারা যান, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তাঁর মা বা পরিবারের কাউকে যেন সে খবর না জানানো হয়। কয়েক ঘণ্টা জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলে, শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের কিছু এলাকায় প্রতিনিয়ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি এলাকা কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একটি উপজেলা। কসবার একটি এলাকা শিমরাইল। এখানে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। প্রতিবারই পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। নভেম্বরের শুরুতে নিয়মিত সেনা ও গণবাহিনীর স্বল্প প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়া মুক্তিবাহিনীর একটি দল শিমরাইলে অবস্থান নেয়। আলমগীর করিম ছিলেন গণবাহিনীর সদস্য। ৭ নভেম্বর পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে হঠাৎ আক্রমণ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা আবার মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ করে। এ দিন তারা সংখ্যায় ছিল বিপুল ও ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এ অবস্থায় মুক্তিবাহিনীর সেখানকার অধিনায়ক নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন।

আলমগীর করিম ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা সেদিন কৌশলগত একটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ওই গ্রামের প্রবেশপথে খালসংলগ্ন রাস্তার পেছনে। তাঁরা ভেবেছিলেন, ওই অবস্থান থেকে অ্যামবুশ করে পাকিস্তানি সেনাদের সহজেই ঘায়েল করা যাবে। আলমগীর করিম ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা অধিনায়কের পশ্চাদপসরণের নির্দেশ সত্ত্বেও সেখানে অবস্থান নেন। একদল পাকিস্তানি সেনা নৌকায় করে সেখানে আসামাত্র তাঁদের অস্ত্রগুলো একসঙ্গে গর্জে ওঠে। হতাহত হয় বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা। এরপর দিশেহারা পাকিস্তানি সেনারা পালাতে থাকে। অস্ত্রবোঝাই দু-তিনটি নৌকা ফেলে যায় তারা।

তখন আলমগীর করিম একটি নৌকার দখল নিতে যান। এ দিকে পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা গুলি করতে করতে পালিয়ে যাচ্ছিল। আলমগীর করিম অস্ত্রবোঝাই একটি নৌকার দখল নিয়ে নিজেদের অবস্থানের দিকে টেনে আনছিলেন—এ সময় হঠাৎ একটি বুলেট এসে লাগে তাঁর বুকে। নিমেষে তাঁর শরীর কুঁকড়ে যায়। গোলাগুলির মধ্যেই সহযোদ্ধা সিদ্দিক তাঁকে উদ্ধার করেন। তাঁর বুক থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। সহযোদ্ধারা তাঁকে পাশের গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে একজন সেবিকা ছিল। তাঁর কাছে যাওয়ার আগেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আলমগীর করিমের শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাঁকে বাঁচানোর জন্য রক্তের প্রয়োজন ছিল। ওই গ্রামের শত শত মানুষ রক্ত দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা করা তখন সম্ভব হয়নি। চিকিৎসার জন্য তাঁকে সীমানা পেরিয়ে ভারতে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ভারতে নেওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁকে শিমরাইল গ্রামের স্কুলমাঠে সমাহিত করা হয়। সহযোদ্ধারা তাঁর অনুরোধ রেখেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরা আলমগীর করিমের শহীদ হওয়ার খবর তাঁর মা-বাবাকে দেন। এ ছাড়া তাঁর একটি আংটি ও ব্যবহার্য কাপড়চোপড়ও তাঁদের ফিরিয়ে দেন।

আলমগীর করিম ১৯৭১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে বিএ ক্লাসে পড়তেন। তখন তাঁর বয়স ১৯। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে যান। মুক্তিবাহিনীর জন্য ছাত্র-যুবকদের নির্বাচন শুরু হলে তিন-তিনবার নাম দেন। কিন্তু মা-বাবার আপত্তির কারণে তিনি যেতে পারেননি। চতুর্থবার সফল হন। দেরাদুনে তাঁর প্রশিক্ষণ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী আকবর মিজি, বীর প্রতীক

গ্রাম পশ্চিম সকদী, ইউনিয়ন বাগাদী, সদর, চাঁদপুর। বাবা ওসমান আলী মিজি, মা সাফিয়া খাতুন। স্ত্রী সকিনা খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২২৯। গেজেটে নাম আলী আকবর।

আলী আকবর মিজি প্রথমে রৌমারী, পরে দেওয়ানগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ এবং শেষে সিলেটে যুদ্ধ করেন। সিলেটের ছাতকের দক্ষিণে তাঁরা এক দিন টানা তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সাতজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। একপর্যায়ে সেখান থেকে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়। এরপর তিনি যুদ্ধ করেন সিলেট বিমানবন্দরে। সেখানে দিনের বেলায় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ঘেরাও করে ফেলে। দুই ঘণ্টার যুদ্ধে সেখানে পাকিস্তানি একজন সেনা নিহত হয় এবং ইপিআরের একজন সদস্য আহত হন।

ডিসেম্বরে তিনি সর্বশেষ যুদ্ধ করেন সিলেটের লনী গ্রামে। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের শক্ত একটি ঘাঁটি। ওই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের হামলায় ভারতের ৫/৫ গোর্খা রেজিমেন্টের ৬৭ জন সদস্য শহীদ হন। পরে সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হামলা চালিয়ে সাতজন পাকিস্তানি সেনাকে অস্ত্রসহ আটক করেন।

আলী আকবর মিজি ১৯৭১ সালে ইপিআরে ছিলেন। কর্মরত ছিলেন দিনাজপুরে। ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের হামলার কথা শুনে ২৬ মার্চ থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। পরে তাঁরা ভারতের তরঙ্গপুরে যান। সেখান থেকে তাঁদের পাঠানো হয় তেলঢালা পাহাড়ে। জুলাই-আগস্টে তাঁরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন।

১৯৭৯ সালে সুবেদার হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নেন।

AMARBOI.COM

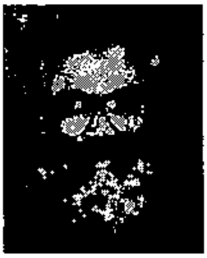

আলী আহমেদ খান, বীর প্রতীক

গ্রাম বারুইখালী, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট। বাবা মুসলেম আলী খান, মা আছিয়া বেগম। স্ত্রী রেহেনা বেগম। তাঁদের চার ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১২৫। গেজেটে নাম আলী আহমেদ। মৃত্যু ২০০৩।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে কয়েকবার আক্রমণ করেন। সর্বশেষ আক্রমণ করেন নভেম্বরের শেষে। এই আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধা আলী আহমেদ খানও অংশ নেন।

বানারীপাড়ার অবস্থান বরিশাল জেলার পশ্চিম প্রান্তে, পিরোজপুর জেলার সীমান্তে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে সন্ধ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান ছিল, আর থানায় অবস্থান ছিল মূলত রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের। প্রায় এক কোম্পানি রাজাকার সেখানে ছিল।

অন্যান্য জায়গায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল সম্মিলিতভাবে বানারীপাড়ার পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান এবং থানার ওপর একযোগে আক্রমণ চালায়। আলী আহমেদ থানা আক্রমণে অংশ নেন। এখানে কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে আলী আহমেদ খান যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি পুকুর সাঁতরে থানা চত্বরে ঢুকে সেখানে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে সফল হন। এ সময় তাঁর পায়ের গোড়ালিতে রাজাকারদের ছোড়া গুলি লাগলে একজন সহযোদ্ধা তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সেদিন বানারীপাড়া মুক্ত হয়। কয়েকজন রাজাকার এবং থানার পুলিশ আত্মসমর্পণ করে। বাকি রাজাকাররা পালিয়ে যায়। সন্ধ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারাও সেদিন পালিয়ে যায়।

আলী আহমেদ খান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ছুটিতে ছিলেন। ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বরিশালের পতন হলে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধারা কুড়িয়ানায় সমবেত হন। তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। কুড়িয়ানার পর গাবাতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, বেণীলাল দাসগুপ্তসহ কয়েকজন। আলী আহমেদ খান বানারীপাড়া যুদ্ধের আগে ঝালকাঠি, বাবুগঞ্জ, মুলাদী থানা, বাকেরগঞ্জ ও পাতারহাটে যুদ্ধ করেন।

WWW.AMARBOI.COM

আলী নেওয়াজ, বীর প্রতীক

গ্রাম শিবপুর, ইউনিয়ন ফাজিলপুর, সদর, ফেনী।
বাবা ফেলু মিয়া, মা নূর খাতুন। স্ত্রী সাহেদা বেগম।
তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫১। মৃত্যু ১৯৯৮।

গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল একযোগে আক্রমণ চালায় দেওয়ানগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগীদের বিভিন্ন অবস্থানে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলে আছেন আলী নেওয়াজ। তাঁরা আক্রমণ করলেন চিনিকল, থানা, পাওয়ার হাউস, রেলস্টেশন, মাদ্রাসা ও পরিদর্শন বাংলোর ওপর। মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক আক্রমণে চিনিকলে অবস্থানরত রাজাকার ও সশস্ত্র বিহারিরা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই পালিয়ে গেল। পাওয়ার হাউস ও রেলস্টেশনে অবস্থানরত রাজাকার ও সশস্ত্র বিহারিরা কিছুক্ষণ প্রতিরোধ গড়ে তুললেও কয়েক মিনিটের মধ্যে তারাও পালিয়ে যায়। মাদ্রাসায় ছিল রাজাকার ক্যাম্প। মাদ্রাসা ও থানায় অবস্থানরত রাজাকার ও সশস্ত্র বিহারিরা জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলল। তখন মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা বাড়িয়ে দিলেন। আক্রমণের তীব্রতার মুখে রাজাকাররা ভীতসন্ত্রস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে পড়ল। পাঁচজন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। এতে ভেঙে পড়ল প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী বাদবাকি রাজাকার ও সশস্ত্র বিহারিদের মনোবল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে রাতের অন্ধকারে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল।

বাহাদুরাবাদ রেলঘাটের পূর্বে দেওয়ানগঞ্জ জামালপুর জেলার অন্তর্গত একটি থানা। এখানে তখন ছিল চিনিকল, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, পাওয়ার হাউস ও বেশ কিছু পাটগুদাম। ১৯৭১ সালে সেখানে পাকিস্তানি সেনারা স্থায়ীভাবে ছিল না। তারা দিন ও রাতে বাহাদুরাবাদ বা জামালপুর থেকে এসে টহল দিয়ে চলে যেত। দেওয়ানগঞ্জে মোতায়েন ছিল এক কোম্পানি রাজাকার ও অস্ত্রসজ্জিত একদল বিহারি। ২ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধারা দেওয়ানগঞ্জে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে আলী নেওয়াজসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। তাঁদের দুঃসাহসের মুখে পাকিস্তানি সহযোগীদের বেশির ভাগই কোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই পালিয়ে যায়।

আলী নেওয়াজ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন যুদ্ধে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যান ভারতে। পরে যুদ্ধ করেন বৃহত্তর সিলেট জেলার ছাতক, গোয়াইনঘাট, রাধানগর, সালুটিকর, গোবিন্দগঞ্জসহ কয়েকটি জায়গায়।

গোয়াইনঘাটের যুদ্ধে আলী নেওয়াজ যথেষ্ট রণকৌশল ও বীরত্বের পরিচয় দেন। ২ বা ৩ ডিসেম্বর ভোর থেকে গোয়াইনঘাটে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের ধোঁকা দিয়ে কৌশলে তাঁরা সুরমা নদী অতিক্রম করে পাকিস্তানি সেনাদের বাংকার লক্ষ্য করে একের পর এক গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। এতে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। কারণ, নদী অতিক্রম করে ঘাট এলাকা হয়ে পশ্চিম দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ চালানো ছিল পাকিস্তানি সেনাদের কাছে কল্পনাতীত। তারা এ ঘটনার জন্য প্রস্তুতও ছিল না। বিস্মিত পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে পালাতে শুরু করে। সকাল হওয়ার আগেই গোয়াইনঘাট মুক্ত হয়।

AMARBOI.COM

আলী হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম মোনাখালী, সদর, মেহেরপুর। বাবা কানাই শেখ, মা আলফাতুন নেছা। স্ত্রী জোবেদা খাতুন। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৩। গেজেটে নাম ওয়ালিল হোসেন। শহীদ ১২ নভেম্বর ১৯৭১।

আলী হোসেনসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে বাংলাদেশে এসে মুক্ত এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করলেন। হঠাৎ একদিন সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের ক্যাম্প আক্রমণ করল। প্রথমে আর্টিলারির গোলা এসে পড়তে লাগল তাঁদের ক্যাম্পের আশপাশে। তাঁরা দ্রুত অবস্থান নিলেন। একটু পর পাকিস্তানি সেনাদের বড় একটি দল এসে সরাসরি আক্রমণ করে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১২ নভেম্বরে ঘটেছিল ধর্মদহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মদহ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত। ধর্মদহের পূর্ব পাশ দিয়ে একটি রাস্তা মেহেরপুর থেকে উত্তরে প্রাগপুর হয়ে মথুরাপুর সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অবস্থানগত সুবিধার জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ধর্মদহে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা জোরদার হলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ওই এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিতাড়ন করার উদ্যোগ নেয়। তাদের এ পরিকল্পনা মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আগে থেকে জানা সম্ভব হয়নি। ১২ নভেম্বর সকাল নয়টায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল আর্টিলারির সহায়তায় ধর্মদহে আকস্মিক আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা এতে মনোবল না হারিয়ে সাহসের সঙ্গে পাল্টা জবাব দেন। প্রচণ্ড সম্মুখযুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধে আলী হোসেনসহ কয়েকজন অসাধারণ বীরত্ব দেখান। তাঁদের বীরত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে আলী হোসেনের মাথা ও বুকে গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শহীদ হন। তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। সহযোদ্ধারা পরে আলী হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করে ভারতের নদীয়ার করিমগঞ্জ থানায় সমাহিত করেন।

আলী হোসেন আনসার বাহিনীর সদস্য ছিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণও ছিল তাঁর। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন নিজ জেলাতেই (তখন মহকুমা)। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। কুষ্টিয়া যুদ্ধে (৩০ মার্চ-১ এপ্রিল) তিনি অংশ নেন। পরে শিকারপুর সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তিনি তাঁর দলের সঙ্গে বাংলাদেশের ভেতরে আসেন।

AMARBOI.COM

আশরাফ আলী খান, বীর প্রতীক

গ্রাম চট্টি, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। বর্তমান ঠিকানা চৌরঙ্গী মোড়, আকুয়া, ময়মনসিংহ শহর। বাবা আবদুল মমিন খান মোজাহেদী, মা মরিয়ম খাতুন। স্ত্রী জীবুন্নাহার। তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৬৭।

২২ নভেম্বর ১৯৭১। সিলেটের কানাইঘাট এলাকা। অদূরে সুরমা নদী। এর দক্ষিণ তীরে গৌরীপুর। সেখানেই সেদিন অবস্থান নিল মুক্তিবাহিনীর একটি অগ্রবর্তী দল। এই দলে আছেন মুক্তিযোদ্ধা মো. আশরাফ আলী খান। তিনি হেভি মেশিনগানের চালক।

কানাইঘাটে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানি। তারা হঠাৎ প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে গৌরীপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। অতর্কিত এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান বেশ নাজুক হয়ে পড়ে। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। চারদিকে গোলাগুলির তীব্র শব্দ। বারুদের গন্ধ। আর্তনাদ আর চিৎকার। আশরাফ আলী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। মাঝেমধ্যে দেখছেন সহযোদ্ধাদের শহীদ ও আহত হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য। ক্রমে মুক্তিবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। একপর্যায়ে তাঁদের আলফা কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব শহীদ হন। তিনি শহীদ হলে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন লেফটেন্যান্ট লিয়াকত। একপর্যায়ে তিনিও শত্রুর গুলিতে আহত হন। আশরাফ আলী নিজেও শত্রুর গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁর বুকে লাগে দুটি গুলি।

সেদিন গৌরীপুরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। মুক্তিযোদ্ধারা যে গতানুগতিক সম্মুখযুদ্ধেও দক্ষ, সেদিন তাঁরা সেটা তাঁদের নিজেদের শৌর্যবীর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে প্রমাণ করেন। তাঁদের সাহস, মনোবল, বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের কাছে পাকিস্তানি সেনারা হার মানতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি সেনারা গৌরীপুর থেকে পালিয়ে আবার তাদের কানাইঘাট প্রতিরক্ষা অবস্থানে যায়।

আশরাফ আলী খান প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ মধ্যরাতে যশোর সেনানিবাস আক্রান্ত হলে তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে চৌগাছায় মিলিত হন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

আশরাফ আলী খান সিলেটের গৌরীপুর ছাড়াও কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার কোদালকাটি ও কামালপুরের যুদ্ধে (৩১ জুলাই) অংশ নেন। গৌরীপুরে চলা যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনি আহত হন। সহযোদ্ধারা আশরাফ আলী খানকে উদ্ধার করে ভারতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি সুস্থ হন।

AMARBOI.COM

ইনামুল হক চৌধুরী, বীর প্রতীক

গ্রাম সুলতানপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।
বর্তমান ঠিকানা চৌহাট্টা, মহানগর, সিলেট।
বাবা বশিরুল হক চৌধুরী, মা সাবেরা খানম চৌধুরী।
স্ত্রী মারিয়াম চৌধুরী। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫৮।

রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি অবস্থান নিলেন ইনামুল হক চৌধুরীসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। ভোরের আলো ফোটার আগেই তাঁরা শুরু করলেন অতর্কিত আক্রমণ। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ চালায়। তাদের গুলিতে ইনামুল হক চৌধুরীর কয়েকজন সহযোদ্ধা মারা যান। কিন্তু যুদ্ধে কোনো ছেদ পড়ে না। চলে আপ্রাণ লড়াই। পাকিস্তানি সেনারা কিছু এগোয় তো মুক্তিযোদ্ধারা পেছনে যান। মুক্তিযোদ্ধারা একটু এগোলে পাকিস্তানি সেনারা পিছিয়ে যায়। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে প্রকম্পিত পুরো এলাকা। একসময় মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজনকে পাকিস্তানি সেনারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। আটকে পড়া দলে ছিলেন ইনামুল হক চৌধুরী। মুক্তিযোদ্ধাদের আটকাতে পেরে পাকিস্তানি সেনারা উল্লাস করতে থাকে। কেউ কেউ জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'উসকো গুলি মাত করো, উসকো জিন্দা পাকড়াও' ইত্যাদি। তারপর ওরা 'হ্যান্ডস আপ' বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিক থেকে আওয়াজ তোলে। ইনামুল হক চৌধুরী বিচলিত হলেন না। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি সেনাদের ধোঁকা দেওয়ার। চোখের ইশারায় সহযোদ্ধাদের সংকেত দিলেন হাত ওপরে তুলতে। তিনি ও দলের অন্য সদস্যরা হাত ওপরের দিকে তুললেন। এক ফাঁকে তিনি আবার চোখের ইশারায় সহযোদ্ধাদের পাশের নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সেনারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁরা একসঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দেন। ডুবসাঁতার দিয়ে প্রশস্ত সুরমা নদী পার হতে থাকেন। মাঝেমধ্যে মাথা উঁচিয়ে শ্বাস নেন। হতভম্ব পাকিস্তানি সেনারা নদীর বুকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। নদীর ওই পাড়ে পৌঁছে মিনিট পাঁচেক জিরিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে নিরাপদ দূরত্বে যান মুক্তিযোদ্ধারা। সেখানে সহযোদ্ধা নায়েক সুরত আলী ইনামুল হককে ইশারায় জানান, তাঁর পায়ে রক্ত। এতক্ষণ প্রাণ বাঁচাতে দৌড়েছেন ইনামুল হক চৌধুরী। পায়ে গুলি লেগেছে টেরই পাননি। পরনের লুঙ্গি ছিঁড়ে পায়ে বেঁধে দেন সহযোদ্ধারা। সুনামগঞ্জ জেলার ষোলঘর এলাকায় ঘটে এ ঘটনা।

ইনামুল হক চৌধুরী ১৯৭১ সালে ছিলেন টগবগে যুবক। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। পরে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে ভারতে গিয়ে যোগ দেন মুক্তিবাহিনীতে। পাঁচ নম্বর সেক্টরের বালাট সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন তিনি। পরে তাঁকে এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বেশ কটি অপারেশনে তিনি নেতৃত্ব দেন। একবার সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে তিনি তাঁর দল নিয়ে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক সিমেন্ট কারখানা এলাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। সুনামগঞ্জে একটি ডামি আক্রমণের দায়িত্বও পড়ে তাঁর ওপর। এ আক্রমণের উদ্দেশ্যে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের ধোঁকা দেওয়া।

AMARBOI.COM

এ এম মো. ইসহাক, বীর প্রতীক

গ্রাম রাধানগর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা এ এম মো. হোসেন, মা মেহেরুন্নেসা খানম।
স্ত্রী মেহেরুন্নেসা ইসহাক। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩১৬। মৃত্যু ২০১০।

এ এম মো. ইসহাক ১৯৭১ সালে সরকারি চাকরি করতেন। মার্চের উত্তাল সময়ে চাকরির মায়া ত্যাগ করে নিজ এলাকা আখাউড়ায় এসে যুব-তরুণদের সংগঠিত করে স্বাধীনতার পক্ষে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কয়েক দিন পর শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। তখন সংগঠিত যুব-তরুণদের নিয়ে তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। আখাউড়ার পাশে তিতাস নদের অপর পারে ছিল ইপিআর ক্যাম্প। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাঁরা সেখানে যান। সেখানে ছিল বেশ কজন অবাঙালি ইপিআর। তারা তাঁদের ওপর গুলি ছোড়ে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক কয়েকজনের কাছে হালকা অস্ত্র ছিল। তাঁরা পাল্টা গুলি করেন। সারা রাত সেখানে থেমে থেমে যুদ্ধ হয়। সকালে তাঁরা ওই ক্যাম্প দখল করেন। তাঁদের হাতে আসে বেশ কিছু অস্ত্র ও গুলি। মো. ইসহাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগুলো স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করেন। পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আখাউড়া দখল করলে তিনি স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের নিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এর আগে তাঁর নেতৃত্বে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধারা আখাউড়ার খাদ্যগুদাম ও রেলওয়ে জংশনে থাকা ওয়াগন থেকে প্রায় দেড় হাজার মণ চাল সংগ্রহ করে ভারতে নিয়ে যান। এই চাল রান্না করে তিনি নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রতিরোধযোদ্ধাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন।

বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের উদ্যোগে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রম পুনর্গঠিত হলে মো. ইসহাক মুক্তিবাহিনীর সহায়ক বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হন। মুক্তিবাহিনীর ২ ও ৩ নম্বর সেক্টরের কয়েকটি সাব-সেক্টরে অস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। আগরতলার বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয় থেকে সেগুলো দেওয়া হতো। এগুলো সাব-সেক্টরে সরবরাহের কাজ ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। একবার তিনি ট্রাকে করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আর্টিলারির আক্রমণের মুখে পড়েন। পাকিস্তানি কামানের গোলা এসে পড়তে থাকে ট্রাকের আশপাশে। এই গোলার কোনো একটি ট্রাকের ওপর পড়লে তিনিসহ গোটা ট্রাক ধ্বংস হয়ে যেত।

এ এম মো. ইসহাক কয়েকটি ছোটখাটো অপারেশন ও একটি সম্মুখযুদ্ধেও অংশ নেন। মুক্তিবাহিনীর লেফটেন্যান্ট হারুন-উর-রশিদের (পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান) নেতৃত্বে মো. ইসহাকসহ একটি দল আখাউড়ার পাশে একটি রেলসেতু ধ্বংসের অপারেশনে আসে। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে আক্রমণ করে। সেখানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইসহাক অংশ নেন।

WWW.AMARBOI.COM

এ কে এম ইসহাক, বীর প্রতীক

গ্রাম ধল, বাঘারপাড়া, যশোর। বাবা মুজিবুর রহমান, মা মাহমুদা খাতুন। স্ত্রী লুৎফুন্নেছা। তাঁদের ছয় ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯৯। মৃত্যু ২০১০।

প্রকৌশলী এ কে এম ইসহাক ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী পেপার মিলে। ২৫ মার্চের আগেই সেখানে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল সংগ্রাম কমিটি ও ছাত্র-যুবকদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী পেপার মিল এবং রেয়ন মিলের নিরাপত্তা বিভাগে ছিল দেড় শতাধিক থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও বন্দুক। এ কে এম ইসহাক ২৬ মার্চ সেসব অস্ত্র প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিতরণ করেন। তারপর ২৭ মার্চ কাপ্তাইয়ের মদনা ঘাটে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা লেফটেন্যান্ট মাহফুজুর রহমানের (বীর বিক্রম, পরে মেজর) সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধে যোগ দেন।

ইসহাক তাঁর স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে অবস্থান নেন মদনা ঘাট ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবর্তী স্থানে। এপ্রিলে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। ১৩ এপ্রিল কালুরঘাটের পতন হলে তিনি তাঁর দল নিয়ে সমবেত হন খাগড়াছড়িতে। সেখানে আলোচনায় স্থির হয়, মেজর মীর শওকত আলীর (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) সার্বিক কমান্ডে মুক্তিযোদ্ধারা মহালছড়িতে অবস্থান নিয়ে রাঙামাটি-বরকল ও রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়ক এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করবেন। রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব পড়ে এ কে এম ইসহাকের ওপর। তিনি তাঁর দল নিয়ে এ সড়কে বেশ কয়েকবার অ্যামবুশ করেন। এতে হতাহত হয় বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। ২৭ এপ্রিল মহালছড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো দল ও তাদের সহযোগী সশস্ত্র মিজোদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদেরসহ (বীর উত্তম) কয়েকজন শহীদ হন। ইসহাক ও তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধারা এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী সশস্ত্র মিজোদের অনেককে হতাহত করতে সক্ষম হন। পাকিস্তানি সেনা ও সশস্ত্র মিজোদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় তাঁরা রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়ক থেকে রামগড়ে এসে অবস্থান নেন। ২ মে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় সেখানে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ চেষ্টা করেও রামগড় ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। এর মধ্য দিয়ে শেষ হয় ইসহাকের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব।

এরপর ইসহাক চলে যান ভারতে। সাবরুম থেকে সাত কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিণা নামের পাহাড়ি এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করেন। সেই ক্যাম্পই পরে ১ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে রূপ নেয়। জুলাইয়ে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে এ কে এম ইসহাককে ১ নম্বর সেক্টরের কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

WWW.AMARBOI.COM

এ কে এম জয়নুল আবেদীন খান

বীর প্রতীক

গ্রাম ধারাখানা, সদর, ঝালকাঠি। বাবা ছোমেদ আলী খান, মা বেগম চান বুড়ু। স্ত্রী ফেরদৌসী আরা। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩১০। গেজেটে নাম জয়নাল।

১৯৭১ সালের শেষ দিক। রাতে গোপন শিবির থেকে বেরিয়ে পড়লেন এ কে এম জয়নুল আবেদীন খানসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের বেশির ভাগই স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। জলপথে নৌকায় করে পৌঁছালেন লক্ষ্যস্থলে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের পুবাইল-আড়িখোলা রেলস্টেশনের মাঝামাঝি একটি জায়গা। সেখানে আছে ছোট একটি রেলসেতু। রেলপথের দুই পাশের বেশির ভাগ জায়গা জলমগ্ন। সেতুর দক্ষিণে একটি বটগাছ ও বিরাট পাটখেত। বেশ দূরে একটি গ্রাম। রেলপথের আশপাশ জনমানবহীন। মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনের জন্য উপযুক্ত জায়গা এটি। একটু আগে গেছে একটি ট্রেন। দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে আর ট্রেন আসার সম্ভাবনা নেই। পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত শুরু করলেন তাঁদের কাজ। জয়নুল আবেদীনসহ কয়েকজন থাকলেন অপারেশনস্থলে। অন্যরা বিভিন্ন জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থান নিলেন কাট অফ পার্টি হিসেবে। বিস্ফোরকের প্রশিক্ষণ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধারা স্লিপারের নিচের পাথর সরিয়ে বসালেন নিয়ন্ত্রিত মাইন। এক ঘণ্টার মধ্যেই কাজ শেষ হলো।

মুক্তিযোদ্ধারা মাইন থেকে তার টেনে অবস্থান নিয়েছেন একটি পুকুরের পাড়ে। সেখানে পোকামাকড়ের কামড়ে সবাই অতিষ্ঠ। জয়নুল আবেদীন অল্পক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাত শেষে ভোর হয়ে যায়, কিন্তু ট্রেনের দেখা নেই। মুক্তিযোদ্ধারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যত বেলা হবে, তাঁদের সেখানে অবস্থান করা বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। এ সময় শোনা গেল ট্রেনের হুইসেলের শব্দ। তখন আনুমানিক সকাল ছয়টা। সবাই অধীর উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছেন ট্রেন নির্দিষ্ট স্থানে আসার জন্য। ইঞ্জিনের সামনে বালুভর্তি ওয়াগন। বালুভর্তি ওয়াগন চিহ্নিত স্থান অতিক্রম করামাত্র বিস্ফোরক দল মাইনের বিস্ফোরণ ঘটালেন। বিকট শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। কালো ধোঁয়া ও আগুনের কুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠতে লাগল। ইঞ্জিন ও পেছনের কয়েকটি বগি মাইনের বিস্ফোরণে তখন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ইঞ্জিন ও দুটি বগি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। সেগুলো রেলপথ থেকে ছিটকে নিচে গিয়ে পড়ে। ইঞ্জিনের পরের বগিতে ছিল পাকিস্তানি সেনা। তাদের বেশির ভাগই হতাহত হলো। অপারেশন শেষে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন নিরাপদ স্থানে।

জয়নুল আবেদীন খান ১৯৭১-এ ছিলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ২১ এপ্রিল তিনি কৌশলে দেশে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে বৃহত্তর ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় গেরিলাযুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন প্লাটুন কমান্ডার।

WWW.AMARBOI.COM

এ কে এম রফিকুল হক, বীর প্রতীক

পুরাতন কোর্ট রোড, কিশোরগঞ্জ।
বাবা এ কে এম নূরুল হক, মা হাসিনা হক। স্ত্রী শিরিন সুলতানা। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪২। গেজেটে নাম রফিকুল হক।

এ কে এম রফিকুল হক ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল নিজের এলাকা কিশোরগঞ্জ থেকে ভারতে গিয়ে প্রথমে একটি শিবিরে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পর তাঁকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়। আসামের ইন্দ্রনগরে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮।

প্রশিক্ষণ চলাকালেই তিনি ৩০ জনের একটি দলের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে প্রথম অপারেশনে অংশ নেন। তাঁরা সেদিন সিলেটের বড়লেখা চা-বাগানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলের ওপর আক্রমণ করে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে রফিকুল হককে ৪ নম্বর সেক্টরের অধীন গণবাহিনীর (মুক্তিযোদ্ধা) একটি দলের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। জুনে তাঁরা সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের একটি সেতু এবং সিলেটের লাতু রেলস্টেশনের পার্শ্ববর্তী রেলসেতু বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করেন। সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কে তাঁদের পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরিত হয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি জিপ ধ্বংস হয়। ওই বিস্ফোরণে পাকিস্তানি এক ক্যাপ্টেন ও দুজন সেনাও নিহত হয়।

এরপর তাঁরা কালীগঞ্জ বাজারে রাজাকার ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ করে ১৭টি রাইফেল ছিনিয়ে নেন। ২১ জুন শরিফপুর বাজারের পার্শ্ববর্তী রেলসেতু ও বরাক নদের মাটির বাঁধের অংশবিশেষ বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করেন। এর ফলে সিলেটের সঙ্গে জকিগঞ্জের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২৯ জুন তাঁরা জকিগঞ্জের আটগ্রামে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে দুজন তাঁদের হাতে ধরা পড়ে।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি ৩ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। ডিসেম্বরের শুরুতে তাঁরা মিত্রবাহিনীর সঙ্গে আখাউড়ায় আসেন। আখাউড়ার যুদ্ধে এ কে এম রফিকুল হক সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

এ টি এম খালেদ, বীর প্রতীক

স্কুল লেন, মধ্যপাড়া, সদর, গাইবান্ধা।
বাবা গোলাম মওলা প্রামাণিক, মা রেজিয়া খাতুন।
অবিবাহিত। ১১ জানুয়ারি ১৯৮০ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষে নিহত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪০৩।

এ টি এম খালেদ দুলু ১১ নম্বর সেক্টরের মানকারচর সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ভারতের দেরাদুনে প্রশিক্ষণ নেন। যুদ্ধ করেন কুড়িগ্রাম জেলার কোদালকাটি, চিলমারীসহ কয়েকটি জায়গায়। ১ অক্টোবর সুবেদার আলতাফের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল কোদালকাটির পাকিস্তানি অবস্থানে একযোগে আক্রমণ চালায়। একটি দলে ছিলেন এ টি এম খালেদ। দু-তিন দিন সেখানে যুদ্ধ হয়। ৩ অক্টোবর দুপুরের পর পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান থেকে গোলাগুলি থেমে যায়। বিষয়টি মুক্তিযোদ্ধাদের চিন্তায় ফেলে। এ অবস্থায় খালেদসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কলাগাছের ভেলায় করে নদী পার হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে যান। গিয়ে দেখেন, সেখানে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা নেই। পাকিস্তানি সেনাদের গোটা প্রতিরক্ষাব্যূহ খাঁ খাঁ করছে। চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাকিস্তানি সেনাদের দেখা গেল না। তাঁরা বুঝতে পারলেন, পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেছে।

১৭ অক্টোবর চিলমারীতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালান। এ টি এম খালেদ ও কাজিউল ইসলাম ছিলেন একটি দলের নেতৃত্বে। তাঁরা জোড়গাছ স্কুলের পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালান। তাঁদের প্রচণ্ড আক্রমণে সেখানকার পাকিস্তানি সেনারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা পালিয়ে তাদের মূল ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়। খালেদ এক পাকিস্তানি সেনাকে আটক করেন। তাকে পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম এ হালিম, বীর প্রতীক

গ্রাম টেংরাটিলা, ইউনিয়ন সুরমা, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ। বাবা মো. আবদুল কুদ্দুস, মা জোবেদা খাতুন। স্ত্রী সুরাইয়া বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫৭।

'সহযোদ্ধা আবদুল লতিফ রাতভর যুদ্ধ করে ক্লান্ত। আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি কবরে। একসময় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরে অস্ত্রসহ ধরা পড়েন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে। লতিফকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্য দেখছে সাধারণ মানুষ। আর আমি অস্ত্র লুকিয়ে রেখে মিশে আছি জনতার কাতারে। লতিফ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। পাল্টা আক্রমণ করে যে তাকে উদ্ধার করব, সে উপায়ও নেই। সেদিন তাকে রক্ষা করতে পারিনি। তার সেই ভয়ার্ত মুখ, বাঁচার করুণ আকুতি এখনো আমার মনে পড়ে।' বললেন মুক্তিযোদ্ধা এম এ হালিম (৬০)। ১৪ ডিসেম্বর এ ঘটনা ঘটেছিল ছাতকের গোবিন্দগঞ্জ এলাকায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের ঘিরে ফেলেন। সন্ধ্যায় শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ, চলে সারা রাত। দোয়ারাবাজারের বাঁশতলা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আবদুল লতিফ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ভোরে অস্ত্রসহ পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন তিনি।

এম এ হালিম শেলা সাব-সেক্টরের একটি কোম্পানির প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। তাঁরা 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতেন। পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতেন। এরপর পাকিস্তানি সেনারা একনাগাড়ে গুলি চালাত। তাদের গুলি থামলে তাঁরা আবার গুলি করতেন। তিনি দোয়ারাবাজারের টেংরাটিলা, নরসিংহপুর, আলীপুর, হাছনবাহার, বালিউড়া, ছাতকের হাদাটিলা ও [illegible]টিলা এলাকায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। ১৩ অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের জাউয়া সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অপারেশনের এক দিন আগে দুই মুক্তিযোদ্ধাকে মাদ্রাসার ছাত্র সাজিয়ে তাঁদের সঙ্গে কুলি হিসেবে জাউয়া সেতু রেকি করতে যান তিনি। সেতুর ওপর গিয়েই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা তর্কাতর্কি শুরু করেন। এ সময় কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা তাঁদের কাছে এসে কী হয়েছে, জানতে চায়। ছাত্রবেশী দুই মুক্তিযোদ্ধা তাঁকে দেখিয়ে বলেন, 'এই কুলির বাচ্চা বলেছিল মালপত্র নিয়ে মাদ্রাসা পর্যন্ত যাবে। এখন মাঝপথে এসে বলছে, যাবে না।' এর ফাঁকে তিনি পুরো সেতু রেকি করে ফেলেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে ধমক দিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। পরদিন সেতুটি তাঁরা ধ্বংস করেন। এই সফল অপারেশনের পর সেক্টর কমান্ডার তাঁদের পুরস্কৃত করেন। পরে তাঁকে ছাতক-গোবিন্দগঞ্জ সড়কের আরেকটি সেতু উড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এম এ হালিম ১৯৭১ সালে সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এলাকার কয়েকজন ছাত্র-যুবককে নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের রেঙ্গুয়া বাজারে গিয়ে তাঁরা নাম লেখান মুক্তিবাহিনীতে। ইকো-১ ট্রেনিং সেন্টারে এক মাসের ট্রেনিং শেষে তাঁদের পাঠানো হয় ৫ নম্বর সেক্টরের বালাট সাব-সেক্টরে। সেখানে এক যুদ্ধে আহত হন তিনি। বালাট এলাকা সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। পরে তাঁদের নিজেদের এলাকায় পাঠানো হয়। তাঁদের মোট ৭৩ জন শেলা সাব-সেক্টরে এসে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম মিজানুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম বড় মোকাম, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ। বর্তমানে কানাডাপ্রবাসী। বাবা মজিবর রহমান, মা সুফিয়া খাতুন। স্ত্রী গুলশান আরা। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩০। গেজেটে নাম মিজানুর রহমান মিয়া।

১৫ নভেম্বর এম মিজানুর রহমান সহযোদ্ধাদের নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল পাকিস্তানি সেনারা। মিজানুর রহমান তাঁর সহযোদ্ধাদের আক্রমণ আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন। সহযোদ্ধারা আবারও বড় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ সময় আহত হলেন তাঁদের অধিনায়ক। এদিন আক্রমণে ছিল মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মিজানুর রহমান। সব দলের সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর আবু তাহের (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।

১৪ নভেম্বর রাত তিনটা বা সাড়ে তিনটার দিকে তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের তিন পাশে অবস্থান নেন। এর আগে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু ওই গোলাবর্ষণে পাকিস্তানি সেনাদের শক্তিশালী বাংকারের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ভোর সাড়ে পাঁচটা বা তার পর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ শুরু করে সামনে এগোতে থাকেন।

এম মিজানুর রহমান তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে গুলি করতে করতে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের একদম কাছে চলে যান। তাঁদের তীব্র আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তাঁর অধিনায়ক মেজর আবু তাহের বিজয় আসন্ন ভেবে এগিয়ে যান। তখন আনুমানিক সকাল নয়টা। তখন তাঁর সামনে শত্রুর ছোড়া একটি শেল বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরিত শেলের স্প্লিন্টারের আঘাতে আবু তাহের আহত হন এবং পড়ে যান। এ দৃশ্য দেখে সেখানে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন। আবু তাহেরের আহত হওয়ার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় এম মিজানুর রহমান দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায়ই মুক্তিযোদ্ধারা আবার মনোবল ফিরে পান এবং যুদ্ধ করতে থাকেন। আবু তাহের আহত হওয়ার পর এম মিজানুর রহমানই ওই যুদ্ধে সার্বিক নেতৃত্ব দেন।

১৯৭১ সালে এম মিজানুর রহমান ঢাকায় একটি বিদেশি ব্যাংকে (আমেরিকান এক্সপ্রেস) কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে চাকরিতে আর যোগ না দিয়ে তিনি ভারতে চলে যান। পরে যোগ দেন মুক্তিবাহিনীর প্রথম বাংলাদেশ অফিসার্স ওয়ার কোর্সে। প্রশিক্ষণ শেষে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে একটি কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন। পরে চাকরি নেন সোনালী ব্যাংকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস এম নুরুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম মুক্তারকুল, বাংলাবাজার, ইউনিয়ন ঝিলংজা, সদর, কক্সবাজার। বাবা শফিকুল হক মাস্টার, মা ছমুদা খাতুন। স্ত্রী জাহান আরা বেগম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৮২। গেজেটে নাম হক।

রাত ১০টার দিকে একটি যুদ্ধবিমান (অটার) ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিমাপুর বিমানঘাঁটি থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। বিমানে আছেন এস এম নুরুল হকসহ আরও তিনজন। অন্য দুজন বৈমানিক। তাঁদের উদ্দেশ্য, পতেঙ্গায় অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র তেল শোধনাগারটি ধ্বংস করে দেওয়া। মনে প্রচণ্ড সাহস আর উত্তেজনা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন চরম ঝুঁকিপূর্ণ ওই অপারেশন সফল করার জন্য। রাত দুইটার দিকে তাঁরা পতেঙ্গার কাছাকাছি পৌঁছে বিমান থেকে তেল শোধনাগারে হামলার জন্য রকেট, বোমা ও মেশিনগান প্রস্তুত করেন। পরিকল্পনামতো দ্রুতই তাঁরা কাজটি সেরে ফেলেন। পাকিস্তানি সেনারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকে শোধনাগারটি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এরপর ওই যুদ্ধবিমান লক্ষ্য করে নিচ থেকে শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের অবিরাম গুলিবর্ষণ। পাকিস্তানি সেনাদের বিমানবিধ্বংসী কামান থেকে ছোড়া মুহুর্মুহু গুলির মুখে বিমান চালনা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লে সাগরপথ ধরে (বঙ্গোপসাগর) তা চলতে শুরু করে। তারপর ফেনী সীমান্ত দিয়ে ভারতের আসামের কোম্ভিগ্রাম বিমানঘাঁটিতে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে। তখন ভোর পাঁচটা। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বরের।

এস এম নুরুল হক ছিলেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একজন সদস্য। তিনি মুক্তিযুদ্ধে আরও কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন।

১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানের সারগোদা বিমানঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন। ১ জুন সেখান থেকে পালিয়ে দেশে চলে আসেন। ১১ জুন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ১ নম্বর সেক্টরে রণকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হলে তিনি সেখানে ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দেন।

১৯৭৭ সালে এস এম নুরুল হক বিমানবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াকার হাসান, বীর প্রতীক

৯ রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা। বাবা এ এইচ এম হাবিবুল ইসলাম, মা শামসুন নাহার। স্ত্রী মাহমুদা আক্তার। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫।

২৬ নভেম্বর ১৯৭১। সিলেট জেলার কানাইঘাট এলাকা। শীতের দিন। ভোর আনুমানিক সাড়ে চারটা বা পাঁচটা। চারদিকে সুনসান নীরবতা। এ সময় প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট অতর্কিতে আক্রমণ চালায় মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেলটা কোম্পানির একাংশের ওপর। তাদের আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর ডেলটা কোম্পানির ১১ নম্বর প্লাটুন (এটি গৌরীপুরের সর্বদক্ষিণে ছিল) প্রায় বিধ্বস্ত হয়। এই প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন সুবেদার মুসা। তাঁর বাঁ দিকে কয়েক শ মিটার দূরের অবস্থানে ছিলেন লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসান। তিনি ওয়্যারলেসে খবর পেয়ে ২৩-২৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ঝোড়োগতিতে ১১ নম্বর প্লাটুনের অবস্থানে এসে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের নাকের ডগার মধ্যে ঢুকে পড়েন।

এ রকম অবস্থায় সম্মুখযুদ্ধ বা হাতাহাতি ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। ঘণ্টা কয়েক ধরে চলে তা। ওয়াকার হাসান ও তাঁর সহযোদ্ধাদের দুঃসাহস ও বীরত্বে পাকিস্তানি সেনারা শেষ পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে পড়ে। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা যখন ব্যাপক হারে নিহত বা আহত হচ্ছিল, তখন তারা পালাতে থাকে। পালানোর সময় নিহত হয় ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর সারওয়ার। সেদিনের যুদ্ধে ওয়াকার হাসান অসাধারণ নৈপুণ্য ও বীরত্বের পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্রায় ৮৮ জন সেনা নিহত এবং ২৬ জন বন্দী হয়।

AMARBOI.COM

কানাইঘাটে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। ২৪-২৫ নভেম্বর সেখানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছিল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকটি কোম্পানির সমন্বয়ে গড়ে তোলা মুক্তিবাহিনীর একটি বড় দল। এই বাহিনীভুক্ত ডেলটা কোম্পানির ১২ নম্বর প্লাটুনের কমান্ডার ছিলেন ওয়াকার হাসান।

কানাইঘাটের চারপাশে বেশ কয়েকটি গ্রাম—গৌরীপুর, বড় চাতাল, ডালিয়ার চর প্রভৃতি। উত্তর-পূর্বে আনন্দ বিল নামে ছিল একটি ছোট বিল। মাঝ দিয়ে বহমান সুরমা নদী। ২৪-২৫ নভেম্বরেও পাকিস্তানি সেনারা গৌরীপুরে অতর্কিতে মুক্তিবাহিনীর আলফা কোম্পানির ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। ফলে সেখানে সংঘটিত হয়েছিল প্রচণ্ড যুদ্ধ।

ওয়াকার হাসান ১৯৭১ সালে রাজশাহী প্রকৌশল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে যান। সেখানে একটি শিবিরে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় তিনি প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে জেড ফোর্সের প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি বৃহত্তর সিলেটের শ্রীমঙ্গল, পাত্রখোলা, হোসনাবাদ, চারগ্রাম, এমসি কলেজসহ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াজিউল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম বজরা (মুহুরিবাড়ি), ইউনিয়ন বজরা, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। বাবা নূর আলী, মা হাসমতের নেছা। স্ত্রী মনোয়ারা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২০৩।

সীমান্ত এলাকায় টহল দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে এক আমবাগানে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ঢুকেছেন ওয়াজিউল্লাহ ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা। এ সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অতর্কিতে আক্রমণ করল। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে যে যেভাবে পারলেন নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিলেন। ওয়াজিউল্লাহ আশ্রয় নিলেন একটি মোটা গাছের আড়ালে। গুলির শব্দে গোটা এলাকা তখন প্রকম্পিত। সহযোদ্ধারা কে কোথায়, তিনি জানেন না। পাল্টা গুলির শব্দও পাচ্ছেন না। গাছের আশপাশ দিয়ে গুলি ছুটে যাচ্ছে। কয়েকটি গুলি তাঁর নিজের গা ঘেঁষে গেছে। একটু নড়াচড়া করলেই নিশ্চিত মৃত্যু। তার পরও ওয়াজিউল্লাহ ভাবলেন, কিছু একটা করতে হবে। মরতে যদি হয়ই, বীরের মতো লড়াই করেই মরবেন। একটু পর অনেক কষ্টে গাছের গোড়ায় অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে একাই পাল্টা আক্রমণ চালালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনাদের দিক থেকে গুলি কমতে থাকল। এতে তাঁর সাহস আরও বেড়ে গেল। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরের কোনো এক দিনের। ঘটনাস্থল মুজিবনগর আম্রকাননে।

মুজিবনগর মেহেরপুরের অন্তর্গত। বর্তমানে উপজেলা। জেলা সদর থেকে দক্ষিণে। তখন এ জায়গার নাম ছিল বৈদ্যনাথতলা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মেহেরপুরে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি ছিল মুজিবনগরে। পাকিস্তানি সেনারা প্রায়ই সেখানকার আম্রকাননে হামলা চালাত। সেদিন বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা মুজিবনগরে টহল দিতে এসে কয়েকজন থেকে যায়। তারা আম্রকাননে ওত পেতে ছিল। ওয়াজিউল্লাহর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষুদ্র টহল দলের সদস্যরা সে খবর জানতেন না। তাঁরা দূরবর্তী এলাকায় টহল দিয়ে আম্রকাননে ঢোকামাত্র পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আক্রান্ত হন। পরে তিনি একাই পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফলে বেঁচে যান তাঁর সহযোদ্ধারা।

ওয়াজিউল্লাহ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ইপিআর উইংয়ের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের লালবাজার সাব-সেক্টরের অধীনে। এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন এ আর আযম চৌধুরী (বীর বিক্রম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। মুজিবনগর, সোনাপুর, ভবেরপাড়া, বল্লভপুর, বাগোয়ানসহ কয়েকটি জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেন। একবার পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল মুজিবনগরের পার্শ্ববর্তী বল্লভপুরে মিশনারি চার্চে হামলা করে। তখন ওয়াজিউল্লাহ কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে তারা পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধের খবর তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াজেদ আলী মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম মোল্লাকান্দি, শিবচর, মাদারীপুর। বাবা সাহেব উদ্দীন মাতুব্বর, মা ছুটু বিবি। স্ত্রী সামসুন নাহার। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯০।

ওয়াজেদ আলী মিয়া বারকিসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা রাতের অন্ধকারে ভারত থেকে ঢোকেন বাংলাদেশের ভেতরে। কয়েক মাইল হেঁটে পৌঁছান নির্জন রেললাইনের ধারে। সেখানে আশপাশে জনবসতি নেই। দ্রুত রেললাইনের নিচে অ্যান্টি ট্যাংক মাইন পুঁতে বৈদ্যুতিক তার লাগিয়ে তা টেনে নিলেন প্রায় ৩০০ গজ দূরে। দেড়-দুই ঘণ্টার মধ্যেই কাজ শেষ। তারপর ভোরের আলো ফুটে উঠল। কয়েক ঘণ্টা পর শোনা গেল ইঞ্জিন টানা ট্রেনের শব্দ। ইঞ্জিনটি ধীরগতিতে চিহ্নিত স্থান অতিক্রম করামাত্র রিমোট কন্ট্রোলের সুইচ টিপে বিস্ফোরণ ঘটালেন মুক্তিযোদ্ধারা। একই সময় গর্জে উঠল তাঁদের প্রত্যেকের হাতের অস্ত্র। মুকুন্দপুরে এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরে।

মুকুন্দপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় মুকুন্দপুরে ট্রেনের ইঞ্জিন ও কয়েকটি বগি ধ্বংস করেন। তাঁরা খবর পেয়েছিলেন, সেদিন ট্রেনে একদল পাকিস্তানি সেনা থাকবে। এ খবর পেয়ে একদল মুক্তিযোদ্ধা মুকুন্দপুরে সেই ট্রেন অ্যামবুশ করেন। এই দলে ছিলেন ওয়াজেদ আলী মিয়া। তিনি ছিলেন বিস্ফোরক দলের প্লাটুন কমান্ডার। মাইন লাগানোর পর এর সঙ্গে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ ঘটিয়ে তা টেনে নেওয়া হয় ৩০০ গজ দূরে। সেখানে ছিল রিমোট কন্ট্রোল। এ পদ্ধতি তাঁরা আগে প্রয়োগ করেননি। সেদিনই প্রথম প্রয়োগ করেন। ওই দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় এক কোম্পানি সেনা আখাউড়া থেকে মুকুন্দপুর হয়ে হরষপুর যাচ্ছিল। মাইন বিস্ফোরণে ট্রেনের ইঞ্জিন ও কয়েকটি বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুজন কর্মকর্তাসহ প্রায় ২৭ জন সেনা নিহত হয়। এ ঘটনার দিন কয়েক পর মুক্তিযোদ্ধারা খবর পান, বিধ্বস্ত ইঞ্জিন এবং ক্ষতিগ্রস্ত বগি ও ওয়াগন সরিয়ে নেওয়ার জন্য সেখানে একটি ক্রেন নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা অপেক্ষা করছে। এ খবর পেয়ে ওয়াজেদ আলী মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা ১৯ সেপ্টেম্বর আবার তিনটি রকেট নিয়ে সেখানে যান। কিন্তু তখন ক্রেনটি সেখানে ছিল না। বিধ্বস্ত ইঞ্জিন ও ক্ষতিগ্রস্ত ওয়াগন রেললাইনে দাঁড় করানো ছিল। পাশে একদল পাকিস্তানি সেনাকে প্রহরারত অবস্থায় দেখা যায়। ওয়াজেদ আলী মিয়া মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে দুজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে সাহসের সঙ্গে ইঞ্জিনের ২৫ গজের মধ্যে গিয়ে রকেটের সাহায্যে ইঞ্জিনটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেন। নির্ভুল নিশানায় ইঞ্জিনের মাঝবরাবর রকেট বিস্ফোরিত হয়।

ওয়াজেদ আলী মিয়া চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে চাকরিরত ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরের কলকলিয়া/বামুটিয়া সাব-সেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে। একটি যুদ্ধে তিনি সামান্য আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী জয়নুল আবেদীন, বীর প্রতীক

গ্রাম দেবীশিবপুর, সেনবাগ, নোয়াখালী। বর্তমান ঠিকানা ৩২/এ সড়ক-২, পুরাতন ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা। বাবা কাজী মো. হারিছ মিয়া, মা আছিয়া খাতুন। স্ত্রী মালেকা পারভীন। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৮৫। গেজেটে নাম জয়নাল আবেদীন।

১৪ নভেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী। তাঁদের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সেনাও মুক্তিযোদ্ধাদের মতো পোশাক পরে এই যুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন কাজী জয়নুল আবেদীন। সেদিনের আক্রমণে তিনি তাঁর কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অবস্থান নেন রাস্তার পূর্ব পাশে। পশ্চিম পাশে ছিল তাঁদের আরেক কোম্পানি। মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিলেন ছাত্র ও যুবক। তাঁরা রাতে সেখানে অবস্থান নেন। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই দেখা গেল সামনেই পাকিস্তানি বাংকার। তখনই বাংকারে আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হলো মুক্তিযোদ্ধাদের। পেছন দিক থেকে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর আর্টিলারি শেলিং চলছিল। ওয়্যারলেসে জানানো হলো, আর্টিলারি শেলিং বন্ধ হলে মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী দল শত্রুর বাংকার আক্রমণ করবে। মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরের নতুন অধিনায়ক আবু তাহের মিত্রবাহিনীর সঙ্গে কমান্ড পোস্টে ছিলেন। এ সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের কাছে এসে রাস্তার ঢালের পশ্চিম দিকে মুখ করে বসেন। তখন হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া একটি আর্টিলারি শেল সেখানে এসে পড়ে। শেলের একটি টুকরা আবু তাহেরের পায়ে লাগে। তাঁর পা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কাজী জয়নুল আবেদীনের চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটে। এতে বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। ফলে তাঁদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা পেছন থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ঘিরে ফেলে। এতে কার্যত পাকিস্তানি সেনারা তাদের ক্যাম্পের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে। অবশেষে ৩ ডিসেম্বর সহযোগী রাজাকারসহ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ১৫০ জন বালুচ সেনা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কামালপুর পতনের পর কাজী জয়নুল আবেদীন তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে যান জামালপুরের দিকে।

কাজী জয়নুল আবেদীন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশে কিছু একটা ঘটতে পারে অনুমান করে তিনি ছুটি নিয়ে ৩ মার্চ পাকিস্তান থেকে দেশে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের আগরতলায় যান তিনি। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে মুক্তিবাহিনীর জেড ব্রিগেডের অধিনায়ক জিয়াউর রহমানের অনুরোধে তিনি ওই ব্রিগেডে যোগ দেন। সেখানে তাঁকে স্টোরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ কাজে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি। মৃত্যুঝুঁকি আছে জেনেও তাঁর মন পড়ে ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, সে জন্য পরে মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার মহেন্দ্রগঞ্জে যোগ দেন। এরপর তাঁকে একটি কোম্পানির কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে এস এ মহিউদ্দিন মানিক

বীর প্রতীক

বানারীপাড়া, বরিশাল। বাবা কাজী মনোয়ার হোসেন, মা আনোয়ারা বেগম। স্ত্রী কামরুন্নাহার নাজনীন। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮৭।

পাকিস্তানি বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েক দিন আক্রমণ ও সফল অভিযান চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ ক্লান্ত। একদিন রাতে তাঁরা অবস্থান নেন একটি খালে ভাসমান নৌকায়। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত থাকায় কয়েকজন ছাড়া সবাই নৌকায় ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের নেতৃত্বে শাহজাহান ওমর। এই দলের একজন সদস্য কে এস এ মহিউদ্দিন মানিক। ভোরে দুজন লোক সেখানে এসে তাদের জানায়, তাদের গ্রামে একদল পাকিস্তানি সেনা অবস্থান করছে।

নৌকায় থাকা মুক্তিযোদ্ধারা কোনো চিন্তা না করেই ওই গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করেন। গ্রামে ঢুকে বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন জ্বলতেও দেখেন তাঁরা। কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। ভোরের আলো তখনো পুরোপুরি ফোটেনি। হঠাৎ মানিক দেখতে পান কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাকে। তারা জঙ্গলের ভেতর শুয়ে আছে, তাদের মাথার হেলমেট চিকচিক করছে।

কে এস এ মহিউদ্দিন মানিক তাদের দেখে সহযোদ্ধা জিয়াউদ্দিনকে এ কথা বললে তিনি প্রথমে তা বিশ্বাস করেননি। এর পরই তাঁরা খালের ওপর সাঁকোর পাশে পাকিস্তানি সেনাদের দেখলেন। খালের দুই পাড়ে চারটি স্থানে তাদের মর্টারের অবস্থান। মানিক সঙ্গে সঙ্গে সহযোদ্ধা জিয়াউদ্দিনের কাছে থাকা মর্টারে গোলা ভরে দিলেন। তিনি মর্টার চার্জ করলে তা পাকিস্তানি সেনাদের মর্টারের অবস্থানে গিয়ে পড়ে। এরপর চলতে থাকে সম্মুখযুদ্ধ।

সংবাদ পেয়ে আশপাশে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দলও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। দিনব্যাপী যুদ্ধ চলে। অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকার এ যুদ্ধে মারা যায়। কিছুসংখ্যক পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও তাদের অধিকাংশই জনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। গ্রামের মহিলারাও দা দিয়ে কুপিয়ে তাদের হত্যা করে। সেদিনের যুদ্ধে মানিকের কপালের ডান দিকে গুলি লাগে। তিনি আহত হন। তাঁর সহযোদ্ধা আউয়াল শহীদ হন। ঘটনাটি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বরে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার চাচৈর গ্রামে।

কে এস এ মহিউদ্দিন মানিক ১৯৭১ সালে মা-বাবার নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২৫ এপ্রিল বরিশাল পুলিশ লাইন থেকে পাওয়া অস্ত্র নিয়ে চলে যান বানারীপাড়ায়। সেখানে কয়েকজন মিলে মুক্তিবাহিনীর একটি দল গঠন করেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁরা সাব-সেক্টর কমান্ডার শাহজাহান ওমরের দলে একীভূত হন। এর পর থেকে তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ করেন। ৮ ডিসেম্বর তাঁরা বাকেরগঞ্জ থানা মুক্ত করেন। সেদিন তিনি আবার আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দকার সাইদুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম ঘোষভিলা, ইউনিয়ন জামজামি, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। বাবা খন্দকার আবদুল নূর, মা সাজেদা খাতুন। স্ত্রী নাদিরা পারভীন। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৭০। গেজেটে নাম সাইদুর রহমান।

খন্দকার সাইদুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা এফইউপিতে পৌঁছে অ্যাসল্ট ফরমেশন তৈরির আগেই শুরু হলো গোলাবর্ষণ। সেই গোলার কিছু অংশ তাঁদের ওপর এসে পড়তে থাকে। অন্যদিকে মুষলধারে বৃষ্টি। এতে তাঁদের মধ্যে একধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা কামালপুরে ঘটে ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাই।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রাম কামালপুর। খন্দকার সাইদুর রহমান প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে গেলেন সামনে। এ সময় তাঁর অধিনায়ক সালাহ্উদ্দীন মমতাজ শহীদ হন। এতে শোকের ছায়া নেমে আসে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে। নেতৃত্বশূন্যতায় তাঁদের কেউ কেউ পিছু হটতে থাকেন। কিন্তু সাইদুর রহমানসহ কয়েকজন যোদ্ধা পিছু হটেননি। তাঁরা বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। সুরক্ষিত বাংকার থেকে পাকিস্তানি সেনারা বৃষ্টির মতো গুলি করছিল। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। পরে সেখানে শুরু হয় হাতাহাতি যুদ্ধ। দেখতে দেখতে জায়গাটা ভরে যায় লাশের পর লাশে। একসময় সাইদুর রহমানও আহত হন। তাঁর পেটে গুলি লাগে। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করাও সম্ভব ছিল না। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ সেখানে ছিলেন না। তিনি ক্ষতস্থান চেপে ধরে অনেক কষ্টে পেছনে চলে যান। সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে ফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে গুয়াহাটির হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়।

সাইদুর রহমান ১৯৭১ সালে যশোর ইপিআর সেক্টরে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখানকার বাঙালি ইপিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সাইদুর রহমান ছিলেন ৬ পাউন্ডার গান (ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র) ইউনিটের সদস্য। ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় সাঁজোয়া গাড়িতে পাকিস্তানি সেনারা চাঁচড়ায় আসছিল। তখন তাঁরা তাদের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁদের গোলার আঘাতে দুটি গাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এর আগে ২৩ মার্চ যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিরোধযুদ্ধের পর তিনি ভোমরা প্রতিরক্ষাব্যূহে ছিলেন। জুনের প্রথমার্ধে তাঁকে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি ডি কোম্পানির ১১ নম্বর প্লাটুনে ছিলেন। সিলেটের কানাইঘাট ও সালুটিকরেও তিনি যুদ্ধ করেন।

খন্দকার সাইদুর রহমান বিডিআরের চাকরি থেকে ২০০৬ সালে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খলিলুর রহমান, বীর প্রতীক

উত্তর সাতপাই, নেত্রকোনা শহর।
বাবা আবদুস ছোবহান খান, মা সখিনা খানম।
স্ত্রী রেহেনা খানম।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৯।

হঠাৎ গোলাগুলির শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী (৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট) মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে অতর্কিতে আক্রমণ করে। খলিলুর রহমান এবং তাঁর সহযোদ্ধারা দ্রুত অবস্থান নেন। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ।

১৯৭১ সালে এ ঘটনা ঘটেছিল ফেনী জেলার বিলোনিয়ায়। নভেম্বরের প্রথম এবং বাংলা কার্তিক মাসের শেষ দিকের ঘটনা। রাতে হালকা শীত। কয়েক দিন ধরে চলছে মুষলধারে বৃষ্টি। তার মধ্যেই প্রচণ্ড যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হয়েছে ২ নভেম্বর। বিলোনিয়া ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকা। এ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ১ নম্বর সেক্টরের একটি কোম্পানিকে তলব করা হয়। এ কোম্পানিতে ছিলেন খলিলুর রহমান। নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান।

বিলোনিয়া মুক্ত হওয়ার পথে ৬ নভেম্বর তাঁরা সলিয়াদিঘিতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিলেন। তাঁদের সঙ্গে আছে আরও কয়েকটি কোম্পানি। ৭ নভেম্বর। ভোর আনুমানিক সাড়ে চারটা। খলিলুর রহমানসহ সবাই যে যাঁর প্রতিরক্ষা অবস্থানে। কয়েক দিনের যুদ্ধে তাঁরা পরিশ্রান্ত। কেউ ঘুমিয়ে, কেউ বা আধো ঘুমে। জেগে আছেন মাত্র কয়েকজন।

মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন ইপিআরের একদল যোদ্ধা। তাঁদের নেতৃত্বে হাবিলদার শহীদ। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তীব্র আক্রমণের মুখে তাঁদের সে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। শহীদসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাকিস্তানি সেনারা আটক করে। পরে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের হত্যা করে।

হাবিলদার শহীদের প্লাটুন পরাজিত হলেও সেখানে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। খলিলুর রহমান ও তাঁর অন্য সহযোদ্ধারা সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। আনুমানিক বেলা তিনটায় দুটি পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান তাঁদের অবস্থানের ওপর হামলা চালায়। কিন্তু এতেও তাঁরা পিছপা হননি। একপর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে শুরু হয় হাতাহাতি যুদ্ধ। এরপর পাকিস্তানি সেনারা তাদের ৩০ জনের মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে যায়।

খলিলুর রহমান ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষণরত ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁরা আক্রান্ত হন। তাঁদের বেশির ভাগ সেদিন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে শহীদ হন। কিছুসংখ্যক যোদ্ধা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। খলিলুর রহমান সলিয়াদিঘি ছাড়াও ফেনী জেলার ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া, গুতুমা, বল্লভপুর, শুভপুর, পরশুরাম, চম্পকনগরসহ আরও কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খসরু মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম রতনপুর, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
বাবা রুকুনুদ্দীন মিয়া, মা খ্যাতিমন।
স্ত্রী হালিমা খাতুন। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪২৪। মৃত্যু ১৯৮১।

খসরু মিয়া টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল এলাকার এক কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরোতে পারেননি। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর টাঙ্গাইলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ছাত্র-যুবক-জনতার সমন্বয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে। খসরু মিয়াও এ বাহিনীতে যোগ দেন। পরে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দিয়ে খোরশেদ আলম তালুকদারের তত্ত্বাবধানে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেন। খোরশেদ আলম কাদেরিয়া বাহিনীর একটি কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন।

খসরু মিয়া ৭ আগস্ট টাঙ্গাইলের কালিহাতী থানার (বর্তমানে উপজেলা) শয়া পালিমায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল ও তাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শয়া পালিমা ছাড়াও টাঙ্গাইলের গোপালপুর, ভূঞাপুর, ধলাপাড়া, বানিয়াপাড়া ও পাবনার নগরবাড়ীতে তিনি পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কাদেরিয়া বাহিনীর খোরশেদ আলম তালুকদারের কোম্পানিতে তিনি গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন।

AMARBOI.COM

খায়রুল জাহান, বীর প্রতীক

খড়মপট্টি, শোলাকিয়া, জেলা শহর, কিশোরগঞ্জ।
বাবা আবদুল হাই তালুকদার, মা শামসুন্নাহার।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৩১৯।
শহীদ ২৬ নভেম্বর ১৯৭১। গেজেটে নাম খায়রুল।

১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার চরপুমদী বাজারসংলগ্ন প্যারাডাঙ্গা পুলের কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী মুজাহিদ ও রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় ধরনের এক যুদ্ধ হয়। তখন খায়রুল জাহানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট একটি দল সেখানে অবস্থান করছিল। সেদিন মুজাহিদ আর রাজাকাররা মিলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। এ অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড সম্মুখযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণে সেদিন তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে মুক্তিবাহিনীকেও অনেক মূল্য দিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মুখযুদ্ধের একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা খায়রুল জাহান বুঝতে পারেন, এ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু তিনি তাঁর দলকে রক্ষা করার জন্য একাই সামনে এগিয়ে গিয়ে গুলি করতে থাকেন। লড়াইয়ের একপর্যায়ে মুজাহিদ আর রাজাকাররা তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাদের হাতে ধরা পড়ার আগ মুহূর্তে খায়রুল জাহান নিজের ওপর নিজেই গ্রেনেড চার্জ করে আত্মাহুতি দেন। খায়রুল জাহান ও তাঁর সহযোদ্ধা মো. সেলিম ঘটনাস্থলেই শহীদ হন।

১৯৭১ সালে খায়রুল জাহান ২০ বছরের যুবক ছিলেন। পড়াশোনা করতেন ময়মনসিংহ কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজ এলাকায় চলে যান। পরে ভারতের মেঘালয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে ২ নম্বর সেক্টরে গণবাহিনীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে মুক্তিবাহিনীর একটি দলের দলনেতার দায়িত্ব দেওয়া হয়। খায়রুল জাহান তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ২ নম্বর সেক্টর এলাকায় ছোটখাটো কয়েকটি অপারেশন করার পর নভেম্বরে নিজের এলাকায় যুদ্ধ করতে যান। প্যারাডাঙ্গায় অবস্থানের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী মুজাহিদ ও রাজাকার বাহিনী তাঁদের ওপর আক্রমণ করে।

AMARBOI.COM

খোরশেদ আলম, বীর প্রতীক

গ্রাম চান্দের চর, সদর, নড়াইল। বর্তমান ঠিকানা ফুলবাড়ী গেট, খুলনা মহানগর, খুলনা। বাবা এয়াকুব শরীফ, মা ছফুরা বেগম। স্ত্রী কোহিনুর বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৯।

অন্ধকার রাত। ভারতের ডাউকি থেকে রওনা হলেন একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের নেতৃত্বে খোরশেদ আলম। সীমান্ত অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তাঁদের লক্ষ্য গোয়াইনঘাটের একটি সেতু। সেখানে পাহারায় আছে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা। তাদের আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিতে হবে। তারপর সেতু ধ্বংস করতে হবে। বিপজ্জনক ও চরম ঝুঁকিপূর্ণ এক অপারেশন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা, বিশেষত খোরশেদ আলম তাঁর লক্ষ্য পূরণে পিছপা হননি। মধ্যরাতের আগেই তাঁরা নিঃশব্দে পৌঁছে যান লক্ষ্যস্থলে। একযোগে শুরু করেন আক্রমণ। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁদের প্রচণ্ড সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে ভীতসন্ত্রস্ত রাজাকাররা আগেই পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে পালিয়ে যায় পাকিস্তানি সেনারাও। মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত সেতুতে মাইন লাগানোর কাজ শুরু করেন। মাইন লাগিয়ে অবস্থান নেন নিরাপদ দূরত্বে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক প্রকম্পিত করে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় মাইন। ধ্বংস হয় সেতু। সফল হয় অপারেশন। এরপর তাঁরা ফিরে যান সীমান্তের ওপারে, নিজেদের ঘাঁটির দিকে।

গোয়াইনঘাট সিলেট জেলার অন্তর্গত। সীমান্তবর্তী থানা। গোয়াইনঘাটের ওপর দিয়েই রক্ষা করতে হয় সিলেট-তামাবিল-ডাউকি-শিলংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ। এ জন্য ১৯৭১ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোয়াইনঘাট ছিল গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। সীমান্তবর্তী এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্বিঘ্ন চলাচল ব্যাহত করার জন্য মুক্তিবাহিনী এই সেতুটি ধ্বংস করে। ওই সেতু ধ্বংসের কয়েক দিন আগে ভারতের একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা মুক্তিবাহিনীর ডাউকি ক্যাম্পে এসে বলেন, 'এই অপারেশনে আপনারা কে যাবেন?' তিনি এ কথা বলার পর কেটে যায় কয়েক মিনিট। মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা সবাই চুপচাপ। শেষে হাত তোলেন সাহসী খোরশেদ আলম। এরপর তাঁকেই অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

খোরশেদ আলম চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিলেট ইপিআর হেডকোয়ার্টারের ১২ নম্বর উইংয়ের অধীনে সীমান্ত এলাকায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। এপ্রিলের শেষে সিলেট শহর এলাকার শিবপুরে একটি প্রতিরক্ষা অবস্থানে থাকার সময় পাকিস্তানি সেনাদের বড় একটি দল তাঁদের আক্রমণ করে। ফলে বেধে যায় দুই পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে খোরশেদ আলমের দলের ১৩ জন ছাড়া বাকি সবাই শহীদ হন। চরম এ বিপর্যয়েও তিনি মনোবল হারাননি। যুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের উদ্দেশ করে বলতে থাকে, 'স্যারেন্ডার করো। তোমাদের ক্ষতি হবে না। প্রমোশন দেওয়া হবে।' কিন্তু ওই প্রলোভনে পা দেননি তিনি। হাওরের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যান। এরপর ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর ৫ নম্বর সেক্টরের ডাউকি সাব-সেক্টর এলাকাজুড়ে তিনি যুদ্ধ করেন। ছাতক যুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। ৭ ডিসেম্বর সেখানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

WWW.AMARBOI.COM

খোরশেদ আলম তালুকদার

বীর প্রতীক

কলেজপাড়া, টাঙ্গাইল। বাবা মনির হোসেন তালুকদার, মা কুলসুম বেওয়া। স্ত্রী আসমা আলম। তাঁদের চার ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১৪।

টাঙ্গাইল জেলার পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরবর্তী ভূঞাপুরের দক্ষিণের একটি গ্রাম মাটিকাটা। ১৯৭১ সালের ১১ আগস্ট কাদেরিয়া বাহিনী সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্ত্রবোঝাই সাতটি ছোট-বড় জাহাজের ওপর আক্রমণ চালায় এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে নেয়। এ ছিল প্রকৃত জনযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক যুদ্ধ। সেদিন পাকিস্তানি বাহিনী যাতে ভূঞাপুরের দিকে আসতে না পারে, সে জন্য এলেঙ্গা-ভূঞাপুর সড়কের নারান্দিয়ায় অবস্থান নেয় কাদেরিয়া বাহিনীর একটি কোম্পানি। এর নেতৃত্বে ছিলেন খোরশেদ আলম তালুকদার। অস্ত্র খুইয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ভূঞাপুরে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণের মুখে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। ফলে কৌশলগত কারণে খোরশেদ আলম ১৩ আগস্ট ভূঞাপুর ছেড়ে সখীপুর হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হলে ১৪ আগস্ট ঘাটাইলের গর্জনা গ্রামে তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে খোরশেদ আলম তালুকদার আহত হন। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

খোরশেদ আলম তালুকদার ১৯৭১ সালে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিলের মাঝামাঝি তিনি খবর পান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সখীপুরের পাহাড়ি এলাকায় কাদের সিদ্দিকী ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করছেন। এ খবর পেয়ে তিনি ছোট ভাই ইউনুস তালুকদার ও ছেলে দেলোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে সখীপুরে যান এবং কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর বাহিনীতে যোগ দেন। এখানে তিনি ১৫ দিন প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে কাদেরিয়া বাহিনীর একটি কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি কালিহাতীতে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে প্রথম সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। পরে তাঁর নেতৃত্বাধীন কোম্পানি এলেঙ্গা, শয়া পালিমা, নারান্দিয়া, সিংগুরিয়া, শিয়ালকোলসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

গাজী আবদুল ওয়াহেদ, বীর প্রতীক

AMARBOI.COM

গ্রাম মঙ্গলসী, ইউনিয়ন ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ, বরিশাল।
বাবা আসমত আলী গাজী, মা হাজেরা খাতুন।
স্ত্রী বেগম [illegible]। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৩৮। মৃত্যু ১৯৯৭।

গাজী আবদুল ওয়াহেদ ১৯৭১ সালে যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। তিনি অস্ত্রাগারের দায়িত্বে ছিলেন। ২৫ মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল যশোর সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে ইপিআর হেডকোয়ার্টারের সামনে অবস্থান নেয়। শেষ রাতের দিকে তারা হেডকোয়ার্টার লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকলে সেখানকার বাঙালি ইপিআর সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছোড়েন। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে চলে যায়। পরদিন ২৬ মার্চ যশোর ইপিআরের সেক্টর কমান্ডার অবাঙালি লে. কর্নেল আসলাম এসে তাঁদের অস্ত্র জমা দিতে বলেন। তাঁরা তাতে রাজি হননি। ৩০ মার্চ ভোরে যশোর সেনানিবাসে গোলাগুলির শব্দ শুনে ইপিআর হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত বাঙালি ইপিআর সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তখন হাবিলদার কাজী তৈয়বুর রহমানের নির্দেশে তিনি ও সেপাই আবদুল গনি শাবল দিয়ে অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে ফেলেন। তারপর অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা অবস্থান নেন। সে সময় পাকিস্তানি সেনারাও শহরে অবস্থান নিয়েছিল। কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা যশোর শহর থেকে পালিয়ে সেনানিবাসে আশ্রয় নেয়। তারা সেখানে এসে সাদা পতাকা ওড়ায়।

গাজী আবদুল ওয়াহেদসহ তাঁর সহযোদ্ধারা তখন ভেবেছিলেন, পাকিস্তানি সেনারা সম্ভবত সেনানিবাস থেকে আর বের হবে না। তাঁদের জয় হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সে ধারণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল ভুল। ৩ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। একই সঙ্গে সেনানিবাস থেকে ইপিআর সেনাদের অবস্থানের ওপরও ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু হয়। পাকিস্তানি সেনাদের নতুন এই আক্রমণে তাঁদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সময় ইপিআর সদস্যদের বিভিন্ন দল একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বস্তুত, পাকিস্তানি সেনারা যশোর শহরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর তাঁরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

এরপর গাজী আবদুল ওয়াহেদ তাঁর দলের সঙ্গে মেহেরপুরে চলে যান। পরে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যান ভারতে। তিনি মেহেরপুর এলাকাতেই সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেন। তবে কোন কোন জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেছেন, সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায়নি। কারণ, তিনি এখন আর বেঁচে নেই। তাঁর ছেলে বা পরিবারের সদস্যদের কেউই এ সম্পর্কে আর কোনো তথ্য দিতে পারেননি; বলতে পারেননি তাঁর কোনো সহযোদ্ধার নামও।

গাজী আবদুস সালাম ভূঁইয়া

বীর প্রতীক

গ্রাম নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ। বাবা শাহনেওয়াজ ভূঁইয়া, মা হালিমা খাতুন। স্ত্রী মেহেরুন নেছা। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৭৭। গেজেটে নাম এ এস ভূঁইয়া।

AMARBOI.COM

পাকিস্তানি সেনাদের সীমান্তসংলগ্ন ঘাঁটি কামালপুর দখল করে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলেন। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলের নেতৃত্বে গাজী আবদুস সালাম ভূঁইয়া। তাঁদের সঙ্গে আছেন মিত্রবাহিনীর সেনারাও। তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য শেরপুর। কিন্তু শেরপুরের উপকণ্ঠে তাঁরা পৌঁছামাত্র পাকিস্তানি সেনারা পশ্চাদপসরণ শুরু করল। তাঁরা ধাওয়া করে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণরত বহরের ওপর। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই পাকিস্তানি সেনারা রণে ভঙ্গ দিল। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বরের।

শেরপুর ভারত সীমান্তসংলগ্ন জেলা (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শেরপুর সদরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তানি সেনাদের কামালপুর ঘাঁটি দখল করে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ধাবিত হয় ঢাকার দিকে। সামনে ছিল অনেক প্রতিবন্ধকতা। তাই মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর থেকে দুটি কলামে বিভক্ত হয়ে এগোতে থাকে। একদল শ্রীবরদী থেকে ঝগড়ার চরের কাঁচা রাস্তা ধরে সংক্ষিপ্ত পথে অগ্রসর হয়। অপর দল অগ্রসর হয় শ্রীবরদী-শেরপুরের পাকা সড়ক ধরে। এ দলে সহযোদ্ধাদের নিয়ে ছিলেন গাজী আবদুস সালাম ভূঁইয়া।

তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে দ্রুতই শেরপুরের উপকণ্ঠে পৌঁছান। আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু আক্রমণ শুরু করার আগেই পাকিস্তানি সেনারা শেরপুর থেকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। গাজী আবদুস সালাম ভূঁইয়া তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা কিছুক্ষণ পর রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার সময় দু-তিনজন পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়।

গাজী আবদুস সালাম ভূঁইয়া চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। মার্চে সেখান থেকে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে দেখে তাঁর মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তিনি ঢাকায় আসার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। ২৫ মার্চ কৌশলে সেখান থেকে বিমানে চেপে ঢাকায় আসেন। সেই রাতেই পাকিস্তানি সেনারা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। দু-তিন দিন পর তিনি বিক্রমপুর-নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী-কিশোরগঞ্জ হয়ে নিজ এলাকায় যান। জুনে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে ভারতে কিছুদিন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। পরে যুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে। তিনি একটি কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন। কামালপুর, বকশীগঞ্জ, শ্রীবরদীসহ আরও কয়েকটি জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেন। ১৫ নভেম্বরে কামালপুর যুদ্ধে ১১ নম্বর সেক্টরের আহত অধিনায়ককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ স্থানে নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গাজী রহমতউল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম গড়ুইখালী, পাইকগাছা, খুলনা। বাবা শহর আলী গাজী, মা অভিরন নেছা। স্ত্রী সাহানা। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৭৩।

মংলা বন্দরের উত্তরে বাজুয়ার পার্শ্ববর্তী শিবসা নদী। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি। নদীতে পাশাপাশি নোঙর করা পাঁচ-ছয়টি জাহাজ। সেগুলো খাদ্যভর্তি। দুটি জাহাজ থেকে মালামাল খালাস করার কাজ চলছে। জাহাজগুলোর নিরাপত্তার জন্য সেখানে আছে বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা। রাতে নোঙর করা জাহাজের আলোয় জায়গাটি মনে হয় ছোটখাটো উজ্জ্বল শহর। জাহাজগুলো ধ্বংস করার জন্য অদূরে সুন্দরবনের পাশে সুতারখালীতে অবস্থান নিয়েছেন মুক্তিবাহিনীর একদল নৌ-কমান্ডো। তাঁদের নেতৃত্বে গাজী রহমতউল্লাহ ও বদিউল আলম। দুজনই এর আগে আলাদাভাবে বেশ কটি অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এবারের অপারেশন বেশ কঠিন। রেকি পার্টি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছে, জাহাজের চারদিকে গড়ে তোলা হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা। এর মধ্যে অপারেশন করা সম্ভব নয়। কিন্তু গাজী রহমতউল্লাহ নাছোড়বান্দা, এর মধ্যেই তিনি অপারেশন চালাবেন।

২৪ নভেম্বর সন্ধ্যার পর গাজী রহমতউল্লাহ নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে রওনা হলেন লক্ষ্যস্থলের দিকে। সেদিন আবহাওয়া মেঘলা। হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। নদীতে টহল দিচ্ছে পাকিস্তানি গানবোট। এ জন্য গাজী রহমতউল্লাহ ও তাঁর সহযোদ্ধারা বেশ সতর্ক, যেন তাঁদের অপারেশন ব্যর্থ না হয়। প্রতিটি জাহাজের জন্য চারজনের একটি দল। প্রবল বাতাসে পানির বিশাল ঢেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাড়িয়ে জাহাজের কাছে পৌঁছাতে তাঁদের অনেক সময় লেগে গেল। আগের অপারেশনে এত সময় লাগেনি। শেষ পর্যন্ত সব দলই দক্ষতার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে জাহাজে মাইন লাগাতে সক্ষম হলেন। আধঘণ্টা পর সবচেয়ে বড় জাহাজে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটল। সেই বিস্ফোরণের ঢেউ অন্য সব জাহাজেও ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য জাহাজগুলোয় লাগানো মাইনও একে একে বিস্ফোরিত হলো এবং ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হলো। জ্বলন্ত জাহাজগুলো ক্রমেই পানিতে তলিয়ে যেতে শুরু করল। আকস্মিকভাবে এ সময়ই শুরু হলো পাকিস্তানি গানবোট থেকে অবিরাম বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ। বন্দরে স্থাপিত পাকিস্তানি কামানগুলোও গর্জে উঠল। ট্রেসিং বোমার আলোয় চারদিক তখন দিনের মতো আলোকিত। সন্ধানী বোমার আলো-আঁধারির মধ্যে নৌ-কমান্ডোরা গাজী রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে থাকলেন নিরাপদ স্থানের দিকে। ভোর হওয়ার আগেই পৌঁছে গেলেন সুতারখালীতে। এই অপারেশনের মধ্য দিয়ে চুরমার হয়ে গেল পাকিস্তানি সেনাদের গর্ব। ২৮ নভেম্বর রাতে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকায় এই অপারেশনের খবর বেশ গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়।

গাজী রহমতউল্লাহ পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে প্রশিক্ষণরত ছিলেন ফ্রান্সের তুলোঁ নৌ-ঘাঁটিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনিসহ নয়জন বাঙালি সহযোদ্ধা পালিয়ে ভারতে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মূলত গাজী রহমতউল্লাহর পরিকল্পনাতেই নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠিত হয়। তিনি প্রথম অপারেশন চালান চট্টগ্রাম বন্দরে। স্থলযুদ্ধেও তিনি অংশ নেন। ২৫ নভেম্বর ২০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও নৌ-কমান্ডো যৌথভাবে খুলনার পাইকগাছা থানার কপিলমুনি রাজাকার ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি, কামরুজ্জামান টুকু, খিজির আলী ও সামসুল আবেদিন যৌথভাবে নেতৃত্ব দেন। চার দিন যুদ্ধের পর রাজাকার ঘাঁটির পতন ঘটে এবং ১৫৭ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে।

গোলাম আজাদ, বীর প্রতীক

গ্রাম ইতনা, লোহাগড়া, নড়াইল। বর্তমান ঠিকানা বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা। বাবা গোলাম হাসিব, মা রাবেয়া বেগম। স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬৯।

রাজাকার ক্যাম্পে সামনের দিক থেকে আক্রমণ করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল। গোলাম আজাদের নেতৃত্বে সেখানে পেছন থেকে আক্রমণ করলেন আরেক দল মুক্তিযোদ্ধা। দুই দিক থেকে আক্রমণে রাজাকাররা দিশেহারা। গোলাম আজাদ তাঁর দল নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সুরক্ষিত বাংকারে গ্রেনেড চার্জ করে ঢুকে পড়লেন ক্যাম্পের ভেতরে। রাজাকাররা হতভম্ব। গোলাম আজাদ তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন। রাজাকাররা একে একে আত্মসমর্পণ করতে থাকল। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের অক্টোবরের। ঘটেছিল বুনোগাতিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুনোগাতি মাগুরা জেলার অন্তর্গত। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী রাজাকারদের শক্ত একটি ক্যাম্প। অক্টোবরের শেষ দিকে এক দিন ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় দল রওনা হয় নড়াইলের লোহাগড়ার উদ্দেশে। সন্ধ্যার পর তারা সীমান্ত অতিক্রম করে। এ দলের একটি প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন গোলাম আজাদ। সীমান্ত অতিক্রম করে সারা রাত হেঁটে তাঁরা শেষ রাতে পৌঁছান বুনোগাতিতে। সেখানে তাঁরা যাত্রাবিরতি করেন। বুনোগাতিতে ছিল রাজাকারদের ক্যাম্প। মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে অবস্থানকালে জানতে পারেন, দু-তিন দিন পর পর পাকিস্তানি সেনারা ওই এলাকায় এসে টহল দিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে রাজাকার ক্যাম্পেও অবস্থান করে। রাজাকারদের সহায়তায় স্থানীয় গ্রামবাসীকে অনেক অত্যাচার-নির্যাতনও তারা করেছে। কয়েক দিন আগে তারা বুনোগাতি বাজার পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনার বিবরণ শুনে মুক্তিযোদ্ধারা ওই রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

রাজাকার ক্যাম্পটি ছিল একটি স্কুলে। সিদ্ধান্ত হলো, মুক্তিযোদ্ধারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করবেন। একটি দল সামনে, অন্য দল পেছন দিক থেকে। সামনের দলের নেতৃত্ব দেবেন এম এইচ সিদ্দিকী বীর উত্তম। তাঁরা সামনে থেকে আক্রমণ করে রাজাকারদের ব্যতিব্যস্ত রাখবেন। এই সুযোগে গোলাম আজাদের নেতৃত্বে অপর দলটি পেছন দিক থেকে ঝটিকা আক্রমণ করে ক্যাম্প দখল এবং রাজাকারদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে। গোলাম আজাদ তাঁর দল নিয়ে প্রচণ্ড গুলির মধ্যেই পাকা বাংকারের কাছে পৌঁছে সেখানে গ্রেনেড চার্জ করেন। এতে রাজাকার ক্যাম্প পতনের সূচনা হয়। এ যুদ্ধে কয়েকজন রাজাকার নিহত ও আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

গোলাম আজাদ ১৯৭১ সালে এইচএসসি শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসে ভারতে যান। বিহার রাজ্যের চাকুলিয়ায় প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ নেন। যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরে। নড়াইলের লোহাগড়া, গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়াসহ আরও কয়েকটি স্থানে তিনি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

গোলাম মোস্তফা, বীর প্রতীক

গ্রাম বাঘপাছরা, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।
বাবা আবদুল রেজ্জাক, মা রমিলা বেগম।
স্ত্রী কোহিনূর বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৫। মৃত্যু ২০০৫।

ভোরে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করল। নিমেষে সেখানে শুরু হলো যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলে আছেন গোলাম মোস্তফা। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকেন। প্রচণ্ড লড়াইয়ে শহীদ হলেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। আহত হলেন মোস্তফাসহ আরও কয়েকজন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের নভেম্বরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানাইঘাট সিলেট জেলার অন্তর্গত। এর অবস্থান সুরমা নদীর তীরে, জৈন্তাপুর-জকিগঞ্জ সংযোগ সড়কে। সীমান্ত এলাকা। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের শক্ত এক প্রতিরক্ষা অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের কয়েকটি দল সীমান্ত এলাকা থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সিলেট অভিমুখে অগ্রসর হয়। জেড ফোর্সের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আসতে থাকে আটগ্রাম-চরঘাট-সিলেট অক্ষ ধরে। পথিমধ্যে কয়েকটি জায়গা থেকে পাকিস্তানি সেনাদের বিতাড়িত করে ২৫-২৬ নভেম্বর তারা পৌঁছে যায় গৌরীপুরে। সেখান থেকে কানাইঘাটের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। মুক্তিযোদ্ধারা সুরমা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে অস্থায়ী প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। ২৬-২৭ নভেম্বর ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল তাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে বেরিয়ে আকস্মিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের সামনের দুটি কোম্পানিকে প্রায় ঘেরাও করে ফেলে। তাদের অতর্কিত আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী দল (আলফা ও ডেলটা কোম্পানি) নাজুক অবস্থায় পড়ে। এমন অবস্থায় বিচলিত না হয়ে গোলাম মোস্তফাসহ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। এ রকম যুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। গোলাম মোস্তফা তা-ই করতে থাকেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রচণ্ড লড়াইয়ে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকজন শহীদ হন এবং আহত হন অনেক মুক্তিযোদ্ধা। গোলাম মোস্তফা নিজেও আহত হন। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দলের সদস্যরা লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসানের (বীর প্রতীক, পরে মেজর) নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা পশ্চাদপসরণ করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেজর সারওয়ারসহ অসংখ্য সেনাসদস্য নিহত হয়। মুক্তিযুদ্ধে কানাইঘাট যুদ্ধ অন্যতম উল্লেখযোগ্য এক যুদ্ধ।

গোলাম মোস্তফা চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। নবীন সেনা হিসেবে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। ভারতে যাওয়ার পর পুনরায় সংগঠিত হয়ে প্রথম যুদ্ধ করেন জামালপুর জেলার কামালপুরে। পরে জেড ফোর্সের অধীনে আটগ্রাম-চারগ্রামসহ আরও কয়েক জায়গায় যুদ্ধ করেন।

জহিরুল হক খান, বীর প্রতীক

গ্রাম সুহিলপুর, ইউনিয়ন সুহিলপুর, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা মৌলভীপাড়া, পৌর এলাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা সুলতান আহমদ খান, মা হাবিয়া খাতুন। স্ত্রী মাহবুবা আক্তার। তাঁদের চার ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭।

জহিরুল হক খানের প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিক দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছেন। তাঁর ত্বরিত তৎপরতায় পাকিস্তানি সেনাদের পালিয়ে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে অধিকাংশ পাকিস্তানি সেনা নিহত হলো। মুক্ত হলো বিরাট এক এলাকা। এ ঘটনা ঘটেছিল কানাইঘাটে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

কানাইঘাট সিলেট জেলার অন্তর্গত উপজেলা। এর অবস্থান জৈন্তাপুর-জকিগঞ্জ সংযোগ সড়কে সুরমা নদীর তীরে এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তে। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষাব্যূহ। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। তাদের সহায়তা করেছে খাইবার রাইফেলস, থাল ও তোচি স্কাউটস এবং স্থানীয় রাজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে জকিগঞ্জ ও আটগ্রাম মুক্ত হওয়ার পর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সিলেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু কানাইঘাটের পাকিস্তানি অবস্থান ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শক্ত এক বাধা। এ জন্য কানাইঘাট দখল করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে কানাইঘাট-দরবস্ত রাস্তা বন্ধ করতে ওই সড়কের লুবাছড়া চা-বাগানে অবস্থান নেন। তখন পাকিস্তানি সেনারা দূরবর্তী অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান লক্ষ্য করে ১০৫ মিলিমিটার কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের আক্রমণের কৌশল পাল্টে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যান। দুটি দল কাট অফ পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। একটি দল অবস্থান নেয় কানাইঘাট-দরবস্ত সড়কে। আরেকটি কানাইঘাট-চরখাই সড়কে। এ দলের দলনেতা জহিরুল হক খান। অন্যটি আক্রমণকারী দল হিসেবে থাকে। ২ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা যে যাঁর অবস্থানে পৌঁছে যান। কিন্তু আক্রমণ শুরু করার আগেই পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ চালান। দেড় ঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা পালাতে থাকে। কিন্তু তাদের পালানোর পথ ছিল রুদ্ধ। একদল পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা জহিরুল হক খানের অবস্থানের দিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পলায়নরত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। তাঁদের প্রবল আক্রমণে অধিকাংশ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। লাশে ভরে যায় যুদ্ধক্ষেত্র। ৪ ডিসেম্বর সকাল আটটার মধ্যেই কানাইঘাট স্বাধীন হয়। কানাইঘাটের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ৫০ জন নিহত, ২০ জন আহত এবং ২৫ জন আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিবাহিনীর ১১ জন শহীদ ও ২০ জন আহত হন।

জহিরুল হক খান ১৯৭১ সালে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের (বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ) শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এতে যোগ দেন। পরে ভারতে চলে যান। সেখান থেকে সীমান্ত এলাকায় খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে অংশ নেন। জুনে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রথম বাংলাদেশ অফিসার্স ওয়ার কোর্সে। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে ৪ নম্বর সেক্টরের অমলসিদ সাব-সেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপর বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অগ্রবর্তী দলে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহুরুল হক মুন্সী, বীর প্রতীক

খামারিয়া পাড়া, শ্রীবরদী পৌর এলাকা, শ্রীবরদী, শেরপুর। বাবা আবদুল গফুর মিয়া, মা গোলেছা খাতুন। স্ত্রী মাহমুদা খাতুন। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। বীর প্রতীক খেতাব পান দুটি, খেতাবের সনদ নম্বর ৪০০, ৩৯১।

তিনি কখনো কলা বিক্রেতা হতেন, কখনো জুতো সেলাইয়ের কাজ করতেন, অর্থাৎ মুচি সেজে পাকিস্তানি সেনাদের মনোভাব জানতেন কিংবা তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেন। আবার তিনি অস্ত্র হাতেও যুদ্ধ করতেন। মাইন পোঁতায় তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানি সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বানসংবলিত চিঠি পৌঁছাতে গিয়ে তাদের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হন।

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর কামালপুর দখল করার পর জামালপুর শহরের পাকিস্তানি অবস্থানে হামলার প্রস্তুতি চলছিল। ৩১ বেলুচের প্রায় দেড় হাজার সেনা পিটিআই ক্যাম্পে স্থাপিত প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিল। এই অবস্থান বিচ্ছেদ না করে মিত্রবাহিনীর টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকার দিকে অভিযান পরিচালনা করা সব অর্থে অসম্ভব ছিল। এ অবস্থায় শত্রুপক্ষের মনোভাব জানতে মিত্রবাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখেন পাকিস্তানি অধিনায়কের কাছে। কিন্তু এ চিঠি নিয়ে কে যাবেন? জহুরুল হক মুন্সী তখন ভারতের পুরাখাসিয়া ক্যাম্পে ছিলেন। এ দায়িত্ব গ্রহণে তিনি স্বেচ্ছায় রাজি হলেন। ৯ ডিসেম্বর তিনি সাদা পতাকা উড়িয়ে সাইকেলে চড়ে রওনা হলেন জামালপুরের দিকে। পিটিআই ক্যাম্পে যাওয়ার পথে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আটক করে চোখ ও হাত বেঁধে নিয়ে যায় তাদের অধিনায়কের কাছে। চিঠি বহনের অপরাধে তাঁর ওপর শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন। এসএমজির বাঁটের আঘাতে মুন্সীর মুখের ওপরের পাটির চারটি দাঁত ভেঙে যায়। রাইফেলের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁর পা ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে তাঁকে শূন্যে ঝুলিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করা হয়। এরপর পাকিস্তানি অধিনায়ক ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারের চিঠির জবাব লিখে সেই চিঠির ভেতর রাইফেলের গুলি ভরে মুন্সীকে ফেরত পাঠায়। ওই দিনই গভীর রাতে মুন্সী পৌঁছান মিত্রবাহিনীর ক্যাম্পে। পরদিন ১০ ডিসেম্বর ভোরে মিত্রবাহিনী জামালপুরের পাকিস্তানি ক্যাম্পে আঘাত হানে। মুক্ত হয় জামালপুর।

জহুরুল হক মুন্সী ১৯৭১ সালে ডকশ্রমিক ছিলেন। ষাটের দশক থেকে নারায়ণগঞ্জ ডক ইয়ার্ডে কাজ করতেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাকির হোসেন, বীর প্রতীক

৪২ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা। বাবা আবদুল করিম, মা পরী বানু। অবিবাহিত। ঢাকার মতিঝিল এলাকায় তাঁর নামে একটি সড়ক রয়েছে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩১২। গেজেটে নাম মো. জাকির। শহীদ ২৬ আগস্ট ১৯৭১।

সালদা নদী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সালদা নদী, মন্দভাগ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই এলাকা মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য তখন সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা সালদা নদী হয়ে মেঘনা নদী এলাকা, ফরিদপুর, চাঁদপুর ও কুমিল্লার ভাটি এলাকায় অপারেশনে যেতেন। সে কারণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সালদা নদীর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। মন্দভাগ রেলস্টেশন মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকলেও সালদা নদী রেললাইন ক্রসপয়েন্ট বা সিগন্যাল পয়েন্টের উত্তর-পশ্চিমাংশ ছিল পাকিস্তানি সেনাদের দখলে। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ক্যাম্প। এ ক্যাম্পের কারণে ওই এলাকা দিয়ে চলাচলের সময় পাকিস্তানি সেনাদের হাতে শহীদ হন অনেক মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিবাহিনীর সালদা নদী সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল সেখানে ২৬ আগস্ট একযোগে আক্রমণ করে।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। স্টুডেন্ট গ্রুপ আক্রমণ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ করল। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ল। জাকির হোসেন তাঁর দল নিয়ে বুকসমান পানির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন একদম পাকিস্তানি ক্যাম্পের কাছাকাছি। ২০০ গজ সামনে পশ্চিমে রেললাইনের ওপরে সর্বশেষ এলএমজি পোস্ট দখল বা ধ্বংস করতে পারলেই পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাব্যূহের পতন ঘটবে। হঠাৎ সহযোদ্ধা মোস্তাক তাঁর অগোচরে একাই এগিয়ে গেলেন সেদিকে। রেললাইনের কাছে পৌঁছে মাথা তুলতেই গুলি এসে লাগল তাঁর চোয়াল ও ডান হাতে। সহযোদ্ধার চিৎকার শুনে জাকির গুলিবর্ষণের মধ্যেও এগিয়ে গেলেন তাঁকে বাঁচাতে। কাছে গিয়ে মাথা তোলামাত্র তাঁকেও বরণ করতে হলো একই পরিণতি। গুলি এসে লাগল তাঁর কপাল ও বুকের পাঁজরে। তিনি শহীদ হলেন। তখন বেলা প্রায় তিনটা। দলনেতা শহীদ হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সেদিনের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরে সহযোদ্ধারা জাকির হোসেনের লাশ উদ্ধার করে সমাহিত করেন মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রঘুরামপুর গ্রামের এক টিলার ওপরে, যা কুল্লাপাথর সমাধি হিসেবে পরিচিত।

জাকির হোসেন ১৯৭১ সালে বিএসসি তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন যুদ্ধে। আগরতলায় প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকায় কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। পরে সালদা নদী সাব-সেক্টরের অধীন বেশ কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ছিলেন ১২ নম্বর গ্রুপের দলনেতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জালাল আহম্মেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম কুহুমা, ইউনিয়ন রাধানগর, ছাগলনাইয়া, ফেনী।
বাবা শেখ আহম্মদ, মা রহিমের নেছা।
স্ত্রী গুলনাহার বানু। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫৩।

মধ্যরাতে হঠাৎ হইচই আর প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জালাল আহম্মেদের। তাঁদের ব্যারাকের ওপর তীব্র গুলিবর্ষণ চলছে। উঠে দেখতে পেলেন, ঘুমন্ত অবস্থাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে অনেকে শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। চারদিকে শুধু রক্ত আর লাশ। যাঁরা আহত, তাঁরা আর্তনাদ করছেন। যাঁরা গুলিবিদ্ধ হননি, তাঁরা দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করছেন। বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও একজন। জানতে পারলেন, পাকিস্তানি সেনারা (২০ বালুচ রেজিমেন্ট) তাঁদের ওপর আক্রমণ করেছে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতের। ঘটেছিল চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে (ইবিআরসি)। তখন সেখানে প্রশিক্ষণরত প্রায় দুই হাজার সেনাসদস্য ছিলেন। সবাই বাঙালি। সুবেদার জালাল আহম্মেদ ছিলেন তাঁদের একজন প্রশিক্ষক। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণরত প্রায় দেড় হাজার বাঙালি সেনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করে। বাকি সেনারা পালিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। তাঁদের মধ্যে জালাল আহম্মেদও ছিলেন।

পরে তিনি স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের সঙ্গে চট্টগ্রামের বারো আউলিয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে তাঁরা একপর্যায়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। তখন তিনি নিজ এলাকা হয়ে ভারতে চলে যান। সেখানে প্রথমে কিছুদিন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। পরে তাঁকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জালাল আহম্মেদ যুদ্ধে প্রথম অংশ নেন শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার নকশী বিওপিতে। ৪ আগস্ট অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আক্রমণ করলে সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি ছিলেন আলফা কোম্পানির একটি প্লাটুনের নেতৃত্বে। নকশীতে তাঁরা যখন পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পের ১০০ গজের মধ্যে পৌঁছে যান, ঠিক তখনই পাকিস্তানি সেনাদের একটি গোলা তাঁদের অবস্থানের ওপর বিস্ফোরিত হয়। এতে শহীদ হন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। ঘটনার এই আকস্মিকতার মুখে তাঁদের আপাতত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে হয়। এর পরও তাঁদের অনেকে আরও এগিয়ে যান এবং পলায়নরত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। ফলে পাকিস্তানি সেনারাও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। অবশ্য নকশীতে মুক্তিযোদ্ধারা সফল হতে পারেননি। এরপর তাঁদের কিছুদিন বিশ্রামে রাখা হয়। জালাল আহম্মেদ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ করেন বৃহত্তর সিলেট জেলায়। বড়লেখা ও ভানুগাছে যুদ্ধ করার পর তাঁদের দল ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তখন মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। সেখানে সংঘটিত যুদ্ধে জালাল আহম্মেদসহ আরও কয়েকজন আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোফায়েল আহমেদ, বীর প্রতীক

মজুমদারবাড়ী, গ্রাম সিলুয়া, ইউনিয়ন পাঠাননগর, ছাগলনাইয়া, ফেনী। বাবা মুজাফফর আহমদ মজুমদার, মা ফাতেমা খাতুন। স্ত্রী শরীফা খাতুন। তাঁদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২২৭।

তোফায়েল আহমেদ অসুস্থ। ঠিকমতো কথা বলতে পারেন না। থেমে থেমে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় কেঁপে উঠছিলেন। হঠাৎ যেন তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায় ভিড় জমায় অনেক কথা। তাঁর চোখ বারবার সিক্ত হয়ে পড়ছিল। তাঁর জীবনের স্মরণীয় একটি যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। কিন্তু সব কথা বলতে পারলেন না। কোনোরকমে সেই জায়গার নাম, তাঁর কোম্পানি কমান্ডারের নাম এবং আরও কয়েকটি জায়গার নাম বললেন, যেখানে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। স্মরণীয় সেই যুদ্ধ হয়েছিল বালিয়াডাঙ্গায়। এ যুদ্ধ এত ভয়াবহ ও লোমহর্ষক ছিল যে তাতে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, এখন সে কথা মনে হলে তাঁদের প্রত্যেকেই শিউরে ওঠেন।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। তখন একদল মুক্তিযোদ্ধার অবস্থান ছিল সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার বালিয়াডাঙ্গায়। ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও ছাত্র-জনতার সমন্বয়ে গড়া মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা অতিষ্ঠ। তাই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দমনে নতুন কৌশল নেয়। হঠাৎ এক দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট বিপুল শক্তি নিয়ে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ চালায়। তাদের আক্রমণের মাত্রা ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। বৃষ্টির মতো আর্টিলারি গোলার আঘাতে মুক্তিযোদ্ধারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যেও তাঁরা টিকে থাকার চেষ্টা করেন। যুদ্ধ চলল কয়েক দিন। তিন কি চার দিনের মাথায় পাকিস্তানি সেনাদের অব্যাহত আক্রমণের মুখে মুক্তিবাহিনী সেখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলো। পাকিস্তানি সেনাদের গোলার আঘাতে মুক্তিবাহিনীর আটজন যোদ্ধা ও অনেকে আহত হন।

তোফায়েল আহমেদ ছিলেন ইপিআরে। কর্মরত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তসংলগ্ন এলাকা। সেখানকার কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার তোবারক উল্লাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি ৮ নম্বর সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন; কখনো ভোমরা, কখনো হাকিমপুর সাব-সেক্টরে। তোবারক উল্লাহর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি অসীম সাহসের পরিচয় দেন। ভোমরায় এক যুদ্ধে তিনি সামান্য আহত হন। পাকিস্তানি সেনাদের বোমায় তাঁর বাঁ হাতের অংশবিশেষ ঝলসে যায়।

১৯৮৩ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেলোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম দুর্গাপাশা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। বাবা আমীর হোসেন খন্দকার, মা সখিনা বেগম। তাঁর দুই স্ত্রী— হাসনাহেনা হোসেন ও মোতায়ারা হোসেন। তাঁদের চার ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৩৩।

দেলোয়ার হোসেন ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। তখন তাঁর বয়স ২৫-২৬ বছর। তাঁরা আগে থেকেই জানতেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের ওপর আক্রমণ করবে। ২৫ মার্চ রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে চট্টগ্রাম ইপিআরের হেডকোয়ার্টার্স অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। হালিশহর এলাকার চারদিকে অবস্থান নেন তাঁরা। রাত দেড়-দুইটার দিকে পাকিস্তানি নৌবাহিনীর তিনটি গাড়ি হালিশহরে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে। দেলোয়ার হোসেন ও তাঁর সঙ্গী মীর কাশেম লাইট মেশিনগান নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালান। এতে পাকিস্তানি নৌবাহিনীর একজন আহত হয়। এটা ছিল দেলোয়ার হোসেনের তাঁর প্রথম যুদ্ধ।

২৬ মার্চ দেলোয়ার হোসেন তাঁর দলের সঙ্গে কুমিরায় অবস্থান নেন। সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি বহর কুমিল্লা থেকে কুমিরায় উপস্থিত হলে সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ চলে টানা তিন-চার ঘণ্টা। পাকিস্তানি সেনারা যখন ব্যারিকেড সরানোর কাজে ব্যস্ত, তখন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। এতে পাকিস্তানি সেনারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে অনেক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এরপর কুমিরা থেকে এসে তাঁরা আবার হালিশহরে অবস্থান নেন। ২৯ মার্চ পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ হালিশহরে বোমাবর্ষণ শুরু করে। এতে তাঁদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তখন তাঁরা হালিশহরের অবস্থান ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।

দেলোয়ার হোসেন প্রথমে ১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে তাঁকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর জেড ব্রিগেডের অধীনে যুদ্ধ করেন তিনি। আট-নয়টি যুদ্ধে অংশ নেন। এর মধ্যে লাতু ও শুভপুরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর থেকে মৌলভীবাজারের লাতু এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েক দিন টানা যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন শহীদ এবং দেলোয়ারসহ কয়েকজন যোদ্ধা আহত হন। এক দিন হালকা মেশিনগান দিয়ে তিনি গুলি করছিলেন। একপর্যায়ে প্রচণ্ড গুলিবৃষ্টির মধ্যে ক্রল করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর বাঁ পা মাইনের আঘাতে উড়ে যায়। ডান পায়ে গুলি লাগে। ভেবেছিলেন, বাঁচবেন না। ওই অবস্থায়ও তিনি মনোবল হারাননি। সহযোদ্ধারা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। পরে উন্নত চিকিৎসার পর তাঁর কৃত্রিম পা লাগানো হয়। এই কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে তিনি এখন চলাফেরা করেন।

বিডিআরের চাকরি থেকে ১৯৮৪ সালে বাধ্যতামূলক অবসর নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম কয়রাডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।
বাবা মো. ফতে আলী, মা সৈয়দতুন নেছা।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭৪।
শহীদ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম। তিনি একা। পালানোর সব রাস্তাই বন্ধ। লড়াই করে বীরের মতো মরতে বা বাঁচতে হবে, অন্যথায় কাপুরুষের মতো ধরা দিতে হবে। প্রথম সিদ্ধান্তই বেছে নিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য। লড়াই করে জীবন দিতে বা বাঁচতে পারলেন না। আহত অবস্থায় শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়লেন। এ ঘটনা ঘটেছিল কয়রাডাঙ্গায়, ১৯৭১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে।

কয়রাডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার অন্তর্গত। নজরুল ইসলামসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ভারত থেকে গেরিলা অপারেশনে আলমডাঙ্গায় এসেছিলেন। তাঁরা বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশন করেন। সেদিন তিনি এসেছিলেন নিজের গ্রামে। কিন্তু তাঁর আসার খবর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর স্থানীয় দোসররা জেনে যায়। তারা গোপনে দ্রুত খবর পৌঁছে দেয় সেখানে টহলে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের।

AMARBOI.COM

খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনাদের টহল দল সহযোগী রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে কয়রাডাঙ্গায় চলে আসে। তাদের আসার খবর গ্রামের কেউ টের পায়নি। নজরুল ইসলাম খবর পেয়ে প্রথমে পালানোর চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেন সব পথ রুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা গোটা এলাকা ঘেরাও করে এগিয়ে আসছে। তখন তিনি লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাতেও তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর কাছে ছিল হালকা অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে কয়েকটি গুলি ছোড়া মাত্র পাকিস্তানি সেনারা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করতে শুরু করে। তিনি আহত হয়ে পড়ে যান। এরপর পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আটক করে।

পাকিস্তানি সেনারা নজরুল ইসলামের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালায়। জানার চেষ্টা করে তাঁর সহযোদ্ধাদের নাম ও অবস্থান। শত নির্যাতনেও তিনি তা প্রকাশ করেননি। পরে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে তাঁকে হত্যা করে।

নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালে দর্শনা কলেজের আইকম প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। কুষ্টিয়া যুদ্ধে (৩০-৩১ মার্চ) তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কুষ্টিয়া মুক্ত করার জন্য চুয়াডাঙ্গা থেকে মুক্তিবাহিনীর (ইপিআর সদস্য) একটি দল চুয়াডাঙ্গা থেকে আলমডাঙ্গা হয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে যায়। তখন তাদের সঙ্গে আলমডাঙ্গার শত শত ছাত্র-জনতা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার পতন হলে তিনি ২০ এপ্রিল ভারতে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৮ নম্বর সেক্টরের বানপুর সাব-সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল হক, বীর প্রতীক

জামুগড়ি, বদরগঞ্জ, রংপুর।
বাবা এ কে এম জহুরুল হক, মা আমেনা বেগম।
স্ত্রী ফিরোজা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭।

নজরুল হক ১৯৭১ সালে দিনাজপুরে ইপিআরে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন।

২৬ মার্চের পর দিনাজপুরের দশমাইল এলাকায় তিনি পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর অধীনে ছিলেন ৬০ জন ইপিআর সেনাসদস্য। সে সময় তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল না। ফলে তাঁদের পিছু হটতে হয়। ওই যুদ্ধ শেষে দিনাজপুরের কান্তনগরের বনজঙ্গলে দুই দিন থাকার পর রওনা হন ভারতের উদ্দেশে। এপ্রিলের মাঝামাঝি ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি সীমান্ত দিয়ে তিনি আবার দেশে প্রবেশ করেন।

১৮ তারিখ সন্ধ্যা থেকে নজরুল হকের নেতৃত্বে ইপিআরের ৬০ জন সেনাসহ ১০০ জনের মতো একটি প্রতিরোধযোদ্ধার দল বিরলে যুদ্ধ করে। সেদিন তারা গুলি শুরু করামাত্র পাকিস্তানি সেনারাও জবাব দিতে থাকে। একটানা তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা চলে গুলি-পাল্টা গুলি। বিরল মুক্ত করার জন্য নজরুলের নেতৃত্বে তাঁর দল মরিয়া হয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে চলে। রাত সাড়ে ১২টার পর বিরলের পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প থেকে আর কোনো আওয়াজ আসছিল না। ভোরের আলো ফুটতেই ক্লান্ত শরীর নিয়ে তাঁরা দেখতে পান, বিরলের পাকিস্তানি আর্মির ক্যাম্প ফাঁকা। তাঁরা বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি আর্মিরা পিছু হটেছে।

১৯৮২ সালে তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে থাকাকালে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন।

নান্নু মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম দাড়িপত্তন, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
বাবা আবদুল হক, মা জয়গুন বিবি।
স্ত্রী রীনা বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৩৬। মৃত্যু ১৯৮৭।

নান্নু মিয়া যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের অধীন বয়রা সাব-সেক্টর এলাকায়। ১৯৭১ সালের আগস্টে যশোরের চৌগাছা উপজেলার অন্তর্গত সুতিপুরে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আগমন ও গতিবিধি লক্ষ করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য মুক্তিবাহিনীর সুতিপুর প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী এলাকা গোয়ালহাটি গ্রামে একটি স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোল পার্টি মোতায়েন করা হয়। সাত-আটজনের ক্ষুদ্র এ দলের একজন সদস্য ছিলেন নান্নু মিয়া। দলনেতা ছিলেন নূর মোহাম্মদ শেখ (বীরশ্রেষ্ঠ)। কয়েক দিন সেখানে তাঁরা দায়িত্ব পালন করছিলেন। কিন্তু স্থানীয় বাঙালি দোসরদের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের সন্ধান পেয়ে যায়। ৫ সেপ্টেম্বর একদল পাকিস্তানি সেনা তাঁদের তিন দিক থেকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। তখন তাঁরাও পাল্টা আক্রমণ করে যুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের সংখ্যা ছিল তাঁদের কয়েক গুণ এবং তারা অত্যন্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি নান্নু মিয়াদের অনুকূলে ছিল না। বেশিক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। সে জন্য পরিস্থিতি দ্রুত বিবেচনায় নিয়ে তাঁরা পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেন। পাল্টা গুলি করতে করতে পশ্চাদপসরণের সময় হঠাৎ নান্নু মিয়ার পিঠে শেলের কয়েকটি টুকরা এবং দু-তিনটি গুলি লাগে হাতে। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে মূল অবস্থানে আনতে সক্ষম হলেও তাঁদের অধিনায়ক নূর মোহাম্মদ শেখ সেখানেই শহীদ হন।

নান্নু মিয়া চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। আহত হওয়ার আগে গোয়ালহাটি, বর্নি, গঙ্গাধরপুর, কাশিপুর, বেলতাসহ আরও কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন। গোয়ালহাটি-সুতিপুরের যুদ্ধে আহত হওয়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে উড়িষ্যার একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নান্নু মিয়ার স্বজনেরা ভেবেছিলেন, তিনি শহীদ হয়েছেন। চিকিৎসা শেষে যুদ্ধের প্রায় তিন মাস পর তিনি বাড়িতে আসেন। যোগ দেন আগের কর্মস্থলে। শরীরে শেলের টুকরা থেকে যাওয়ায় তাঁর শারীরিক জটিলতা কাটেনি। ১৯৮৪ সালে শারীরিক কারণে তাঁকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

নুরুল হুদা, বীর প্রতীক

দক্ষিণ রুমানিয়াছড়া, কক্সবাজার পৌরসভা।
বাবা মোহাম্মদ সোলায়মান, মা ছেমন খাতুন।
স্ত্রী দিলদার বেগম (৬৭)। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৮৮। মৃত্যু ২০০৮।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। মুক্তিবাহিনীর একদল ইপিআর সদস্য সমবেত হলেন ঝিকরগাছায়। নুরুল হুদাও এ দলের একজন সদস্য। তাঁরা অবস্থান নিলেন পুলের হাটে। পরদিন তাঁরা খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বড় দল হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর সেখানে শুরু হয়ে গেল দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ। চলল কয়েক ঘণ্টা। নুরুল হুদা ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা পিছু হটে আসতে বাধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হন। এরপর তাঁরা অবস্থান নিলেন নদীর পশ্চিম প্রান্তে। পরদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র আক্রমণ শুরু করল। আবার শুরু হলো যুদ্ধ। এ যুদ্ধে নুরুল হুদার দুজন সহযোদ্ধা শহীদ এবং বেশ কয়েকজন আহত হলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ নিজ অবস্থানে টিকে থাকা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফলে তাঁরা আবার বাধ্য হলেন পশ্চাদপসরণ করতে। এভাবে ঝিকরগাছার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে গেল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে।

ঝিকরগাছা যশোর জেলার অন্তর্গত। নুরুল হুদা ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। ২৫ মার্চ শেষ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি ছোড়ে। তখন বাঙালি ইপিআর সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছোড়েন। এরপর সেখানে আর কোনো ঘটনা সে রাতে ঘটেনি। পরদিন নুরুল হুদাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হয়। তখন তাঁরা এর প্রতিবাদ করেন এবং ৩০ মার্চ তাঁরা বিদ্রোহ করে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। নুরুল হুদারা যশোর থেকে পশ্চাদপসরণ করতে করতে ঝিকরগাছায় সমবেত হন। ঝিকরগাছার পতন হলে তাঁরা বেনাপোলসংলগ্ন কাগজপুকুরে সমবেত হন। ২৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানেও হামলা চালায়। ফলে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তাঁর সহযোদ্ধা মুজিবুর রহমানসহ (বীর বিক্রম) আরও কয়েকজন সহযোদ্ধা শহীদ হন। কাগজপুকুরের পতন হলে তাঁরা ভারতে চলে যান। সেখানে গিয়ে আবার সংগঠিত হওয়ার পর যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বেনাপোল সাব-সেক্টরে। মুক্তিবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্বও দেন তিনি। কয়েকটি অপারেশনে তিনি যথেষ্ট রণনৈপুণ্য দেখান। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর একটি দল বেনাপোল থেকে যশোরের দিকে অগ্রসর হয়। তখন চূড়ামনকাঠিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

AMARBOI.COM

নূর মোহাম্মদ, বীর প্রতীক

গ্রাম দেলিয়াই (বালিয়াধর), চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা আবদুর রব পাটোয়ারী, মা আশ্রাফের নেছা।
স্ত্রী খোশতারা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১০১। শহীদ ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।

কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকাররা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। চারদিক থেকে তারা অবরুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা নূর মোহাম্মদ পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পর তারা আত্মসমর্পণ করতে লাগল। স্কুলমাঠে আত্মসমর্পণ পর্ব প্রায় শেষ পর্যায়ে, এমন সময় হঠাৎ কয়েকটি গুলির শব্দ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলি এসে লাগল নূর মোহাম্মদ ও তাঁর সহযোদ্ধা আবদুল হামিদের শরীরে। ঢলে পড়লেন তাঁরা। মুহূর্তেই আনন্দ পরিণত হলো শোকে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বরে ঘটেছিল সোনাইমুড়ীতে।

সোনাইমুড়ী নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোট একটি ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে তাদের সঙ্গে স্থানীয় রাজাকাররাও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে একদল মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদের নেতৃত্বে সোনাইমুড়ীর পাকিস্তানি ক্যাম্পে আক্রমণ করেন। কয়েক ঘন্টা সেখানে যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে ঘেরাও করে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের কোণঠাসা করে ফেলেন। তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। নূর মোহাম্মদ পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন। প্রথমে তারা অস্বীকৃতি জানালেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়। এরপর তারা একে একে স্কুলমাঠে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। স্কুলমাঠে কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে নূর মোহাম্মদ তা তদারক করছিলেন। এমন সময় লুকিয়ে থাকা এক রাজাকার তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি ছোড়ে। সেই গুলি সরাসরি তাঁর এবং আরেক সহযোদ্ধা আবদুল হামিদের শরীরে বিদ্ধ হয়। তখনই তাঁদের জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। পরে সহযোদ্ধারা নূর মোহাম্মদের মরদেহ নিয়ে যান তাঁর গ্রামের বাড়িতে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হকের জমিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

নূর মোহাম্মদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় এসে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন সুবেদার লুৎফর রহমান। তিনি এক সাক্ষাৎকারে (১৯৭৩) তাঁর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, '...২৬ এপ্রিল হাবিলদার নূর মোহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে বিপুলাশ্বর স্টেশনের দক্ষিণে এক স্থানে পাকিস্তানিদের অ্যামবুশ করি।...এখানে যুদ্ধে হাবিলদার নূর মোহাম্মদ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন'।

AMARBOI.COM

নূর হামিম রিজভী, বীর প্রতীক

ফুদকিপাড়া, রাজশাহী শহর। বাবা আবদুল আল্লাম, মা নূর মহল। স্ত্রী ইলা। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬৭। গেজেটে নাম মো. নূর হামিম।

নূর হামিম রিজভী ১৯৭১ সালে এইচএসসির শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মা ও ছোট দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রাজশাহী থেকে পালিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদে নানার বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে থাকার সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাঁর মামারা এতে বাধা দেন। বাবা মারা যাওয়ায় মা ছিলেন তাঁর অভিভাবক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বলেন, 'যারা গণহত্যা ও নারীর ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তাদের অপকর্ম নীরবে সহ্য করতে আমার ছেলে ঘরে বসে থাকতে পারে না।'

রিজভী ভারতের চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীন আহমদের অধীনে যোগ দেন। রাজশাহীর গোদাগাড়ী চাপল মসজিদসংলগ্ন স্থানে পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও রাজাকারদের ক্যাম্প। সন্ধ্যার পর থেকে সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীও অবস্থান করত আর টহল দিত। ক্যাপ্টেন গিয়াস এক দিন মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন পাকিস্তানি বাহিনীকে অ্যামবুশ করার।

রেকি করে তাঁরা স্থান নির্বাচন করলেন আলিমগঞ্জের কসবা নামের স্থান। সেদিন ছিল ৭ নভেম্বর। প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর টহল গাড়ি ওই জায়গা ক্রস করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে যায়। রাত ১১টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনীর টহল গাড়ি সেখানে এলে মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ চালান। মুহূর্তে গাড়িটি ঝাঁঝরা হয়ে গেল। গাড়িতে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক ক্যাপ্টেন, নয়জন সেনা ও পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী এক বাঙালি পুলিশ কর্মকর্তা। রিজভী এর আগে ও পরে আরও কয়েকটি অপারেশনে অংশ নিয়েছেন। এই অপারেশন তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

নূরুল আজিম চৌধুরী, বীর প্রতীক

গ্রাম উত্তর গোমদণ্ডী, ইউনিয়ন পূর্ব গোমদণ্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। বাবা আমির হোসেন চৌধুরী, মা ফরিদা খাতুন। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৭।

AMARBOI.COM

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর থেকে সিলেট অভিমুখী সড়ক ধরে ৩০ কিলোমিটার গেলেই মাধবপুর। সেখান থেকেই হবিগঞ্জ জেলার শুরু। ১৯৭১ সালের ২৭-২৮ এপ্রিল এখানে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সংঘটিত হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী এই সম্মুখযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল সেনাসদস্য। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন নাসিমের (পরে লে. জেনারেল ও সেনাপ্রধান) কোম্পানিতে ছিলেন মো. নূরুল আজিম চৌধুরী।

পাকিস্তানি সেনারা বিপুল শক্তি নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা কামানের মুহুর্মুহু গোলা ও বিস্ফোরক নিক্ষেপ করতে করতে মুক্তিবাহিনীকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। নূরুল আজিম চৌধুরী ও তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁদের বাংকার ও পরিখার মধ্য থেকে রিকোয়েললেস রাইফেল, মেশিনগান, হালকা মেশিনগান, মর্টার, রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতে থাকেন। একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি যুদ্ধ। এ পর্যায়ে মো. নূরুল আজিম চৌধুরী ও তাঁর সহযোদ্ধারা অসীম সাহস ও দৃষ্টান্তমূলক দৃঢ়তার পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা পেশাগত দক্ষতা, নৈপুণ্য, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুল আজিম চৌধুরী ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো ও প্যারাট্রুপার। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর ইউনিটের অবস্থান ছিল টাঙ্গাইলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। জুলাই পর্যন্ত তিনি তেলিয়াপাড়ায় ছিলেন। এরপর তিনি নরসিংদী জেলার বেলাব, রায়পুরাসহ কিশোরগঞ্জ জেলার কয়েকটি উপজেলায় যুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩ নম্বর সেক্টরের অধীন নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনীর গণযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিয়মিত সেনাদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়। আগস্টে তিনি এ দায়িত্ব পান। এর আগে এ দায়িত্বে ছিলেন সুবেদার আবুল বশর। তিনি ১৪ জুলাই পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সংঘটিত এক যুদ্ধে শহীদ হন। এই এলাকায় নূরুল আজিম চৌধুরীর প্রথম অপারেশন ছিল নরসিংদীর একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে। পরে ঢাকা-নরসিংদী সড়কের অনেক সেতু তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ধ্বংস করেন।

নূরুল ইসলাম খান পাঠান, বীর প্রতীক

খড়মপট্টি, সদর, কিশোরগঞ্জ। বাবা আবদুস সাত্তার খান পাঠান, মা রাবেয়া আক্তার খাতুন। স্ত্রী সনজিদা। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪৩।

নূরুল ইসলাম খান পাঠান ১৯৭১ সালে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। ২৫ মার্চের পর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি দল কিশোরগঞ্জে অবস্থান নেয়। ৩ এপ্রিল দলটি তেলিয়াপাড়ায় যায়। তখন মা-বাবাকে না জানিয়ে তিনি ওই দলের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তেলিয়াপাড়ায় যান। পরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩ নম্বর সেক্টরের অধীন তেলিয়াপাড়াসহ আরও কয়েকটি স্থানে সাহসের সঙ্গে গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি মুক্তিবাহিনীর একটি দলের প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন।

নভেম্বরের মাঝামাঝি নূরুল ইসলাম খান পাঠানের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ার চানপুর গ্রামে। সেখানে তাঁরা মাটির বাংকার তৈরি করে ক্যাম্প স্থাপন করেন। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বড় একটি দল তাঁদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। তাদের সাঁড়াশি আক্রমণে সেখানে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা পশ্চাদপসরণ করেন। কিন্তু নূরুল ইসলাম খান পাঠান ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা জীবনের মায়া ত্যাগ করে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। তখন তিনি ও কয়েকজন সহযোদ্ধা একের পর এক গ্রেনেড চার্জ করে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করেন। তাঁদের গ্রেনেডে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এ সময় পশ্চাদপসরণ করা মুক্তিযোদ্ধারা আবার যুদ্ধস্থলে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর তাঁরা রক্ষণাত্মক যুদ্ধ থেকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করেন। বৃষ্টির মতো গুলি করতে করতে নূরুল ইসলাম খান পাঠান কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি অবস্থানের ভেতরে ঢুকে পড়েন। একপর্যায়ে তিনি একাই আরও এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানি একটি অবস্থান লক্ষ্য করে পর পর দুটি গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটান। এতে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। তাঁর এই অদম্য সাহস দেখে অন্য সহযোদ্ধাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তাঁরা চারদিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের ঘিরে ফেলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী কয়েকজন রাজাকারকে তাঁরা আটক করেন। বাকি সবাই পালিয়ে যায়।

নূরুল ইসলাম খান পাঠান বলেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এখনো হয়নি। জীবদ্দশায় তাদের বিচার দেখে যেতে চাই। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। যুদ্ধাপরাধী ও জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার দেখে মরতে পারলে পরকালেও শান্তি পাব। আমি কিছু পাওয়ার আশায় মুক্তিযুদ্ধ করিনি। কিন্তু যুদ্ধ শেষে এমন বাংলাদেশ হবে, তা-ও চাইনি।'

নূরুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম নয়নপুর, ইউনিয়ন চন্দ্রপুর, দাগনভূঞা, ফেনী। বাবা আবদুল লতিফ, মা সুফিয়া খাতুন। স্ত্রী হাজেরা খাতুন। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩১। অবাঙালিদের সঙ্গে সংঘর্ষে জানুয়ারি ১৯৭২ সালে নিহত।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। দেশজুড়ে বইছে স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়া। কিন্তু কয়েকটি জায়গায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী সশস্ত্র অবাঙালিরা (বিহারি) তখন পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেনি। নারায়ণগঞ্জ জেলার আদমজী পাটকলে অবস্থানরত সশস্ত্র অবাঙালিরা বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করছিল না। এভাবে কেটে গেল কয়েক দিন। মুক্তিযোদ্ধারা ঘেরাও করে আছেন এলাকাটি। তাঁদের মধ্যে নূরুল হকও আছেন।

১৯৭২ সালের ৪ বা ৫ জানুয়ারি। সকাল থেকে আদমজী পাটকলে অবস্থানরত অবাঙালিরা গোলাগুলি শুরু করে। দুই পক্ষে বেধে যায় ভয়াবহ সংঘর্ষ। এতে নূরুল হকসহ বেশ কজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। তাঁদের ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন দুপুরেই নূরুল হক মারা যান।

নূরুল হক ছিলেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রের গাড়িচালক। ১৯৭১ সালের মার্চে তিনি ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। এরপর তিনি তাঁর বড় ভাই সামসুল হকের সঙ্গে ভারতে চলে যান। তাঁরা ভারতে বিস্ফোরক বা এক্সপ্লোসিভ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। এ সময় পাকিস্তান সরকার কর্মস্থলে অনুপস্থিত সরকারি চাকরিজীবীদের চাকরিতে যোগদানের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি তাঁদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় আনে। তাঁরা দুই ভাই এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগ কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। চাকরিতে যোগ দিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটাবেন। তাঁর ভাই সামসুল হক 'বীর প্রতীক' বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফিটার ছিলেন। তাঁরা দুই ভাই চাকরিতে যোগ দেন। নূরুল হক বিদ্যুৎকেন্দ্রের যে গাড়ি চালাতেন, তাতে এরই মধ্যে একদিন বিস্ফোরক উপাদান কৌশলে ভেতরে নিয়ে যান। তারপর দুই ভাই কেন্দ্রের মেশিনরুমে বিস্ফোরক স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য, প্রথম চেষ্টায় তা বিস্ফোরিত হয়নি। পরে তিনি একই কায়দায় আবার গাড়িতে করে বিস্ফোরক উপাদান ভেতরে নিয়ে যান। ৩ নভেম্বর রাতে তিনি ও তাঁর ভাই সামসুল হক বিস্ফোরকগুলো মেশিনরুমে স্থাপন করেন। এবার তাঁরা সফল হন। ৪ নভেম্বর ভোরে তাঁদের স্থাপন করা বিস্ফোরক বিস্ফোরিত হয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা শহরের একাংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ। তাঁরা দুই ভাই সেদিনই সেখান থেকে পালিয়ে যান।

নূরুল হক ছিলেন মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের একজন গেরিলাযোদ্ধা। পরে তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন।

ফখরুদ্দীন চৌধুরী, বীর প্রতীক

গ্রাম ও ইউনিয়ন ফুলবাড়ী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
বাবা বোরহানউদ্দীন চৌধুরী, মা ছাহেবা খাতুন চৌধুরী।
স্ত্রী [illegible] শাহাদাত চৌধুরী। তাঁদের তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫৬।

১৯৭১ সালের জুনের একদিন। ফখরুদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে নৌকাযোগে জলপথে রওনা হলেন একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা মাত্র দিন কয়েক আগে প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। সেদিন যাচ্ছিলেন জীবনের প্রথম অপারেশনে। উত্তেজনায় সবাই টগবগ করছেন। নৌকা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। মাঝপথে হঠাৎ ঘটল অন্য বিপত্তি। মাঝি ভয় পেয়ে নৌকা থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেল। তখন রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটা। তাঁরা কেউ নৌকা চালাতে জানেন না। মাঝিবিহীন নৌকা তখন দুলছিল। যেকোনো সময় সেটা ডুবে গিয়ে তাঁদের সলিলসমাধি ঘটাতে পারে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে অপারেশনে যাওয়া তো দূরের কথা, এখন জীবন বাঁচানোই মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়াল। শেষে তাঁরা নিজেরাই কোনো রকমে নৌকা চালিয়ে পশ্চাদপসরণ করলেন। এভাবেই ব্যর্থ হয়ে যায় তাঁদের প্রথম অপারেশন।

প্রথম অপারেশন ব্যর্থ হলেও জুনের শেষ দিক থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁরা বেশ কটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন। এসব অপারেশনে ফখরুদ্দীন চৌধুরী যথেষ্ট সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দেন। একটি অপারেশনে তাঁরা কিছুটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। তেলিখাল অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে তাঁদের দলের কয়েকজন শহীদ ও বেশ কয়েকজন আহত হন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফখরুদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অ্যামবুশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিমোলিশন ও আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেন।

এরপর ফখরুদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন দলকে সংযুক্ত করা হয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে। ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে ছাতক, গোয়াইনঘাট, গোবিন্দগঞ্জসহ বেশ কটি সম্মুখযুদ্ধে তিনি তাঁর দলসহ অংশ নেন। গোবিন্দগঞ্জ টি জংশন ও লামাকাজি ঘাটে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলতে ফখরুদ্দীন চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সিলেট শহর থেকে পশ্চিম দিকে লামাকাজি ঘাট। এর পশ্চিমে গোবিন্দগঞ্জ টি জংশন। এখান থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে ছাতকের দিকে। অন্যটি সুনামগঞ্জের দিকে। এখানেই ছিল সিলেট শহরকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সর্বশেষ প্রতিরক্ষাব্যূহ। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে সুনামগঞ্জ ও ছাতক থেকে পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে আসা পাকিস্তানি সেনারা অবস্থান নেয় এখানে। ১৪ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ করে গোবিন্দগঞ্জে। এ সময় ফখরুদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন গোবিন্দগঞ্জ টি জংশনের দক্ষিণে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর গোবিন্দগঞ্জ টি জংশন সকালের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

ফখরুদ্দীন চৌধুরী ১৯৭১ সালে একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখানে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। পরে নিজের এলাকা হয়ে ভারতে চলে যান। সেখানে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখানোর পর ইকো-১ প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেন। জুন থেকে ৫ নম্বর সেক্টরভুক্ত হয়ে তিনি অপারেশন শুরু করেন।

WWW.AMARBOI.COM

ফয়েজুর রহমান, বীর প্রতীক

দিঘুলিয়া, সদর, টাঙ্গাইল।
বাবা মনসুর রহমান, মা মাহফুজা খাতুন।
স্ত্রী খালিদা রহমান। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪২৩। গেজেটে নাম ফুল।

সকাল থেকেই কাদেরিয়া বাহিনীর একদল মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন। তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলে আছেন ফয়েজুর রহমান ফুল। সন্ধ্যার আগেই শেষ হলো প্রস্তুতি। তারপর মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিলেন বিভিন্ন জায়গায়। দলনেতা সংকেত দেওয়ামাত্র তাঁরা একযোগে শুরু করলেন আক্রমণ। গোলাগুলিতে আকাশ রক্তিম হয়ে উঠল। বিভিন্ন জায়গায় আগুনের লেলিহান শিখা আর ধোঁয়া। চারদিকে মানুষের ছোটাছুটি আর হইচই। যুদ্ধ চলতে থাকল। ফয়েজুর রহমানও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে চললেন। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া একটি মর্টার শেল এসে পড়ল তাঁর সামনে। মুহূর্তে চারদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। স্প্লিন্টার এসে লাগল তাঁর বুক, গলা ও উরুতে। রক্তক্ষরণে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন তিনি। একসময় জ্ঞান হারালেন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৩ বা ৪ ডিসেম্বরে। ঘটেছিল টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ঘাটাইল উপজেলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঢাকায় আক্রমণের জন্য মিত্রবাহিনী টাঙ্গাইলে বিমান থেকে ছত্রীসেনা নামানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নভেম্বরের শেষ দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন টাঙ্গাইলে আসেন। তিনি কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান আবদুল কাদের সিদ্দিকীর সহায়তায় ছত্রীসেনা অবতরণের জন্য তিনটি স্থান নির্ধারণ করেন। এর একটি ছিল ঘাটাইল উপজেলার ব্রাহ্মণশাসন-মোগলপাড়ার পশ্চিমের তিন-চার বর্গমাইলের গোরাঙ্গীর চক। ছত্রীসেনারা কোন দিন সেখানে অবতরণ করবেন, প্রথম দিকে কাদের সিদ্দিকীর সেটা জানা ছিল না। এদিকে ওই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দল জামালপুর ও শেরপুর থেকে পশ্চাদপসরণ করে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সড়কের এলেঙ্গা ও ঘাটাইলে সমবেত হয়। ফলে ঘাটাইলে ছত্রীসেনা নামানোর বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কাদের সিদ্দিকী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। রাতেই তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান। এ যুদ্ধে ফয়েজুর রহমানও অংশ নেন। সারা রাত সেখানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মর্টার শেলের স্প্লিন্টারের আঘাতে ফয়েজুর রহমান গুরুতর আহত হন। পরে সহযোদ্ধারা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে যান গোপালপুর উপজেলার গুলিপচা গ্রামে।

ফয়েজুর রহমান পড়াশোনা শেষ করে ১৯৭১ সালে চাকরির অপেক্ষায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। ৩ এপ্রিল টাঙ্গাইলের প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে তিনি আশ্রয় নেন ভূঞাপুরে। পরে কাদেরিয়া বাহিনী গঠিত হলে ওই বাহিনীতে যোগ দেন। বিভিন্ন স্থানে বীরত্বের সঙ্গে গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধ করেন তিনি।

AMARBOI.COM

ফারুক-ই-আজম, বীর প্রতীক

১৯ মেহেদিবাগ সড়ক, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।
বাবা মনির আহমদ চৌধুরী, মা জান্নাতুল ফেরদৌস।
স্ত্রী শামিম আরা বেগম। তাঁদের চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৯৪।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে ফারুক-ই-আজম উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন। সে সময় তিনি খুলনায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে তিনি চট্টগ্রামে পৌঁছান।

৬ মে তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের হরিণা ইয়ুথ ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। এই অবস্থায় তিনি একদিন শুনলেন, নৌবাহিনীর জন্য মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করা হবে। তিনি লাইনে দাঁড়ালেন। টিকে গেলেন। পলাশিতে দুই মাসের প্রশিক্ষণ শেষে ১ আগস্ট অপারেশনের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র সমন্বিত যুদ্ধাভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট'। সারা দেশে একই সময়ে সব বন্দরে একযোগে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দরে আক্রমণের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০ সদস্যের তিনটি দল নির্বাচন করা হয়। একটি দল চট্টগ্রামে এসে পৌঁছাতে পারেনি। বাকি দুটি দলের ৩৭ জন সদস্য অংশ নেন। অধিনায়ক এ ডব্লিউ চৌধুরী। উপ-অধিনায়ক ফারুক-ই-আজম। নৌ-কমান্ডোদের সঙ্গে ছিল ছয় কেজি ওজনের লিমপেট মাইন। বিশেষ ধরনের চুম্বক দিয়ে জাহাজের গায়ে মাইনটি লাগিয়ে প্লাস্টিকের মুখটি খুলে দিতে হয়। এই অপারেশনে পাকিস্তানি তিনটি বড় জাহাজ—আল আব্বাস, হরমুজ ও কাদের বক্স এবং জেটি পন্টুন, বার্জ ও কোস্টাল শিপ ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। এসব অপারেশন মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ঘটনাটি আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়।

ফারুক-ই-আজম এরপর বেশ কয়েকবার অপারেশনে অংশ নেন।

ফারুক লস্কর, বীর প্রতীক

গ্রাম আড়াল, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
বাবা নূরউদ্দিন লস্কর, মা ফিরোজা আক্তার।
অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৫৮। শহীদ ১৯৭১।

প্রতিদিন এক-দুই ঘণ্টা পরপরই গুলির শব্দে বিদ্যমান নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান খান হয়ে যেতে থাকে। অবশ্য গুলির এমন শব্দ এখন ফারুক লস্করসহ তাঁর সহযোদ্ধাদের কান-সওয়া হয়ে গেছে। কয়েক দিন আগে তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সতর্ক অবস্থায় নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থানে বসে আছেন। যেকোনো দিন পাকিস্তানি সেনারা এসে তাঁদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা এসে আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালাল। ফারুক লস্করসহ তাঁর সহযোদ্ধারাও প্রস্তুত ছিলেন। বিপুল বিক্রমে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধারাই জয়ী হলেন। কিন্তু শহীদ হলেন ফারুক লস্করসহ কয়েকজন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের। ঘটেছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ভোমরায়।

ভোমরা সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত। এর অবস্থান জেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত সীমান্তে। ভোমরা থেকে একটি সড়ক সাতক্ষীরা হয়ে খুলনার সঙ্গে যুক্ত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভোমরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়। এপ্রিলের শেষ দিক থেকে ভোমরা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অসংখ্য যুদ্ধ হয়। ভোমরার বিরাট এক অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে ছিল। ১৬ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা তিন ইঞ্চি মর্টার দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভোমরার প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ চালান। এতে পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ২১ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা আবার ভোমরায় পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ চালান। তাঁদের এই আক্রমণ আগের তুলনায় ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক শক্তিশালী। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১২-১৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অনেক গোলাবারুদ হস্তগত করেন। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এবং ভোমরা অঞ্চলে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে ২৩ নভেম্বর পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি সেনারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এরপর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবার ভোমরায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ করে। তাদের এই আক্রমণ ছিল আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করার পর সেখানে কয়েক ঘণ্টা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে ফারুক লস্করসহ কয়েকজন শহীদ হন। পরে সহযোদ্ধারা তাঁদের মরদেহ সমাহিত করেন সেখানেই।

ফারুক লস্কর ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরের ৫ নম্বর উইংয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। পরে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের ভোমরা সাব-সেক্টরের অধীনে।

ফোরকান উদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম খোল্লাকান্দি, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা রামনগর মণিপুরিপাড়া, আশীদ্রোণ ইউনিয়ন, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। বাবা আবদুস সাত্তার মিয়া, মা হাজেরা খাতুন। স্ত্রী সমীরণ বেগম (শামসুন্নাহার)। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৩৯।

মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক একদিন খবর পেলেন, জয়মনিরহাটে পাকিস্তানি সেনারা আনন্দোৎসব করবে। আনন্দোৎসবের দিন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর তিনি ফোরকান উদ্দিনকে ঝটিকা আক্রমণের নির্দেশ দেন। জয়মনিরহাট কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলায়। ১৯৭১ সালে সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি অবস্থান ছিল। বেশ আধুনিক ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল তারা। সে তুলনায় মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ছিল খুবই সীমিত। মুখোমুখি যুদ্ধ করা তাঁদের জন্য ছিল একটা দুঃসাধ্যের ব্যাপার। ফোরকান উদ্দিন তাই গেরিলা কায়দায় অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন।

নির্ধারিত রাতে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে চলছে গানবাজনা। এই আয়োজন করেছে মালেক নামের এক রাজাকার। পাকিস্তানি সেনাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাজাকাররা কয়েকজন বাঙালি নারীকেও ধরে এনেছে। ওই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর কোনো তৎপরতা ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তানি সেনারা তাই বেশ নির্ভাবনায় আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি নিয়ে এত দিন তারা কল্পনাও করেনি।

রাতের অন্ধকারে ফোরকান উদ্দিনসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন সেখানে। তখন মধ্যরাত। আনুমানিক ১২টা। নিঃশব্দে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন আনন্দ-জলসার দিকে। একদম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে পৌঁছে গেছেন। আক্রমণ শুরু করবেন, এ সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। ফলে তাদের কয়েকজন দ্রুত ঢুকে যায় বাংকারে। ফোরকান উদ্দিন সেই বাংকার লক্ষ্য করে কয়েকটি গ্রেনেড ছুড়ে মারেন। গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। হকচকিত রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনারা ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। এই অবস্থাতেই মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার মালেককে আটক করতে সক্ষম হন। বাকি পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা তাদের সুরক্ষিত অবস্থানে গিয়ে গোলাগুলি চালিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। রাজাকার মালেককে নিয়ে তাঁরা দ্রুত এলাকা ত্যাগ করেন। মূলত ফোরকান উদ্দিন এই গেরিলা অপারেশনে নেতৃত্ব দেন।

ফোরকান উদ্দিন ১৯৭১ সালে রংপুর ইপিআর উইংয়ের ওয়্যারলেস অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধ পর্বে তিনি ইপিআরের সিগন্যাল ইউনিটের সঙ্গে কুড়িগ্রামের কাউনিয়ায় অবস্থান নেন। পরে ভারতে চলে যান। পরবর্তী সময়ে তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। তবে বেশির ভাগ যুদ্ধে তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের খবর আদান-প্রদান করা। মুক্তিবাহিনীর বড় দলের সঙ্গে ওয়্যারলেস অপারেটর হিসেবে তিনি থাকতেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী কুড়িগ্রামের রায়গঞ্জে বেশ কয়েক দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে। তিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট সামাদের (আশফাকুস সামাদ বীর উত্তম) নেতৃত্বাধীন দলে। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশের ভেতর পড়েন। পাকিস্তানি সেনাদের আকস্মিক আক্রমণে লেফটেন্যান্ট সামাদসহ অনেকে শহীদ হন। ফোরকান উদ্দিন অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। পরে মুক্তিবাহিনীর অপর দল এসে তাঁকে উদ্ধার করে।

AMARBOI.COM

বজলুল মাহমুদ, বীর প্রতীক

গ্রাম বালিয়াকান্দি, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা। বাবা এ এস ইসমাইল, মা মাহমুদা বেগম। স্ত্রী আর্জুমান্দ বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩১৩। গেজেটে নাম মাহমুদ।

গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। জনমানুষের কোনো সাড়া নেই। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এ রকম নিস্তব্ধতাকে সঙ্গী করে গ্রিন রোডের ভূতের গলির গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনের কয়েকজন সদস্য। তাঁরা হলেন: বজলুল মাহমুদ, শেখ আবদুল মান্নান, পটু, সিদ্দিক ও আলমগীর। সংখ্যায় মোট পাঁচজন। নিঃশব্দে এ গলি সে গলি দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের এ পথের সামনেই একটি জলাশয়। সেখানে কোথাও বুক, কোথাও গলা পানি (তখন ভূতের গলি ও ক্রিসেন্ট রোডের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বড় জলাশয় ছিল। এই অন্ধকারেই অস্ত্র ও গোলাবারুদ দুই হাতে উঁচু করে ধরে তাঁরা জলাশয়টি পার হন।

অনতিদূরে একটি স্কুলঘর। সেখানেই এখন আস্তানা গেড়েছে পাকিস্তানি মিলিশিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনীর একটি দল। বজলুল মাহমুদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা নিঃশব্দে এর চারদিক ঘিরে অবস্থান নিলেন। তখন রাত প্রায় একটা। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তাঁরা স্কুলের ওপর চার্জ করেন ফসফরাস গ্রেনেড। মুহূর্তে তা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। আগুনের লেলিহান শিখায় চারদিক আলোকিত। সেই আলোয় তাঁরা দেখতে পেলেন পাকিস্তানি মিলিশিয়াদের দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছোটাছুটির দৃশ্য। ক্ষিপ্রগতিতে বজলুল মাহমুদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা অবস্থান নেন স্কুলগেটের সামনে। হুড়োহুড়ি করে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছিল মিলিশিয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে থাকা অস্ত্রগুলো। তারপর দ্রুত সেখান থেকে তাঁরা সরে পড়েন। ফিরে যান নিজেদের গোপন আস্তানায়।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২ আগস্ট মধ্যরাতে ঘটেছিল ঢাকার ক্রিসেন্ট রোডের নিউ মডেল স্কুলের (স্বাধীনতার পর শুক্রাবাদে স্থানান্তর করা হয়েছে) মিলিশিয়া ক্যাম্পে। পরে বজলুল মাহমুদ সংবাদ নিয়ে জানতে পারেন, তাঁদের আক্রমণে নিহত হয় পাকিস্তানি পাঁচজন মিলিশিয়া এবং আহত হয় কয়েকজন।

১৯৭১ সালে বজলুল মাহমুদ এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২ নম্বর সেক্টরে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। তাঁর দলনেতা ছিলেন আবদুল আজিজ। তিনি ঢাকার ধানমন্ডি, কলাবাগান, গ্রিন রোড ও কাঁঠালবাগানে সফল অপারেশন চালান। এসব অপারেশনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর মধ্যে গ্রিন রোডের নূর হোটেলের সামনের অপারেশন ছিল উল্লেখযোগ্য। এই অপারেশনের সংবাদ ২২ আগস্ট বিবিসি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। ১৫ নভেম্বর বজলুল মাহমুদ পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি মুক্তি পান।

AMARBOI.COM

বদিউজ্জামান টুনু, বীর প্রতীক

ঝাউতলার মোড়, লক্ষ্মীপুর, মহানগর, রাজশাহী।
বাবা আবদুল গফুর, মা তাইসন নেছা।
স্ত্রী ফিরোজা জামান। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬৮।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের শেষ বা সেপ্টেম্বর মাসের শুরু। মুক্তিবাহিনীর ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাব-সেক্টরে সিদ্ধান্ত হলো, রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে রাজশাহীর গোদাগাড়ীর অভয়া সেতু ধ্বংস করা হবে। বদিউজ্জামান টুনু ও তাঁর সহযোদ্ধারা তৈরি হয়েই ছিলেন। দ্রুত তাঁরা রওনা হলেন। নির্ধারিত সময়ে সমবেত হলেন সীমান্তবর্তী ক্যাম্পে। জায়গাটি বাংলাদেশের ভেতরে। মুক্তিযোদ্ধারা সেখানকার স্থানীয় একজনকে পাঠালেন রেকি করতে। সে ফিরে এসে কোথায় কী আছে জানিয়ে চলে গেল। পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন্য পরে আবার তার আসার কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। কিন্তু স্থানীয় ওই লোক আর ফিরে এল না। বাধ্য হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রওনা হলেন লক্ষ্যস্থলের দিকে। ঝুঁকিপূর্ণ পথ। দাঁড়ের নৌকা করে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাঁরা লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি গেছেন, এ সময় রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে গুলির শব্দ। হঠাৎ আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা হকচকিত। সবাই নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন পানিতে। তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে যেতে থাকল শত শত গুলি। তাঁদের অস্ত্র সব ছিল নৌকায়। নৌকা ভেসে যাচ্ছিল পাকিস্তানি সেনাদের দিকে। বদিউজ্জামান ঝুঁকি নিয়ে অনেক কষ্টে সে নৌকা টেনে আনেন।

কিছু সময় পর নৌকা থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা গুলি শুরু করলেন। তাঁরা প্রথম দিকে অন্ধকারে অবস্থান নেওয়ার মতো উপযুক্ত জায়গা পাচ্ছিলেন না। চারদিকেই পানি। শেষে একটি উঁচু জায়গা পাওয়া যায়। সেখানে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন তাঁরা। দু-তিন ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের দিক থেকে গুলি থেমে যায়। ঠিক তখনই মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পেলেন দূরে কয়েকটি গাড়ির হেডলাইটের আলো। পাকিস্তানি সেনারা নতুন শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে। এ অবস্থায় সেখানে অবস্থান করা তাঁদের জন্য নিরাপদ ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত ওই এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে পশ্চাদপসরণ করেন।

বদিউজ্জামান টুনু ও তাঁর সহযোদ্ধারা সেদিন ওই সেতু ধ্বংস করতে পারেননি। ওই স্থানীয় লোক, যে রেকি করতে গিয়েছিল, সে তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেটা তাঁরা পরে বুঝতে পারেন। লোকটি পাকিস্তানি সেনাদের কাছে তাঁদের আগমনের খবর পৌঁছে দেয়।

বদিউজ্জামান টুনু ১৯৭১ সালে একটি ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ৪২। ভারতে গিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে। গেরিলাযুদ্ধের পাশাপাশি সম্মুখযুদ্ধও করেন তিনি।

AMARBOI.COM

বশির আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম ডুমুরতলা, ইউনিয়ন ধানুয়া, বকশীগঞ্জ, জামালপুর।
বর্তমান ঠিকানা ব্র্যাক সড়ক, চরিয়াপাড়া, বকশীগঞ্জ।
বাবা লাল মামুদ, মা কিশোরী বেওয়া। স্ত্রী রোকেয়া বেগম।
তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৯৭।

১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা। কামালপুরে টানা কয়েক মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাদের অনেকটা কোণঠাসা করে ফেলা হলেও তারা এখনো আত্মসমর্পণ করেনি। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার গুরবক্স সিং গিল আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের কামালপুর ক্যাম্পের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হাসান মালিকের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি পাঠাবেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু তিনি যাঁকেই বলছেন, ওই দায়িত্ব পালনে কেউই রাজি হচ্ছেন না। অবশেষে গিল রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের ভেতর থেকে একজনও কি জীবন দিতে পারবে না?' তখন বশির আহমেদ রাজি হলেন। কামালপুর ক্যাম্পের কমান্ডারকে দেওয়ার জন্য আত্মসমর্পণের আহ্বানসংবলিত চিঠি ও সাদা পতাকা তুলে দেওয়া হলো তাঁর হাতে।

কামালপুর ক্যাম্পের কাছাকাছি গিয়ে বশির আহমেদ প্রথমে সাদা সোয়েটার তুলে ধরে নাড়তে লাগলেন। পরে সাদা পতাকা নাড়িয়ে পাকিস্তানি সেনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। সাড়া মেলে। কিছুক্ষণ পর তারা তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পাকিস্তানি একজন কর্মকর্তা চিঠি ও পতাকা নিয়ে তাঁকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখেন। তারা তাঁকে রুটি, ডাল ও পানি খেতে দেয়। তিনি রীতিমতো ভড়কে যান। ভাবতে থাকেন—রুটিই খাবেন, নাকি বাঁচার চেষ্টা করবেন। এ সময় ভারতের যুদ্ধবিমান আকাশে চক্কর দিতে দেখা যায়। বিমান থেকে ক্যাম্পের আশপাশে কয়েকটি বোমা ফেলে আতঙ্কও সৃষ্টি করা হয়। পাকিস্তানি সেনারা বেলা সোয়া তিনটা পর্যন্ত তাঁকে আটকে রাখে। এদিকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে মেরে ফেলেছে মনে করে সঞ্জু নামের আরেকজন মুক্তিযোদ্ধাকে সাদা পতাকা হাতে দিয়ে কামালপুর ক্যাম্পে পাঠানো হয়। সে সময় আবার ভারতীয় যুদ্ধবিমান এসে বোমা ফেলতে থাকে। এতে দুই-তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এ অবস্থায় সঞ্জু আর বশির আহমেদ ভারতীয় বিমান লক্ষ্য করে সাদা পতাকা দেখাতে থাকেন। অবস্থা পুরোপুরি বেগতিক দেখে কামালপুরের পাকিস্তানি অধিনায়ক আত্মসমর্পণের ইচ্ছার কথা জানিয়ে চিঠির জবাব দিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেন। শেষ পর্যন্ত কামালপুর ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন হাসান মালিকসহ ১৬০ জন পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে।

বশির আহমেদ ১৯৭১ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এপ্রিলে ভারতে চলে যান। মে মাসের পর সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে কামালপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন।

AMARBOI.COM

বাদশা মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম আলাদাদপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর।
বাবা মফিজ উদ্দীন, মা আক্তারুননেছা।
স্ত্রী জাহানারা বেগম।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৭। মৃত্যু ১৩ আগস্ট ১৯৭২।

বাদশা মিয়া চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধের আগে বিয়ে করেন। কিছুদিন পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তিনি যুদ্ধে যোগ দেন।

জাহানারা বেগম বলেন, 'বিয়ের পরই আমার স্বামী যুদ্ধে গেল। তখন ওনার কোনো ক্ষতি হয়নি। স্বাধীনের পর নকশালদের সঙ্গে যুদ্ধে উনি আহত হয়ে মারা গেলেন। বুকে অনেক আগুন নিয়ে বেঁচে আছি। এলাকার মানুষ খেতাব পাওয়ার কথা দূরের কথা, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামই জানে না। মনে রাখেনি তাঁর নাম—সব মুছে গেছে। তাঁর নামে যদি লক্ষ্মীপুরে কিছু করা হতো, তাহলে তাঁর আত্মা শান্তি পেত, আমিও শান্তি পেতাম।'

বাদশা মিয়া যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টরের অধীনে। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর পুনর্গঠিত দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন ফেনীর বিলোনিয়া, সলিয়ারদীঘি, পরশুরামসহ কয়েকটি স্থানে তিনি যুদ্ধ করেন।

পরশুরাম বিলোনিয়া সীমান্তের কাছাকাছি। জেলা সদর থেকে মির্জানগর রেলপথের পূর্ব পাশে ১৯৭১ সালে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। নভেম্বরের প্রথম দিকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিলোনিয়া ও পরশুরামে আক্রমণ করে। কয়েক দিন এখানে যুদ্ধ চলে। বাদশা মিয়া এ যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব দেখান। মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে পরশুরাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। ৯ বা ১০ নভেম্বর পরশুরাম মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানি সেনাদের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে দেখা যায়, চারদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। ধানখেত, বাংকার, খালের পানি—সব জায়গায়। যারা আহত হয়ে পালাতে চেয়েছিল, তারা পালাতে পারেনি। অসহায়ভাবে কাতরাচ্ছে বাঁচার আশায়। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বেশির ভাগই পরে মারা যায়। তিন-চারজন বেঁচে থাকে। অক্ষত অবস্থায় কয়েকজনকে মুক্তিযোদ্ধারা বন্দী করেন। এ যুদ্ধের পর ফেনী এলাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ে।

WWW.AMARBOI.COM

বাহার উদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম নোয়াপুর, ইউনিয়ন চিওড়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
বর্তমান ঠিকানা তালপুকুর পাড়, মহানগর, কুমিল্লা।
বাবা জুড়া মিয়া মাস্টার, মা হাফেজা খাতুন। স্ত্রী নাজমা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩৮। গেজেটে নাম বাহের।

একাত্তরে বাহার উদ্দিন রেজা ছিলেন নবম শ্রেণীর ছাত্র। ২৬ মার্চ সকালে কুমিল্লা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে। কুমিল্লা শহরের মানুষ মিছিল করে। সেই মিছিলে বাহারও যোগ দেন। ওই রাতেই কুমিল্লা পুলিশ লাইন আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। তখন দক্ষিণ চর্থা এলাকায় পালিয়ে যান বাহার। পরদিন ২৭ মার্চ ভোরে যান চৌদ্দগ্রামের নোয়াপুরে। সেখানে কয়েকজন মিলে জগন্নাথদীঘি ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে এক অবাঙালি ইপিআর সদস্যকে আটক করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সৈয়দ আহমেদ, পেয়ার আহমেদ, সাকী চৌধুরী, পান্না, জাকারিয়া প্রমুখ। ২৮ মার্চ সকালে চৌদ্দগ্রামের আমজাদের বাজার সেতু ও চিওড়া সেতু তাঁরা ভেঙে ফেলেন। মূলত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখার জন্য সেতু ভাঙা হয়। ২৯ মার্চ চৌদ্দগ্রামের আবদুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে তাঁরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দগ্রাম থানার অস্ত্র লুট করে সেই অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ করেন।

চৌদ্দগ্রামের পতন হলে তিনি কুমিল্লার বিবির বাজার দিয়ে সোনামুড়ায় যান। সেখানে জেলা আওয়ামী লীগের নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অধ্যাপক খোরশেদ আলম একটি স্লিপ দিয়ে তাঁকে মতিনগরে মেজর এ টি এম হায়দারের (বীর উত্তম) কাছে পাঠান। তাঁর অধীনে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন বাহার। এপ্রিলের শেষের দিকে বিবির বাজারে আকবর হোসেনের (বীর প্রতীক, পরে লে. কর্নেল ও বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী) নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করে। তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এরপর কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার জগন্নাথবাড়ীতে মাইন বসিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্ষতি করার চেষ্টা করেন তিনি। এর আগে মুক্তিবাহিনীর ৫ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মীর শওকত আলীর (বীর উত্তম) মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান ও বোনকে তিনি জগন্নাথবাড়ী থেকে ভারতে নিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে ভারতের মতিনগর ও কাঁঠালিয়ায় তিনি আবার প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে গেরিলাযুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে। মেজর হায়দারের নির্দেশে বাহারসহ একদল গেরিলাযোদ্ধা কুমিল্লা শহরের আটটি স্থানে একযোগে বোমা হামলা চালান। ছাতিপট্টিতে (তৎকালীন কমার্স ব্যাংক এলাকা) বোমা হামলা চালাতে গিয়ে বোমার স্প্লিন্টারে আহত হন তিনি। তাঁর বাঁ হাতের আঙুলসহ পায়ে ও শরীরে আঘাত লাগে। অপারেশনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা জামাল, খোকন, তাহের ও সাকী। এর কিছুদিন পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরা পরিদর্শনে আসেন। সে সময় তিনি পঙ্গু ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে জিবি হাসপাতালে যান। সেখানে জয় বাংলা ওয়ার্ডের ৯ নম্বর বেডে বাহার উদ্দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিশোর বাহার উদ্দিনকে দেখে ইন্দিরা গান্ধী অভিভূত হন এবং তাঁর সাহসের প্রশংসা করেন।

মকবুল আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম নিজ ছত্রিশ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
বাবা মন্তাই আলী, মা জুবেদা খাতুন।
স্ত্রী শরিফুন নেছা। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৮৯। মৃত্যু ১৯৯৯।

মকবুল আলী ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ১০ নম্বর উইংয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। রৌমারী এলাকার কোদালকাটির যুদ্ধে অংশ নেন। এ যুদ্ধের বিবরণে তাঁর নাম পাওয়া যায়। রৌমারীর বেশির ভাগ এলাকা পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তাঞ্চল ছিল। কেবল কোদালকাটি অল্প কিছু সময়ের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে ছিল। ১৩ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের কোদালকাটি অবস্থান থেকে বেশ কিছু গানবোট, লঞ্চ ও বার্জ নিয়ে রৌমারী দখল করার জন্য রাজীবপুরের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। মুক্তিবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মকবুল আলী। কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ চলে। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পিছিয়ে গিয়ে আবার কোদালকাটিতে অবস্থান নেয়। ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবার গানবোট, স্টিমার, লঞ্চ নিয়ে রাজীবপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ চালায়। একটানা তিন দিন যুদ্ধ চলে। এই তিন দিনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাঁচবার ঝটিকা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করেন।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনীই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোদালকাটি অবস্থানে আক্রমণ চালায়। মূল আক্রমণে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মকবুল আলী। চূড়ান্ত আক্রমণের নির্ধারিত সময় ছিল ১ অক্টোবর। সেদিন রাত ১০টার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সব দল কোদালকাটির বিভিন্ন স্থানে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। পরদিন ভোরে শুরু হয় যুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনারা কয়েকবার মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালায়। কিন্তু তারা মুক্তিযোদ্ধাদের হটিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অনেক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ৪ অক্টোবর পাকিস্তানি অবস্থান থেকে আর কোনো গুলি আসছিল না। এ ঘটনা মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবিয়ে তোলে। এ সময় দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা মকবুল আলী তাঁর দলের (সেকশন) মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নদী অতিক্রম করেন। ওপাড়ে গিয়ে তাঁরা নিশ্চিত হন যে পাকিস্তানি সেনারা কোদালকাটি থেকে পালিয়ে গেছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে কোদালকাটি মুক্ত হওয়ার খবর।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মকবুল আলী কোথায় আছেন, কী করছেন সে সম্পর্কে তাঁর পরিবারের কোনো ধারণা ছিল না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর অনেকে তাঁর স্ত্রীকে বিধবার পোশাক পরার পরামর্শ দেন। তিনি তখন একমাত্র সন্তানকে নিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় থেকে একপর্যায়ে বাপের বাড়ি চলে যান। যুদ্ধশেষে ডিসেম্বরের শেষ দিকে মকবুল আলী বাড়ি ফেরেন।

AMARBOI.COM

মকবুল হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম ফতেহাবাদ, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা টাটেরা, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। বাবা আবদুল আজিজ, মা আমেনা খাতুন। স্ত্রী রোকেয়া বেগম। তাঁদের চার মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০২। গেজেটে নাম মোহাম্মদ মকবুল হোসেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি বড় যুদ্ধ আমাদের বিজয়ের পটভূমি তৈরি করে। ধলই যুদ্ধ ছিল এমন এক যুদ্ধ, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ২৭ বা ২৮ অক্টোবর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বিত শক্তি ধলই বিওপি দখলের জন্য যুদ্ধ শুরু করে। পাঁচ দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।

ধলই বিওপির পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণের জন্য নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে অক্টোবরের মাঝামাঝি কমলপুরে একত্র করা হয়। একটি দলে ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবিলদার মকবুল হোসেন। ২৭ অক্টোবর ভোররাত সাড়ে তিনটার দিকে তাঁরা আক্রমণ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় অর্থাৎ আক্রমণে যাওয়ার আগেই তাঁদের প্লাটুন ও আরেকটি প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আক্রান্ত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের গোলাগুলির ব্যাপকতা এমনই ছিল যে মকবুল হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা কিছুটা হলেও থমকে যায়। কিন্তু তাঁরা দমে গেলেন না। এর মধ্যেই তাঁরা 'ফায়ার অ্যান্ড মুভ' পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। উঁচু টিলার ওপর পাকিস্তানি সেনাদের একটি এলএমজি পোস্ট ছিল। সেখান থেকে অনবরত গুলিবর্ষণ হচ্ছিল। ফলে মুক্তিবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। মকবুল হোসেন গুলি করতে করতে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের একদম কাছাকাছি পৌঁছে যান। এ সময় গুলি এসে লাগে তাঁর পায়ে। তাঁর অধিনায়কও আহত হন। তিনি তাঁর পাশেই ছিলেন। সহযোদ্ধা আবদুর রহমানের বুকে গুলি লাগে। হামিদুর রহমানের বুক ও কপাল গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। হতাহত হন তাঁদের প্রায় ১৫ জন। তাঁদের প্রথম দিনের আক্রমণ অভিযানের পরিসমাপ্তি এভাবে ঘটলেও যুদ্ধ মোটেও থেমে থাকেনি। কয়েক দিন সেখানে যুদ্ধ চলে। অবশেষে ৩ নভেম্বর ধলই মুক্ত হয়।

মকবুল হোসেন এর আগে আরও কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও জামালপুর জেলার কামালপুরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ৩১ আগস্ট কামালপুরের যুদ্ধে তাঁদের দলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধে তাঁদের অধিনায়ক ছিলেন মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল)। তিনি পরে বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি সেনারা কোনো উঁচু জায়গা থেকে তাঁদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি ঘোষণা দেন, ওই ওপি অর্থাৎ অবজারভেশন পোস্ট যিনি খুঁজে বের করতে পারবেন, তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। তখন মকুবল হোসেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একাই পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের মধ্যে ঢুকে সেই ওপি খুঁজে বের করেন। ওপিতে একজন পাকিস্তানি সেনা ছিল। তাকে তিনি ধরে আনেন।

মকবুল হোসেন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁরা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

AMARBOI.COM

মঞ্জুর আহমেদ, বীর প্রতীক

বর্তমান ঠিকানা পুরাতন ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা।
বাবা আবদুস সুলতান মল্লিক, মা মনিরুননেসা বেগম।
স্ত্রী গুলশান মঞ্জুর। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২।

মধ্যরাতে মঞ্জুর আহমেদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের কাছাকাছি তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে অবস্থান নেন। রাত শেষ হয়ে আসছে। এ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের ওপর আকস্মিকভাবে হামলা করে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও মঞ্জুর আহমেদের প্রচেষ্টায় দ্রুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালান। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। দুপুরের পর পাকিস্তানি আক্রমণের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। মঞ্জুর আহমেদ এতে বিচলিত না হয়ে তাঁর দলের নেতৃত্ব দিয়ে চললেন। মুক্তিযোদ্ধাদেরও মনোবল বেড়ে গেল। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবরে ঘটেছিল গোয়াইনঘাটে।

গোয়াইনঘাট সিলেট জেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা অবস্থান। সুরমা নদী গোয়াইনঘাট উপজেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। ছাতক অপারেশনের পর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গোয়াইনঘাট আক্রমণের জন্য সমবেত হয় ৫ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে (ভোলাগঞ্জ)। লেংগুরা গ্রামের দক্ষিণে ব্রিজহেড তৈরির মাধ্যমে নদী অতিক্রম করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্ব পারের প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্বে থাকে আলফা কোম্পানি। ওই কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন মঞ্জুর আহমেদ। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা ২৩ অক্টোবর রাতে সেখানে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। কিন্তু স্থানীয় সহযোগীদের মাধ্যমে প্যাকিস্ত্যানি সেনাবাহিনী তাঁদের উপস্থিতি টের পায়। ২৪ অক্টোবর ভোর আনুমানিক সাড়ে পাঁচটার দিকে আকস্মিকভাবে তারা আক্রমণ চ্যালায়। সে সময় মুক্তিযোদ্ধারা পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা এতে কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় মঞ্জুর আহমেদ নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনরায় সংগঠিত করে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। দুপুরের পর হেলিকপ্টারযোগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি নতুন দল এসে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টাপাল্টি আক্রমণ চলে। পুরো গোয়াইনঘাট এলাকা রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। কোনো কোনো জায়গায় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধও হয়। পাকিস্তানি সেনাদের ফায়ার পাওয়ার এতই বেশি ছিল যে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কোনো একটি অবস্থানেও টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। তার পরও তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যান।

মঞ্জুর আহমেদ ১৯৭০-৭১ সালে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে যোগদানের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দিয়ে প্রথমে ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। মে মাসে মুহুরী নদীর একটি সেতু ধ্বংসে তিনি অংশ নেন। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামে যান। জুনে তাঁকে প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে ছাতক, রাধানগর ও গোয়াইনঘাট আক্রমণে অংশ নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম ধানুয়া, বকশীগঞ্জ, জামালপুর।
বাবা তসলিমউদ্দীন সরকার, মা সখিনা বেগম।
স্ত্রী মনোয়ারা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৯৯।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন মতিউর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। তখন তাঁর বয়স ১৯। তুরায় প্রশিক্ষণ নেন তিনি। প্রশিক্ষণ শেষে ১১ নম্বর সেক্টরের অধীন মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে যোগ দেন। এখানে সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন লে. আবদুল মান্নান।

সীমান্তবর্তী গ্রাম কামালপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী একটি ক্যাম্প। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কামালপুর ও এর আশপাশের এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর একাধিকবার যুদ্ধ হয়।

মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে কয়েকটি দলের মুক্তিযোদ্ধারা ২৯ নভেম্বর রাতে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করেন। সেদিন তাঁরা 'জয় বাংলা' স্লোগানসহ গ্রেনেড চার্জ ও গুলি করতে করতে কামালপুর ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘাঁটির কাছাকাছি যাওয়ামাত্র পাকিস্তানি বাহিনী তাঁদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। তখন অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেখানে হতাহত হন। মতিউর রহমান নিজেও গুলিবিদ্ধ হন। সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে মহেন্দ্রগঞ্জে নিয়ে যান। এরপর তুরায় ও পরে পুনা হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়।

মতিউর রহমান ধানুয়া, কামালপুর, [illegible], দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার আন্ডার চর, কাঠার বিল, জিগাবাড়ী এবং শ্রীবরদী উপজেলার কর্ণজোড়া ও বাট্টাজোড় যুদ্ধেও অংশ নেন।

মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম সাতঘরিয়া, ইউনিয়ন হলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
বাবা আবদুল আলী শেখ, মা জুলেখা বেগম।
স্ত্রী লাইজু বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩০১।

মতিউর রহমান ১৯৭১ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। মা-বাবাকে না বলেই মে মাসের কোনো একদিন তিনি ভারতে চলে যান। ভারতীয় নৌবাহিনীতে তিনি তিন মাস প্রশিক্ষণ নেন। যুদ্ধে তাঁর দায়িত্ব ছিল মাইন দিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া।

যুদ্ধ শেষে মতিউর আবার স্কুলে ভর্তি হন। এসএসসি পাস করে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভর্তি হলেও শেষ পর্যন্ত পাস করা হয়নি। পরে তিনি ঢাকার একটি পোশাক কারখানায় চাকরি নেন। এর আয় দিয়েই তাঁর দিন চলতে থাকে। মতিউর রহমান পরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে তিনি সত্যিই 'বীর প্রতীক' খেতাব পেয়েছেন।

মতিউর রহমান জানান, তিনি ১০ নম্বর সেক্টরের অধীনে নৌ-কমান্ডো ছিলেন। তাঁরা ভারত থেকে এসে পাকিস্তানি বাহিনীর জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার ভারতে চলে যেতেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে তিনটি অপারেশনে অংশ নেন। তিনটি অপারেশনই ছিল নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীতে। প্রথমটি কাঁচপুর সেতুসংলগ্ন স্থানে। দ্বিতীয়টি নারায়ণগঞ্জ টার্মিনাল ঘাট এবং তৃতীয়টি গলাগাছিয়ায়। তিনি প্রথম অপারেশনে অংশ নেন অক্টোবরে। রাত দেড়টার দিকে শুরু করেন অপারেশন। তাঁদের দলে ছিলেন মোট পাঁচজন। সবার বুকে মাইন বাঁধা। ওই দিন রাতে তাঁরা কাঁচপুর সেতুর কাছে জাহাজে মাইন লাগিয়ে চলে আসেন। পরে সময়মতো মাইনটি বিস্ফোরিত হয়।

মতিউর রহমান পোশাক কারখানার চাকরি থেকে অবসর নেন।

মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম চরমল্লিকপুর, ইউনিয়ন মল্লিকপুর, লোহাগড়া, নড়াইল। বর্তমান ঠিকানা মিরপুর, ঢাকা। বাবা আবদুল কাদের মোল্লা, মা মেহেরুন নেছা। স্ত্রী ইসরাত জাহান সালমা। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২২।

AMARBOI.COM

১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গঙ্গাসাগর এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান নিয়েছে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি ছোট ছোট দল। এ রকমই একটি দলে ছিলেন মতিউর রহমান। তাঁর দলের অবস্থান এলাকার দক্ষিণ পারে। তাঁদের ডানে রেললাইন, কাছেই তিতাস নদ। পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান মোগরাবাজারে। মাঝখানে ব্যবধান দেড়-দুই শ গজ। পরদিন খুব ভোরে সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়, থেমে থেমে কয়েক দিন চলে।

১৭ কি ১৮ এপ্রিল, তুমুল বৃষ্টির তোড়ে প্রকৃতির সবকিছু ভেসে যাওয়ার জোগাড়। এর মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা দক্ষিণ দিক থেকে তাঁদের অবস্থান লক্ষ্য করে বিরতিহীন আক্রমণ চালাতে থাকে। বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের বিভ্রান্ত করার জন্যই সেদিক থেকে প্রথম আক্রমণ শুরু করে। তাদের আসল আক্রমণ শুরু হয় পশ্চিম দিক থেকে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ নাজুক অবস্থায় পড়েন। অবস্থান ধরে রাখা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

এদিকে মুক্তিবাহিনীর অপর দলটি—যারা তাঁদের পেছনে ছিল—অধিনায়কের নির্দেশে পশ্চাদপসরণ করে। তাঁরা যে পিছিয়ে গেছে, এ খবর মতিউর রহমান ও তাঁর দলের কেউ বুঝতে পারেননি। এখন তাঁদের সমর্থন দেওয়ার জন্য আর কেউ নেই। পেছন থেকে বাধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না পাওয়ায় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের দুদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

মুক্তিবাহিনীর অন্য দলগুলো পিছিয়ে যাওয়ায় সবদিক দিয়েই মতিউর রহমানের দল খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁদের গোলাবারুদ ও খাদ্যের স্বল্পতাও ছিল। তাঁরা দুদিন প্রায় না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন। পিছিয়ে যাওয়া বা আত্মাহুতি—তাঁদের সামনে আর পথ নেই। পিছিয়ে গেলেও সবার মারা পড়ার আশঙ্কা। পিছিয়ে যেতে হলে নিখুঁত কাভারিং ফায়ার দরকার। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, সবাই একসঙ্গে হাওরের ভেতর দিয়ে পিছিয়ে যাবেন। কিন্তু সহযোদ্ধা মোস্তফা কামাল (বীরশ্রেষ্ঠ) বললেন, তিনিই কাভারিং ফায়ার করবেন। বাকি সবাই প্রতিবাদ করলেন। মোস্তফা কামাল তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর বীরত্বের কারণে সেদিন মতিউর রহমানের দল বেঁচে যায়।

এর আগে ৭ এপ্রিল মেঘনা নদীতে মতিউর রহমান এবং সহযোদ্ধারা শত্রুর ছোট একটি জাহাজ গোলার আঘাতে ডুবিয়ে দেন। একটি যুদ্ধে তিনি আহত হন।

মতিউর রহমান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো ফোর্সের সেনা ছিলেন। ছুটিতে থাকাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি ১ এপ্রিল চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানিতে যোগ দেন।

মনির আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম পশ্চিম [illegible], সদর, নোয়াখালী।
বাবা আলী আহমদ, মা মানাফা খাতুন। স্ত্রী জাহান আফরোজা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১০৩।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেটের দিকে ১৮ মাইল গেলেই মাধবপুর। ২৮ এপ্রিল সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সেখানে সংঘটিত হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মনির আহমেদ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ছোট দলের নেতৃত্ব দেন।

সেদিন সকাল আটটার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান লক্ষ্য করে প্রথমে কামানের ব্যাপক গোলা নিক্ষেপ করে। এরপর পাকিস্তানি সেনারা তিন দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের পরিখার ভেতর থেকে রিকোয়েললেস রাইফেল মেশিনগান, হালকা মেশিনগান, মর্টার, রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মর্টার প্লাটুন পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। তার পরও পাকিস্তানি সেনারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি দলের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। মুক্তিযোদ্ধারা চরম সংকটের মধ্যে পড়েন। তখন মনির আহমেদ তাঁর দলের সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তাঁদের পাল্টা হামলায় পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা কৌশলগত কারণে পিছিয়ে যান। পেছনে নতুন জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলে আবার যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আক্রমণ করে। দুই পক্ষের মধ্যে এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা এ যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। অসাধারণ বীরত্ব আর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকজন শহীদ হন। কয়েকজন আহত হন। হতাহত হয় কমপক্ষে ২৭০ জন পাকিস্তানি সেনা।

মনির আহমেদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানিতে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তিনি প্রথমে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে। পরে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভৈরব, আশুগঞ্জ, আখাউড়াসহ কয়েকটি জায়গায় বীরত্বের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেন।

মফিজুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম নোয়াদ্দা, ইউনিয়ন সিন্দুরপুর, দাগনভূঞা, ফেনী।
বাবা নেয়ামতউল্লা ফরাজী, মা রাহাতুনের নেছা।
স্ত্রী ফজিলতের নেছা। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৩৫। মৃত্যু ২০০৫।

AMARBOI.COM

২৬ মার্চ ঢাকার পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তর থেকে পালিয়ে যাওয়া একদল বাঙালি সেনা সমবেত হয়েছিলেন নরসিংদীর পাঁচদোনায়। সেখানে তাঁরা যোগ দেন ময়মনসিংহ থেকে আসা প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে। ঢাকা-নরসিংদী সড়কের করইতনী, বাবুরহাট, পাঁচদোনাসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধের পর তাঁরা প্রতিরক্ষাগত অবস্থান নেন ভৈরব-নরসিংদীর মাঝামাঝি রামনগর এলাকায়। ১৩ এপ্রিল বেলা ১১টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে তাঁদের আক্রমণ করে।

মফিজুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল ভৈরব-নরসিংদীর মাঝে রামনগর রেলসেতুতে। সকাল ১০-১১টার মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা চলে এল মফিজুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল তাঁদের অস্ত্র। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ চালাল। যুদ্ধ চলতে থাকল। মফিজুর রহমান তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে চললেন। সারা রাত গোলাগুলি চলল। পরদিন ১৪ এপ্রিল সকালে শুরু হলো তাঁদের ওপর বিমান হামলা। চারদিকে বাড়িঘর-গাছপালায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। একটু পর পাঁচ-ছয়টি হেলিকপ্টার থেকে নামল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো দল। এতে মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিও প্রায় নিঃশেষিত। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো গোলাবারুদও তখন তাঁদের হাতে ছিল না। ক্ষুধায়ও তাঁরা বেশ কাতর। তিন-চার দিন আগে সামান্য খাবার খেয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁরা অনেক কষ্টে পশ্চাদপসরণ করে কিশোরগঞ্জের কুলিয়ার চরে এসে সমবেত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মফিজুর রহমান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঢাকার পিলখানা সদর দপ্তরে। তাঁর পদবি ছিল নায়েক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট তাঁদের ওপর আক্রমণ করে। তাঁরা সেই আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে তাঁদের প্রতিরোধ। বেশির ভাগ ইপিআর সদস্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ হন। মফিজুর রহমানসহ কিছুসংখ্যক ইপিআর সদস্য পিলখানা থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। পরে তাঁরা সমবেত হন বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে। সেখান থেকে তাঁরা নরসিংদীর পাঁচদোনায় যান। তিনি যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে।

মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী, বীর প্রতীক

গ্রাম মৈশাদী, সদর, চাঁদপুর। বাবা মেহেরউল্লাহ পাটোয়ারী, মা শামছুন নাহার। স্ত্রী নাজনীন মমতাজ। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩০[illegible]

AMARBOI.COM

১৯৭১ সালের ২৯ বা ৩০ অক্টোবর দুপুর আনুমানিক ১২টা। চাঁদপুর নৌবন্দরসংলগ্ন স্থান। বার্মা ইস্টার্নের তেলের ডিপো। বন্দর ও সংলগ্ন তেলের ডিপোর চারদিকে শত্রুর জোরদার নিরাপত্তাব্যবস্থা। দিনদুপুরে সেখানে অপারেশন চালানো দুঃসাধ্য এক কাজ। সব উপেক্ষা করে সেখানে দিনের বেলায় অপারেশন চালান নৌ-কমান্ডো মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী ও ফজলুল কবীর। সঙ্গে তাঁদের সহযোগী নান্নু নামে স্থানীয় একজন।

দিনদুপুরে হঠাৎ বিকট শব্দ। একের পর এক বিস্ফোরণ। দাউ দাউ আগুন আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমেই বড় হয়ে ওপরে উঠতে থাকে। আগুনের তাপে সেখানে টিকে থাকা দায়। ভয়াবহ এক অবস্থা। চারদিকে পাকিস্তানি সেনা আর তাদের সহযোগীদের হতবিহ্বল ছোটাছুটি। আগুনে গুরুতরভাবে পুড়ে গেল তাদের কয়েকজনের শরীর। দু-তিনজন তখনই নিহত হলো। বিস্ফোরণে তেলের ডিপো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েক ঘণ্টা ধরে হাজার হাজার গ্যালন জ্বালানি তেল পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী একজন সাহসী নৌ-কমান্ডো ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে আরও কয়েকটি সফল অপারেশন চালান। ১৬ আগস্ট চাঁদপুর নৌবন্দরে অভিযান চালানোর পাশাপাশি ২৬ অক্টোবর চাঁদপুরে দুটি খাদ্যবাহী নৌকা দখল, ৩০ অক্টোবর চাঁদপুর ডাকাতিয়া নদীর লন্ডন ঘাটে আমেরিকান পতাকাবাহী জাহাজ এমভি লোরেন ধ্বংস, চাঁদপুর-লাকসাম রেলপথের একটি কালভার্ট উড়িয়ে দেওয়া এবং ৫ নভেম্বর চীনা পতাকাবাহী জাহাজের ওপর আক্রমণাভিযানে চূড়ান্ত দুঃসাহসের পরিচয় দেন।

মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে তিনি নিজ এলাকা হয়ে ভারতে যান। পলাশিতে তিনি প্রশিক্ষণ নেন।

স্বাধীনতার পর তিনি পুলিশ বাহিনীতে ও ১৯৯২ সালে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ২০০৮ সালে সচিব পদ থেকে অবসর নেন।

মহসীন আলী সরদার, বীর প্রতীক

গ্রাম নারায়ণপুর, ইউনিয়ন মন্মথপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। বর্তমান ঠিকানা চাঁদ হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। বাবা মো. আমিরউদ্দিন সরদার, মা মফিজন নেছা। স্ত্রী খাদিজা খানম। তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬৫।

কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ চালান বিওপিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্বে মহসীন আলী সরদার। আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত পাকিস্তানি সেনারা। মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করতে করতে বিওপি লক্ষ্য করে এগোতে থাকেন। তখন পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে দুই পক্ষে। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায়। এ সময় গুলিতে শহীদ হন তাঁর এক সহযোদ্ধা (সহিদউল্লাহ ভূঁইয়া, বীর বিক্রম)। আহত হন কয়েকজন। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেন পশ্চাদপসরণের। কিন্তু তিনি দমে যাননি। সহযোদ্ধাদের নিয়ে আরও কিছুক্ষণ লড়াই করেন। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ঘটনা ঘটেছিল বনতারায় ১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট।

বনতারা বিওপি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। দিনাজপুর-ফুলবাড়ী সড়কের মোহনপুর সেতুর পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে। বনতারা বিওপির অদূরেই ভারতের সমজিয়া বিওপি। বনতারায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল। তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল বেশ সুরক্ষিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই এলাকা ছিল মুক্তিবাহিনীর ৭ নম্বর সেক্টরের আঙ্গিনাবাদ সাব-সেক্টরভুক্ত।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ১২ আগস্ট রাতে মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে অতর্কিতে আক্রমণ চালান। পাঁচটি দলে বিভক্ত মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন মোট ৫০ জন। চার দলে ১১ জন করে এবং বিস্ফোরক দলে ছয়জন। ১১ জনের একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মহসীন আলী সরদার। অপর একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েব সুবেদার সহিদউল্লাহ ভূঁইয়া।

মহসীন আলী সরদার ১৯৭১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসির ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। সে সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন। এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি ভারতে গিয়ে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে সীমান্ত এলাকায় কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। পরে উচ্চতর প্রশিক্ষণে যান। প্রশিক্ষণ শেষে আঙ্গিনাবাদ সাব-সেক্টরে যোগ দেন। এখানে তিনি ক্যাম্প অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদুর রহমান, বীর প্রতীক

উকিলপাড়া, সদর, ভোলা। বর্তমান ঠিকানা বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা। বাবা আবদুল ওয়াজেদ, মা আনোয়ারা বেগম। স্ত্রী সীমা রহমান। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬।

মাসুদুর রহমান একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাতে অবস্থান নেন অমরখানায়। তিনিই এ দলের নেতৃত্বে। তাঁদের সঙ্গে আছে মিত্রবাহিনীর ৭ মারাঠা রেজিমেন্টও। তাঁরা একযোগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাবেন বলে ঠিক হলো। পরিকল্পনামতো রাত দুইটায় একযোগে তাঁরা আক্রমণ শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনারাও তাদের সুরক্ষিত ও শক্তিশালী ঘাঁটি থেকে শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। গোলাগুলির শব্দে চারদিক প্রকম্পিত। মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত সাহস, ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে গুলি করে এগিয়ে যেতে থাকেন পাকিস্তানি ঘাঁটির দিকে। প্রায় দুই ঘণ্টা চলে যুদ্ধ। এরপর পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা দুর্গে ফাটল ধরে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। শেষ রাতের দিকে তারা অমরখানা থেকে পালিয়ে যায়। ভোরের আলোয় মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অমরখানা বিওপি দখল করে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

অমরখানা পঞ্চগড় জেলার অন্তর্গত। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে এর অবস্থান। উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার চাউলহাটি ও ভাটপাড়া। অমরখানার পূর্ব দিকজুড়ে প্রবাহিত তালমা নদী। অমরখানার ওপর দিয়েই তেঁতুলিয়ায় যাওয়ার সড়কপথ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে অমরখানা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এপ্রিলের শেষ দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অমরখানা দখল করে সেখানে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও সহযোগী মিলিশিয়া বাহিনীর দুই কোম্পানি সেনা। আগস্ট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা অমরখানায় বেশ কয়েকবার আক্রমণ করেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সেখান থেকে বিতাড়নে ব্যর্থ হন। সেটি সম্ভব হয় ২২ নভেম্বরে পরিচালিত আক্রমণের মাধ্যমে। সেদিনের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন মাসুদুর রহমান। নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি অস্ত্র হাতে নিজেও যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর অসাধারণ রণকৌশল ও সাহস দেখে মুক্তিযোদ্ধারা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হন।

মাসুদুর রহমান ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ৩০ মার্চ কালুরঘাটের যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। এরপর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একাংশের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। বুড়িঘাট ও মহালছড়ির যুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গেই তিনি ভারতে চলে যান। পরে যোগ দেন প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে। মূর্তিতে প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর ৬ নম্বর সেক্টরের ভজনপুর সাব-সেক্টরের একটি দল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি পরে জগদলহাট, ময়দানদীঘি, বকশীগঞ্জ, বোদাসহ কয়েক জায়গায় যুদ্ধ করেন।

মাসুদুর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদ থেকে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহতাব আলী সরকার, বীর প্রতীক

গ্রাম বাংলাপাড়া, ইউনিয়ন আলমবিদিতর, গঙ্গাচড়া, রংপুর। বাবা বশিরউদ্দিন সরকার, মা সখিমননেছা। স্ত্রী মঞ্জুয়ারা বেগম। তাঁদের এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬৩।
গেজেটে নাম এম এ সরকার। মৃত্যু ১৯৭৭।

তুষভান্ডার লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ থানার (বর্তমানে উপজেলা) অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোট একটি ঘাঁটি। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নভেম্বরের শেষ দিকে পাটগ্রাম, বড়খাতা ও হাতীবান্ধা মুক্ত করার পর মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যেতে থাকেন লালমনিরহাটের দিকে। মিত্রবাহিনীর সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় একটি অংশ অগ্রসর হয় লালমনিরহাটের উদ্দেশে। ছোট অংশটি যায় তুষভান্ডার মুক্ত করতে। মুক্তিযোদ্ধারা এভাবে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে তুষভান্ডার আক্রমণ করার জন্য রওনা হন।

১১ জনের একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মাহতাব আলী। তিনি তাঁর দল নিয়ে সেখানে গিয়ে সবার আগে আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দল তখনো বেশ দূরে। মাহতাব আলী সরকারসহ তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। তখন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁরা তেমন পারদর্শী ছিলেন না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্রের গুলিতে তাঁরা একে একে শহীদ হতে থাকেন। একপর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে দলের একমাত্র তিনিই জীবিত। তিনি মনোবল না হারিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। তখন তিনি একটি কৌশলের আশ্রয় নেন। বারবার স্থান পরিবর্তন করে গুলি করতে থাকেন। এতে পাকিস্তানি সেনারা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য একটি দল সেখানে এসে পাকিস্তানি ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তাঁদের সঙ্গে গ্রামবাসীও লাঠিসোঁটা নিয়ে যোগ দেন। ততক্ষণে পাকিস্তানি সেনাদেরও গোলাগুলি প্রায় শেষ হয়ে যায়। ফলে মানসিকভাবে তারা ভেঙে পড়ে। এরপর তারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ ঘটনা ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে, নভেম্বরের শেষ দিকে।

মাহতাব আলী সরকার ১৯৭১ সালে এইচএসসির শিক্ষার্থী ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষিকাজও করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার পর ভারতে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমে যুদ্ধ করেন সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরের অধীনে। পরে পাটগ্রাম সাব-সেক্টরে। হাতীবান্ধা, কাকিনা, বড়খাতাসহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। মুক্তিবাহিনীর একটি দলের (সেকশন) দলনেতা ছিলেন তিনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, বীর প্রতীক

মুন্সিপাড়া, সদর, গাইবান্ধা। বাবা ফজলে এলাহী, মা মেহেরুননেছা। স্ত্রী ফাতেমা জিনাত। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪০২। গেজেটে নাম মো. মাহবুব এলাহী।

ভোরের আলো ফোটার আগেই মুক্তিযুদ্ধের গণবাহিনীর একদল যোদ্ধা গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে হাজির হলেন বালাসীঘাটে। তাঁদের নেতৃত্বে মাহাবুব এলাহী রঞ্জু। অদূরেই বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ। এর ঢালুতে উঁচু-নিচু যে জায়গা এবং জমিজমার যে উঁচু আইল, সেখানে গিয়ে তাঁরা দ্রুত অবস্থান নিলেন। কুয়াশায় ঢাকা চারদিকের চরাচর সূর্যের আলোয় ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের টহল দলকে—যেখানে তাঁরা অবস্থান নিয়েছিলেন—সেখান থেকে দেখা গেল। তারা নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে। তারা কল্পনাও করেনি যে মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশে পড়বে। রঞ্জু ও তাঁর সহযোদ্ধারা নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে টহল দল চলে এল তাঁদের আওতার মধ্যে। রঞ্জু সংকেত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র।

আকস্মিক এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা একেবারে হতবিহ্বল। পাল্টা আক্রমণের তেমন সুযোগ পেল না তারা। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে তাদের বেশ কয়েকজন হতাহত হলো। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে তারা কিছুক্ষণ পরই শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। আশপাশে থাকা পাকিস্তানি সেনারাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। দুই পক্ষে যুদ্ধ চলল দুপুর পর্যন্ত। পাকিস্তানি সেনারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি শিকার করে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিল। তারা পালিয়ে গেল গাইবান্ধার দিকে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের নভেম্বরের। গাইবান্ধা জেলা সদর থেকে পূর্ব দিক বরাবর ১০-১১ কিলোমিটার দূরে বালাসীঘাট। পাকিস্তানি সেনারা এ ঘাটে নিয়মিত টহল দিত। ফলে এ পথ ব্যবহার করে গাইবান্ধায় অপারেশন চালানো মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

সেদিনের যুদ্ধে বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। তবে তারা নিহত সেনাদের লাশ নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মুক্তিবাহিনী তাদের বেশ কিছু অস্ত্র ও বিপুলসংখ্যক গুলি হস্তগত করে। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ফজলু নামের একজন সদস্য শহীদ ও তাজুল ইসলাম টুকু নামের একজন গুরুতর আহত হন।

মাহাবুব এলাহী রঞ্জু ১৯৭১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মার্চ-এপ্রিলের প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি অংশ নেন। এরপর ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১১ নম্বর সেক্টরের মানকারচর সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন। এই সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা গাইবান্ধা এলাকায়ও যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন গণবাহিনীর একটি কোম্পানির অধিনায়ক। তাঁর নামেই কোম্পানিটির নামকরণ হয়। রঞ্জু কোম্পানি গাইবান্ধা জেলার উড়িয়াঘাট, রতনপুর, দাড়িয়াপুর, ছাপড়াহাটি, বাদিয়াখালী, কাইয়ার হাট, কেতকীর হাটসহ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অ্যামবুশ, সেতু ধ্বংস, প্রত্যক্ষ যুদ্ধসহ নানা ধরনের অপারেশনে অংশ নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজানুর রহমান খান, বীর প্রতীক

গ্রাম কুলকান্দী, ইসলামপুর, জামালপুর। বর্তমান ঠিকানা ৬৫/২ উত্তর বাসাবো, ঢাকা। বাবা রিয়াজুল ইসলাম খান, মা নুরুন্নাহার খানম। স্ত্রী আলেছা বেগম। তাঁরা নিঃসন্তান। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১২।

কামালপুর

জামালপুরের বকশীগঞ্জ থানার (বর্তমানে উপজেলা) অন্তর্গত সীমান্ত এলাকা। গ্রামের মাঝামাঝি ছিল সীমান্ত বিওপি। ওই বিওপি ঘিরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। রাতের অন্ধকারে সীমান্তের দিকে এগোতে থাকেন মিজানুর রহমান খানসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। ভোরের দিকে তাঁরা আকস্মিক আক্রমণ করেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ সদরুজ্জামান (বীর প্রতীক)। মিজানুর রহমানসহ দলের ৪৮ জনের সবাই ছিলেন স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ত্বরায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তাঁদের ৪৮ জনকে ১১ নম্বর সাব-সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে আলাদাভাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাঁরা সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে মিজানুর রহমান, আমানুল্লাহ কবীরসহ (বীর বিক্রম) কয়েকজন যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। প্রায় আধা ঘণ্টার রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে নিহত হয় আট-নয়জন পাকিস্তানি সেনা। মুক্তিবাহিনীরও কম ক্ষতি হয়নি। আমানুল্লাহ কবীরসহ তাঁর সাতজন সহযোদ্ধা শহীদ হন।

মিজানুর রহমান ১৯৭১ সালে কলেজের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জুনে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। প্রশিক্ষণের পর তাঁকে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জে পাঠানো হয়। ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর আবু তাহের (বীর উত্তম, পরে কর্নেল) তাঁকেসহ ৪৮ জনকে নিয়ে একটি দল গঠন করে আলাদাভাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেন। তিনি তাঁদের সম্মুখযুদ্ধের জন্য রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করেন। মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরসহ আশপাশের বেশ কয়েকটি স্থানে তাঁরা সম্মুখযুদ্ধ করেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি মেজর তাহেরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর বড় একটি দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কামালপুর প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ চালায়। এ যুদ্ধেও তিনি অংশ নেন। সেদিন মিজানুর রহমানসহ ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা মেজর তাহেরের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের ওপর নির্দেশ ছিল, কামালপুরের পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থান দখল করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ১০ জন সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে নিজেদের ঘাঁটিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তাঁরা সেটা করতে পারেননি। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এ যুদ্ধের একপর্যায়ে মেজর তাহের আকস্মিকভাবে আহত হন। সে সময় মিজানুর রহমান ও তাঁর এক সহযোদ্ধা দ্রুত আহত মেজর তাহেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। সেদিন কামালপুরের যুদ্ধে প্রাণপণে লড়েও মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হতে পারেননি।

মিজানুর রহমান খান স্বাধীনতার পর পড়াশোনা শেষ করে জনতা ব্যাংকে চাকরি করেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনসুরুল আলম দুলাল, বীর প্রতীক

গ্রাম রামপাল, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা আবদুল লতিফ ভূঁইয়া, মা মেহেরুন নেছা। স্ত্রী রোকেয়া আলম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩০৯। গেজেটে নাম দুলাল।

মুনসুরুল আলম দুলাল ১৯৭১ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে গ্রামের বাড়ি চলে যান। সেখান থেকে আগরতলায় গিয়ে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। মেলাঘরে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকায় আসেন।

মুনসুরুল আলম ঢাকার মিরপুর, ধানমন্ডি, হাতিরপুল, গ্রিন রোডসহ বিভিন্ন স্থানে অপারেশন চালান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রিন রোডের অপারেশন। ২১ আগস্ট রাত একটার দিকে মুনসুরুলসহ পাঁচজন যোদ্ধা গ্রিন রোডে মিনি মাইন পুঁতে হোটেল নূরের দোতলায় অবস্থান নেন। তাঁদের অস্ত্র বলতে ছিল কয়েকটি গ্রেনেড, দুটি এসএমজি, দুটি এসএলআর ও কয়েকটি মিনি মাইন। রাত দুইটার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তিনটি লরি আসতে দেখে তাঁরা প্রস্তুত হন। লরিগুলো সেখানে আসামাত্র মাইনগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে। বিস্ফোরণে প্রথম লরির ব্যাপক ক্ষতি এবং বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। আতঙ্কিত হয়ে পাকিস্তানি সেনারা চারদিকে গোলাগুলি শুরু করে। মুনসুরুল ও তাঁর সহযোদ্ধারাও গুলিবর্ষণ শুরু করেন হোটেলের দোতলা থেকে। এই অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ বেশ কজন সেনা নিহত হয়। মুনসুরুল ও তাঁর সঙ্গী চারজন মুক্তিযোদ্ধাও গুলিতে আহত হন। তবে তাঁরা সেখান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে সক্ষম হন।

পরদিন ২২ আগস্ট বিবিসিতে এই অপারেশনের বিষয়ে 'দ্য বিগেস্ট অপারেশন ইন দ্য ক্যাপিটাল অব ইস্ট পাকিস্তান' শিরোনামে সংবাদ প্রচারিত হয়।

AMARBOI.COM

মো. আজাদ আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম কুশবাড়িয়া, পৌরসভা আড়ানী, বাঘা, রাজশাহী। বর্তমান ঠিকানা বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা। বাবা আরজান আলী প্রামাণিক, মা রাজিয়া খাতুন। স্ত্রী আজাদ সুলতানা। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬৬।

নাটোরের অন্তর্গত নাবিরপাড়া, ঈশ্বরদী-রাজশাহী রেলপথ। নাবিরপাড়ার কাছেই আবদুলপুর রেলওয়ে জংশন। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ রেলপথ সচল রাখার জন্য ট্রেনে নিয়মিত টহল দিত। নভেম্বরে মো. আজাদ আলীর নেতৃত্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেরিলাদলের ওপর ওই টহল ট্রেনে অ্যামবুশের দায়িত্ব পড়ে। তাঁরা রেকি করে নির্ধারণ করেন নাবিরপাড়াকে। তখন সেখানে জনবসতি ছিল না। দুই পাশে ছিল বিস্তৃত আখখেত।

সেদিন লাইনের নিচে বিস্ফোরক স্থাপনের পর তাঁরা যখন মাইনের সঙ্গে যুক্ত তার আড়াল করছিলেন, তখন দূরে ট্রেনের আলো দেখা গেল। ট্রেনটি অদূরে আবদুলপুর রেলওয়ে জংশনে এসে থেমে গেল। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মো. আজাদ আলী সহযোদ্ধাদের নিয়ে বাকি কাজ সম্পন্ন করছিলেন। কথা ছিল, টহল ট্রেন অ্যামবুশস্থলে এলে তাঁরা বিস্ফোরণ ঘটাবেন। কিন্তু তাঁর এক সহযোদ্ধার ভুলে ট্রেন আসার আগেই ছয়টি মাইন একসঙ্গে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের পর মো. আজাদ আলী ও তাঁর সহযোদ্ধারা নিরাপদ স্থানের দিকে চলে যান। এই বিস্ফোরণে তাঁর বাঁ হাতের কবজি উড়ে যায়।

এদিকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আবদুলপুরে অবস্থানরত টহল ট্রেনটি দ্রুত নাবিরপাড়ার দিকে আসার সময় মাইন বিস্ফোরণে সৃষ্ট গর্তে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ট্রেনের ইঞ্জিন ও বগি প্রচণ্ড শব্দে খাদের ভেতর উল্টে পড়ে। এতে ১৬ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর।

মো. আজাদ আলী ১৯৭১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণীর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। মে মাসে ভারতে যান। জুনের শেষে তাঁকে মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাব-সেক্টর এলাকায় গেরিলাযুদ্ধে অংশ নেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশন করেন তিনি।

AMARBOI.COM

মো. আতাউর রহমান, বীর প্রতীক

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া। বর্তমান ঠিকানা বড়বাড়ী দেওডোবা, পাইকারপাড়া, ইউনিয়ন সাতগাড়া, সদর, রংপুর।
বাবা আছলেম উদ্দিন মণ্ডল, মা গোলেজান নেছা।
স্ত্রী রানী বেগম। তাঁদের তিন ছেলেমেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৩০।

কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্ত। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে একটি অপারেশন করবেন। অপারেশনের আগের দিন পুরো এলাকা তাঁরা রেকি করেছিলেন। কোন দিকে কোন গ্রুপ অবস্থান নেবে, তা-ও ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পথঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। এর মধ্যেই শুরু হয় অপারেশন। কোনটি পথ আর কোনটি খাল-বিল-ডোবা, সেটা চেনার উপায় ছিল না। তিনটি দলে বিভক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের যোগাযোগের জন্য ছিল ওয়্যারলেস সেট। বৃষ্টিতে সেগুলো বিকল হয়ে পড়ে। কোনো দলের সঙ্গেই যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। পানিতে ভিজে যাওয়ায় অনেকের অস্ত্রই কাজ করছিল না। এর পরও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি দল যুদ্ধ করছিল। দ্বিতীয় দলভুক্ত আতাউর রহমান ও তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোদ্ধার কাছে ছিল মেশিনগান। তিনি মেশিনগান দিয়ে অনবরত ব্রাশফায়ার করে চলেন। একপর্যায়ে তাঁর ডান হাতে গুলি লাগে। তাঁর পাশে থাকা একমাত্র সহযোদ্ধাও গুলিতে আহত হন।

এই যুদ্ধে প্রথম দলের ৩০ জনই শহীদ হন। দ্বিতীয় দলের আতাউরসহ আরেকজন মুখোমুখি লড়াই করেন। পরে জানতে পারেন, তাঁর এই বীরত্ব ও দৃঢ়তায় ওই দিন সেখান থেকে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৩ সেপ্টেম্বর।

আতাউর রহমান ১৯৭১ সালে যশোর সেনানিবাসের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সেনানিবাস থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যান। তিনি রৌমারী এলাকা ছাড়াও ১১ নম্বর সেক্টরের অধীন কামালপুর সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ করেন।

ভারতের একটি সামরিক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। তিনি তাঁর ডান হাতের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। স্বাধীনতার পরও তিনি ভারতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

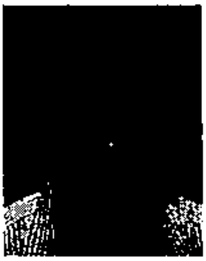

মো. আনোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক

ক-৭৪, কালাচাঁদপুর, গুলশান, ঢাকা।
বাবা আবদুল কাদির, মা জোহরা খাতুন।
স্ত্রী মাহিনুর হোসেন। তাঁদের তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২৬।

আনোয়ার হোসেনের মামাতো ভাই মোজাম্মেল হক (বীর প্রতীক)। তাঁরা দুজনই যোগ দেন মুক্তিবাহিনীতে। তাঁরা ছিলেন ২ নম্বর সেক্টরের গেরিলাবাহিনীর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা গ্রুপের সদস্য। এই গ্রুপের, বিশেষ করে আনোয়ার হোসেন ও মোজাম্মেল হকের ওপর দায়িত্ব পড়ে মোনায়েম খানের বাড়িতে অপারেশনের। মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন। নানা কাজের জন্য তিনি ছিলেন কুখ্যাত।

মোনায়েম খানের বাড়িতে পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ সার্বক্ষণিক প্রহরায় ছিল। বাড়ির চারদিকে ছিল তল্লাশি চৌকি। আনোয়ার হোসেনের মামা আর মোজাম্মেল হকের চাচা আবদুল জব্বার কাজের সূত্রে মোনায়েম খানের বাড়িতে নিয়মিত যেতেন। তাঁর মাধ্যমে মোনায়েম খানের বাড়ির দুজন কাজের লোক শাহজাহান ও মোখলেসের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন যে তাঁরা দুজনই মোনায়েম খানের ওপর ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। আনোয়ার হোসেন ও মোজাম্মেল হক এই সুযোগ কাজে লাগালেন। তাঁরা দেশের স্বাধীনতার লড়াই, মোনায়েম খানের মতো কট্টর পাকিস্তানি দালালদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তা শাহজাহান ও মোখলেসকে বোঝান। দুজনই তাঁদের সঙ্গে একমত হন।

১৩ অক্টোবর আনোয়ার হোসেন পুঁইশাকভর্তি চটের ব্যাগের মধ্যে একটি স্টেনগান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি গ্রেনেড ও ফসফরাস বোমা নিয়ে যান বনানী কবরস্থানসংলগ্ন মোনায়েম খানের বাড়ির পেছনের কলাবাগানে। সেখানে সহযোদ্ধা নুরুল আমিনকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন মোজম্মেল হক। একটু পর শাহজাহান এসে তাঁদের জানান, মোনায়েম খান ড্রয়িংরুমে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করছেন। তখন তাঁরা দুজন একসঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে ড্রয়িংরুমে ঢোকেন। অস্ত্র হাতে তাঁদের দেখে মোনায়েম খান ও অন্যরা চমকে ওঠেন। আনোয়ার হোসেন স্টেনগান দিয়ে ব্রাশফায়ার করেন। মোজাম্মেল হক হ্যান্ড গ্রেনেড ও ফসফরাস বোমা চার্জ করেন। এরপর শাহজাহানের সঙ্গে তাঁরা দুজন বাউন্ডারি দেয়াল টপকে পালিয়ে যান। আনোয়ার হোসেন যান ছোলমাইদ, মোজাম্মেল হক ভাটারায় তাঁর এক চাচার বাড়িতে। পরদিন খবর পান, অপারেশন সফল হয়েছে। মোনায়েম খান নিহত হয়েছেন।

মো. আনোয়ার হোসেন ১৯৭১ সালে এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মা-বাবাকে না জানিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। আগরতলার মতিনগর ও মেলাঘরে প্রশিক্ষণ নেন। তিনি কালীগঞ্জের ইছাপুরে সরাসরি এক যুদ্ধেও অংশ নেন।

মো. আবদুল গনি, বীর প্রতীক

গ্রাম [illegible]গর, ইউনিয়ন নাটেশ্বর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। বাবা আহমেদউল্লা বেপারী, মা হাজেরা খাতুন। স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৮০। মৃত্যু ২০০২।

AMARBOI.COM

তামাবিল সিলেটের জৈন্তাপুর থানার (বর্তমানে উপজেলা) অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। তামাবিলের ওপর দিয়ে সিলেট-তামাবিল-ডাউকি-শিলং সড়ক। ভারতের আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরামের সঙ্গে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতে যোগাযোগের মাধ্যম এ সড়কপথ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের একদল মুক্তিযোদ্ধা প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে সমবেত হন তামাবিলে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১ মে আকস্মিকভাবে তামাবিলে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পাকিস্তানি সেনারা তামাবিল দখল করে। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে অবস্থান নেন।

মুক্তিযোদ্ধারা ৫ মে পুনরায় সংগঠিত হয়ে তামাবিলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইপিআর সদস্য। এই আক্রমণে সার্বিক নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন মোতালিব, সুবেদার মেজর বি আর চৌধুরী, সুবেদার মজিবুর রহমান। একটি ক্ষুদ্র দলের (প্লাটুন) নেতৃত্ব দেন মো. আবদুল গনি। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর পাকিস্তানি সেনারা তামাবিল থেকে পালিয়ে যায়। অনেক দিন তামাবিল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলেই ছিল।

মো. আবদুল গনি চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিলেট ইপিআর হেডকোয়ার্টারের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেন ৫ নম্বর সেক্টরের অধীনে। জৈন্তাপুর, হরিপুর, রাধানগর, জাফলং, গোয়াইনঘাটসহ কয়েকটি স্থানে তিনি যুদ্ধ করেন। ২৩ অক্টোবর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গোয়াইনঘাটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ৫ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারাও সহযোগী হিসেবে অংশ নেন। কয়েক দিন সেখানে যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধের কিছুদিন আগে মো. আবদুল গনি একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাতের অন্ধকারে ভারত থেকে বাংলাদেশে এসে গোয়াইনঘাটের ভাঙা সেতুতে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। এতে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। যুদ্ধের পর তাঁরা মো. আবদুল গনির নেতৃত্বে নিরাপদে ভারতের ক্যাম্পে ফিরে যান।

মো. আবদুল মজিদ, বীর প্রতীক

গ্রাম [illegible] (আক্কেলপুর), ইউনিয়ন তামপাট, সদর, রংপুর। বাবা কছিমউদ্দিন আহমেদ, মা মরিয়ম বেগম। স্ত্রী শামসুন নাহার বেগম। তাঁদের চার ছেলেমেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৩।

AMARBOI.COM

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর শেষ রাত। ঈদের দিন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা রেলস্টেশন থেকে আনুমানিক পাঁচ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রপুর। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ওই এলাকা ২ নম্বর সেক্টরের গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টরের অধীনে ছিল। এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল)।

১৮ নভেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার তুলে ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনকে চন্দ্রপুর আক্রমণ করতে বলেন। সেখানে পাকিস্তানি সেনাদের একটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ছিল। নির্দেশমতো মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে চন্দ্রপুর আক্রমণ করে। ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন এক মেজর এবং মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট খন্দকার আবদুল আজিজ। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের ভেতর থেকে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে সেখানে আক্রমণ করে। ওই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তুলনায় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরাই বেশি হতাহত হন। কারণ, পাকিস্তানি সেনারা সেখানে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। সেদিন মুক্তিবাহিনীর লে. খন্দকার আবদুল আজিজসহ ২২ জন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার, তিনজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ ৪৫ জন শহীদ হন। সারা রাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে যুদ্ধ হয়। সকালে পাকিস্তানি সেনারা চন্দ্রপুর থেকে পিছু হটে।

এই যুদ্ধে আবদুল মজিদের ডান পায়ে গুলি লাগে। তার পরও তিনি গুলি করতে করতে সামনের দিকে ক্রল করে এগিয়ে যান। যাওয়ার সময় দেখেছেন তাঁর অনেক সহযোদ্ধার লাশ আর রক্ত। নিজেদের রক্তে ভেজা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেই শেষ পর্যন্ত তাঁরা ওই এলাকা দখল করতে সক্ষম হন। পরে অবশ্য পাকিস্তানি সেনারা ওই এলাকা আবার দখল করে।

আবদুল মজিদ চন্দ্রপুর ছাড়াও গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টরের চারগাছ, কৃষ্ণপুর-বাগবাড়ী, কসবা, গঙ্গাসাগরসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে এমওডিসির সেপাই পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি তিনি বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কর্মস্থল থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যান। সেখানে তাঁকে নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মো. আবদুল হাকিম, বীর প্রতীক

গ্রাম মেদুর, সরিষাবাড়ী, জামালপুর। বাবা মাছুদ আলী মুন্সী, মা মহিতাবান নেছা। স্ত্রী শামসুন নাহার। তাঁদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১৮।

মো. আবদুল হাকিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকার অদূরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে হাবিলদার পদে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মেজর কে এম সফিউল্লাহর নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সেনারা বিদ্রোহ করে যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি এ বাহিনীর সঙ্গে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। পরে এ বাহিনী ভারতে চলে যায়। এরপর পরিবার-পরিজনের খোঁজ নেওয়ার জন্য তিনি দেশে আসেন। এ সময় কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তখন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে একটি বাহিনী গঠন করছিলেন। কাদের সিদ্দিকীর অনুরোধে মো. আবদুল হাকিম ১৯ মে ওই বাহিনীতে যোগ দেন। এ বাহিনীর নাম ছিল কাদেরিয়া বাহিনী। তিনি এ বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন।

মো. আবদুল হাকিম টাঙ্গাইলের দেওপাড়া, ধরলাপাড়া, সাগরদীঘি, ঘাটাইল, গোপালপুর, ভূঞাপুর, ইছাপুর ও জামালপুরের সরিষাবাড়ীর দুলভিটিতে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। ১৪ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ইছাপুর কবরস্থানে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। সেদিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল্লাহিল বাকী, বীর প্রতীক

ঠিকানা ২০৩/সি খিলগাঁও, ঢাকা।
বাবা মো. আবদুল বারী, মা আমেনা খাতুন। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২১। গেজেটে নাম মো. বাকী।
শহীদ ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালে মো. আবদুল্লাহিল বাকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বাকী ৮ মার্চ গভর্নর হাউসে (বর্তমানে বঙ্গভবন) বোমা নিক্ষেপ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ২৫-২৬ মার্চের প্রতিরোধযুদ্ধেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি।

বাকী ১৮ এপ্রিল মাকে একটি চিঠি লিখে ভারতে চলে যান। মাকে তিনি লিখেছেন, '...দেশের সংকটময় মুহূর্তে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না।'

ভারতের মেলাঘরে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মে মাসে কয়েকজনের সঙ্গে ঢাকায় ফিরে আসেন বাকী। তাঁরা মতিঝিলের চারটি জায়গায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার ভারতে চলে যান। এবার ভারতের চাকুলিয়ায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে বৃহত্তর ঢাকায় গেরিলাযুদ্ধ শুরু করেন। ঢাকা জেলার বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন ইউনিট কমান্ডার।

নভেম্বরের শেষ দিকে বাকী তাঁর দল নিয়ে ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করছিলেন। ৪ ডিসেম্বর রাতে কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে তিনি খিলগাঁওয়ে তাঁর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ফেরার সময় তাঁরা পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী একদল মুজাহিদের সামনে পড়ে যান। পাকিস্তানি সেনা ও মুজাহিদরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। বাকী ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বাকী ও তাঁর সহকারী বাবুল গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

মো. আবু সালেক, বীর প্রতীক ৬

গ্রাম হাশেমপুর (হাঁটামাথা), আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আবুল হাশেম, মা মাজেদুন নেছা।
স্ত্রী মঞ্জুয়ারা রিপন। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৬৫।

মো. আবু সালেক ১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল নিজ এলাকা কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) থেকে পালিয়ে ভারতে যান। সে সময় তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৪ বছর। ভারতে গিয়ে ওমপিনগরে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তাঁকে মেলাঘরে ২ নম্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্টরে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত হন।

মো. আবু সালেক কসবা এলাকায় যুদ্ধ করেন। একদিন হাবিলদার আবদুল হালিমের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা মনিয়ন্দ গ্রামে গিয়ে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কয়েক দিন পর তাঁরা ১০ জন রাতে আবার পাকিস্তানি সেনাদের পাকা বাংকারের কাছে গিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে গুলি করতে শুরু করেন। একসঙ্গে ১০টি অস্ত্র থেকে ক্রমাগত গুলি চলে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর।

১০ দিন পর আরেকটি অপারেশন করে আবু সালেক ও তাঁর সহযোদ্ধারা কসবা হাইস্কুলের কাছাকাছি চন্দ্রপুর গ্রামে অবস্থান নেন। সেদিনই মধ্যরাত থেকে শুরু হয় প্রচণ্ড গোলাগুলি। একপর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর মর্টার আক্রমণে বাংকার ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শত্রুপক্ষকে ব্যস্ত রাখা না গেলে কেউ বেরোতে পারবেন না। আবু সালেক তখন গুলিবর্ষণ অব্যাহত রেখে সহযোদ্ধাদের অনুরোধ করলেন বাংকার থেকে বেরিয়ে চলে যেতে। ২২ নভেম্বর চণ্ডীদ্বার বাজারসংলগ্ন খাতপাড়া গ্রামে এক যুদ্ধে মো. আবু সালেক শত্রুপক্ষের ছোড়া শেলের আঘাতে আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে গুয়াহাটি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মো. আমিন উল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম রামেশ্বরপুর, কবিরহাট, নোয়াখালী।
বাবা [illegible] আলী, মা আফিজা খাতুন।
স্ত্রী [illegible] খাতুন। তাঁদের দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৪।

মো. আমিন উল্লাহ যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টর এলাকায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তিনি আহত হন। মাইনের আঘাতে তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটু পর্যন্ত উড়ে যায়। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে ফিল্ড হাসপাতালে পাঠান। পরে তাঁর চিকিৎসা হয় ভারতের মাদ্রাজ ও মুম্বাইয়ে। তিনি পুরোপুরি সুস্থ হননি।

মো. আমিন উল্লাহর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানা সম্ভব হয়নি। তবে এলোমেলো অনেক কথার মধ্যে তাঁর আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। তা হলো, কুমিল্লা রেলস্টেশন থেকে আখাউড়া অভিমুখী তিনটি স্টেশনের পর এক জায়গায় একদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। সেদিন মো. আমিন উল্লাহ মুক্তিবাহিনীর যে দলে (সেকশন) ছিলেন, সেই দলের নেতা আহত হন। তখন তিনি দলনেতার দায়িত্ব নেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের পাশাপাশি ব্যাপক গোলাবর্ষণ করছিল। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকা তাঁদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় মো. আমিন উল্লাহ সহযোদ্ধাদের নিয়ে কিছুটা পিছু হটে অবস্থান নেন। এরপর তিনি সহযোদ্ধাদের সেখানে রেখে অধিনায়কের সঙ্গে পরামর্শ করতে যান। কিছুক্ষণ পর

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে দেখেন, তাঁর দলের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আবার সামনে এগিয়ে বিপজ্জনক অবস্থানে চলে গেছেন। এদিকে অধিনায়ক পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত তাঁকে নিরাপদ স্থানে থাকার নির্দেশ দেন। তীব্রতা কমলে আবার পাল্টা আক্রমণ শুরু হবে। সে জন্য তিনি তাঁর তিন সহযোদ্ধাকে ফিরিয়ে আনতে সামনে যান। তাঁদের নিয়ে ফিরে আসার পথে মাটিতে পাকিস্তানি সেনাদের পেতে রাখা একটি মাইনের ওপর তাঁর পা পড়ে। শরীরের চাপে মাইনটি বিস্ফোরিত হয়ে তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটু পর্যন্ত উড়ে যায়। তিনি পড়ে যান। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে ফিল্ড হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

মো. আমিন উল্লাহ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। মার্চে সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসনের কথা বলে এই রেজিমেন্টের বেশির ভাগ সেনাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেটের শমশেরনগরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অল্প কিছু সেনাকে সেনানিবাসের ভেতরে রাখা হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন।

মো. আমীর হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম কালিকাপ্রসাদ, উত্তরপাড়া, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
বাবা আনসার আলী সরকার, মা মোরশেদা বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৫।
শহীদ ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেটের মধ্যে রেল যোগাযোগের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলস্টেশন মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিক দিক থেকে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কাছেই ভারতের সীমান্তবর্তী শহর আগরতলা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আখাউড়ার বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য মজবুত বাংকার ও পরিখা তৈরি করে অবস্থান নেয়। এখানে ছিল তাদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। এলাকাটি ছিল মুক্তিবাহিনীর ৩ নম্বর সেক্টরের অধীন। নভেম্বরের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল মিত্রবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান নেয়। একটি দলে ছিলেন মো. আমীর হোসেন।

১ ডিসেম্বর প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মো. আমীর হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা আখাউড়ার পার্শ্ববর্তী আজমপুর রেলস্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা দখল করে নেন। ২ ডিসেম্বর ভোরে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ওপর আবার পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এ সময় তাঁদের ওপর বিমান ও আর্টিলারির মাধ্যমে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করা হয়। মো. আমীর হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের এ আক্রমণ মোকাবিলায় ব্যর্থ হন। তাঁদের দখল করা এলাকা হাতছাড়া হয়ে যায়। ৩ ডিসেম্বর সকালে তাঁরা আবার পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ শুরু করেন। দিনভর চলে রক্তক্ষয়ী সম্মুখযুদ্ধ। এ যুদ্ধে মো. আমীর হোসেনসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসেম্বর পিছিয়ে গিয়ে পালিয়ে বাঁচে। অবশ্য এ জন্য আমীর হোসেনসহ মুক্তিবাহিনীর কয়েকজনকে দিতে হয় চরম মূল্য। মুক্তিবাহিনীর লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান, সুবেদার আশরাফ, মো. আমীর হোসেনসহ কয়েকজন শহীদ ও ২০ থেকে ২২ জন আহত হন। তাঁদের প্রাণ ও রক্তদান বৃথা যায়নি। ৬ ডিসেম্বর পুরো আখাউড়া এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ফলে ঢাকা অভিমুখে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করা সহজ হয়। আমীর হোসেনকে সমাহিত করা হয় আজমপুর রেলস্টেশন-সংলগ্ন এলাকায়।

আমীর হোসেন পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। প্রথমে তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। এরপর পুলিশ লাইন থেকে পালিয়ে তিনি নিজের এলাকায় চলে যান। জুনে ভারতে গিয়ে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। সেখানে তাঁকে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। সিংগার বিল, আজমপুর, নবীনগরসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধে অসীম সাহসের পরিচয় দেন।

আমীর হোসেনের গ্রামের লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা তাঁর খেতাব পাওয়ার খবর জেনেছেন ১৯৯৮ সালে।

AMARBOI.COM

মো. ইদ্রিস, বীর প্রতীক

গ্রাম মধ্যম ধলিয়া, সদর, ফেনী।
বাবা সোনা মিয়া, মা আমেনা খাতুন।
স্ত্রী সাফিয়া খাতুন। তাঁদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১২৭। মৃত্যু ২০০৩।

ফেনী জেলার পরশুরাম ও ফুলগাজী থানা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দুই থানার বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলোয় একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর একটি দলে ছিলেন মো. ইদ্রিস। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৭ অক্টোবর চিথলিয়ায় ব্যাপক সেনাসমাবেশ ঘটায়। তাদের লক্ষ্য ছিল মুক্তিবাহিনীর দলগুলো ধ্বংস করা। সন্ধ্যার দিকে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটি কোম্পানি মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটি নিলক্ষ্মীর ওপর আক্রমণ চালায়। মো. ইদ্রিসসহ তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কয়েক ঘণ্টা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ঘাঁটি দখল করে।

মো. ইদ্রিস ও তাঁর সহযোদ্ধারা পরদিন সংগঠিত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করেন। মুক্তিবাহিনী এবার সংখ্যায় ছিল তিন কোম্পানি। গোলন্দাজ বাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহায়তাও পান তাঁরা। ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিবাহিনীর নিলক্ষ্মী ঘাঁটি ত্যাগ করে পিছিয়ে যায়। মো. ইদ্রিস ও তাঁর সহযোদ্ধারা নিলক্ষ্মী ঘাঁটি দখলের পর তাঁদের প্রতিরক্ষাব্যূহ গাবতলী ও মালিবিল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। পরদিন সন্ধ্যায় তাঁদের একটি দল ফেনী-বিলোনিয়া পথের এক জায়গায় অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল বিলোনিয়া যাওয়ার পথে সেই অ্যামবুশে পড়ে। আক্রমণে ১৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা দুজন পাকিস্তানি সেনাকে বন্দী করেন, হস্তগত করেন অনেক অস্ত্রশস্ত্র।

পাকিস্তানি সেনারা নিলক্ষ্মীতে পাতা অ্যামবুশে পর্যুদস্ত হওয়ার পর ২৯ অক্টোবর ভোর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর আবার পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এবার তারা আক্রমণ পরিচালনা করে শালধর, নয়াপুর ও ফুলগাজীর দিক থেকে। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর কামানের ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর কামানগুলোও পাল্টা গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এ সময় শালধর, নয়াপুর ও ফুলগাজীতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মো. ইদ্রিস ও তাঁর দলের সদস্যরা শালধরে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অন্যান্য স্থানের মুক্তিযোদ্ধারাও পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধারা তিন দিক থেকে আক্রমণ শুরু করলে পাকিস্তানি সেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের পর থেকে তারা পালাতে শুরু করে। সেদিন যুদ্ধে প্রায় ৪০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও অসংখ্য আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর দুজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন।

মো. ইদ্রিস কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালের মার্চে তিনি ছুটিতে ছিলেন। তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। পরে ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। চিথলিয়ার যুদ্ধে তিনি আহত হন।

মো. ইদ্রিস ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেন।

AMARBOI.COM

মো. ইদ্রিস আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম বড়খাল, ইউনিয়ন বাংলাবাজার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ। বাবা মো. ইসমাইল, মা জমিরা খাতুন। স্ত্রী উম্মে কুলসুম। তাঁদের চার ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫৯।

মো. ইদ্রিস আলী ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে প্রথম সম্মুখযুদ্ধ করেন বালিউড়া-শনখাই এলাকায়। এই এলাকার সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ছিল ছাতক যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৩ থেকে ১৬ অক্টোবর ছাতক সিমেন্ট কারখানাকে ঘিরে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এতেও ইদ্রিস আলী অংশ নেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের ঠিকমতো অবস্থান নিতে সহায়তা করা এবং রাজাকারদের হটানোই ছিল তাঁর অধীন মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব।

মো. ইদ্রিস আলী ১৯৭১ সালে এইচএসসি পাস করে সিলেটের মদনমোহন কলেজে নৈশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাখায় পড়তেন। একই সঙ্গে দোয়ারাবাজারের বড়খাল জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এপ্রিলে পাকিস্তানি বাহিনী ছাতক ও দোয়ারাবাজারে আসে। তখন তাঁরা কয়েকজন মিলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর ভারতের মেঘালয়ের ইকো ওয়ান ট্রেনিং সেন্টারে প্রথম ব্যাচে ২৮ দিন প্রশিক্ষণ নেন তাঁরা।

প্রথম দিকে 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে ইদ্রিস আলী ও তাঁর সহযোদ্ধারা রাতে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ গুলি চালিয়ে আবার চলে যেতেন ওপারে। এভাবে তাঁরা কয়েকটি ছোট অপারেশন চালান।

জুলাইয়ে মো. ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা পাঠানো হয় দোয়ারাবাজারের বাংলাবাজারে। তখন বাজারটির নাম ছিল পাকিস্তান বাজার। পরে তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে টেবলাই, চানপুর, জয়নগর এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের কাছাকাছি বাংকার ও পরিখা তৈরি করে অবস্থান নেন। তাঁরা কয়েকবার ছাতক-টেংরাটিলা গ্যাসের পাইপলাইন উড়িয়ে দেন। পাকিস্তানি সেনারা এক জায়গায় মেরামত করলে তাঁরা আবার আরেক জায়গায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতেন।

মো. ইদ্রিস মিয়া, বীর প্রতীক

বড়খাপন, মীর্জাগঞ্জ, সদর, কিশোরগঞ্জ।
বাবা মো. হোসেন মিয়া, মা সুনাতন নেছা।
তাঁর দুই স্ত্রী। তাঁদের ৫ ছেলে ও ১১ মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৬। মৃত্যু ১৯৯০।

AMARBOI.COM

১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কে ফোর্সের একাংশ ফেনী মুক্ত করার পর মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে অভিযান শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর দলে আছেন মো. ইদ্রিস মিয়া। সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা চট্টগ্রামের কুমিরায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী একটি দলের মুখোমুখি হন। কুমিরায় চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কে একটি গভীর খালের ওপরের সেতু ধ্বংস করে পাকিস্তানি সেনারা সেতুর দক্ষিণে রাস্তার দুই পাশে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। মুক্তিবাহিনীর সেনারা প্রথমে পাকিস্তানি ওই প্রতিরক্ষাব্যূহ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কারণ, তাঁদের দ্রুত চট্টগ্রামে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। এরপর সেখানে ২০ ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। তারপর পাকিস্তানি সেনারা পশ্চাদপসরণ করে। ১৪ ডিসেম্বর রাত তিনটায় কুমিরা মুক্ত হয়। তখন চট্টগ্রাম আর মাত্র ২২ থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তারা নিহত সেনাদের লাশ ফেলে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়।

মো. ইদ্রিস মিয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। তিনি ছিলেন সুবেদার মেজর। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে এই রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানিকে সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের কথা বলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১ মার্চ থেকে সি এবং ডি কোম্পানি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করছিল। সি কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন মেজর সাফায়াত জামিল (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল)। মার্চের মাঝামাঝি তাঁকে সিলেটে পাঠানো হলে মো. ইদ্রিস মিয়া ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল খিজির হায়াতের (পাকিস্তানি) ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফেরত আনার ব্যবস্থা করেন। ২৭ মার্চ সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি এবং ডি কোম্পানি বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহে মো. ইদ্রিস মিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিদ্রোহের পর প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে মো. ইদ্রিস মিয়া মূল দলের সঙ্গে ভারতে চলে যান। ভারতে তিনি চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারে নানা ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠিত হলে তাঁকে দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মো. ইয়াকুব আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম খাড়েরা, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আবু তাহের, মা মুক্তারের নেছা।
স্ত্রী [illegible] বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২১২। মৃত্যু ১৯৮০।

মো. ইয়াকুব আলী ১৯৭১ সালে চুয়াডাঙ্গা ইপিআর উইংয়ের অধীনে দর্শনা সীমান্তে কর্মরত ছিলেন। ২৬ মার্চ তাঁদের কাছে সংবাদ পৌছায় যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করেছে। তাঁদের কোম্পানির বাঙালি ইপিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করার জন্য আগেই প্রস্তুত ছিলেন। এদিন চুয়াডাঙ্গা ইপিআর উইং সদর দপ্তর থেকেও ওয়্যারলেসযোগে তাঁদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। তাঁরা সেভাবে প্রস্তুত থাকেন।

এদিকে ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যশোর সেনানিবাস থেকে এসে কুষ্টিয়ায় অবস্থান নেয়। চুয়াডাঙ্গা ইপিআর উইং অধিনায়ক আবু ওসমান চৌধুরী স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শে কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত ইপিআর সদস্যদের কুষ্টিয়ার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে মো. ইয়াকুব আলীও অংশ নেন। কুষ্টিয়া মুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর কোম্পানির সঙ্গে মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে এই প্রতিরক্ষা অবস্থানের পতন হলে তাঁরা ভারতে চলে যান। পরবর্তী সময়ে তাঁদের ভারতের তেলঢালায় পাঠানো হয়। এ সময় তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। পরে আবার যুদ্ধে যোগ দেন।

মো. ইয়াকুব আলী এরপর কোথায় যুদ্ধ করেন, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি। তবে ইয়াকুব আলীর স্ত্রী জানান, তাঁর স্বামী কয়েকবার তাঁকে বলেছেন, তিনি সিলেট ও কসবা-আখাউড়া এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। কসবার বগাবাড়িতে এক যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন। এ যুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান তিনি। ইয়াকুব আলীর ছেলে এ কে এম ইকবাল হোসেন জানান, তিনিও এই যুদ্ধের কথা মায়ের কাছে শুনেছেন।

ইয়াকুব আলী বিডিআরের চাকরি থেকে ১৯৭৪ সালে অবসর নেন।

মো. ইসহাক, বীর প্রতীক

গ্রাম গাবতলা, ফুলগাজী, ফেনী।
বাবা সৈয়দ আহম্মদ, মা নুরুন নেহার। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৬। শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মো. ইসহাক ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন নবীন সেনা। প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। ছুটি শেষ হওয়ার আগেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে চলে যান। ১ নম্বর সেক্টরের অধীনে দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পুনর্গঠন করা হলে তাঁকে সেটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি রাজনগর সাব-সেক্টরের অধীন গাবতলা, মনতলা, ফুলগাজী, চিথলিয়া, মুন্সিরহাটসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১ ডিসেম্বর থেকে কয়েক দিনের ব্যবধানে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার পাঠাননগরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কয়েক দফা যুদ্ধ হয়। মুক্তিবাহিনী বিলোনিয়া দখল করে নিলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাঠাননগরে অবস্থান নেয়। মিত্রবাহিনী ও নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ ও দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একাংশ পাঠাননগরে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। তখন দুই পক্ষে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। এ সময় মো. ইসহাকের গায়ে পাকিস্তানি গোলার আঘাত লাগে। গুরুতর আহত হন তিনি।

সহযোদ্ধারা মুমূর্ষু অবস্থায় মো. ইসহাককে উদ্ধার করেন। কিন্তু ফিল্ড হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মারা যান। এর আগে তিনি নিজেও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। মৃত্যুর আগে সহযোদ্ধাদের কাছে তাঁর অনুরোধ ছিল, তাঁকে যেন তাঁর নিজ এলাকায় কবর দেওয়া হয়। তিনি যেখানে শহীদ হন, সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই ছিল তাঁর গ্রামের বাড়ি। তখন পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। এর মধ্যেই সহযোদ্ধারা ইসহাককে তাঁর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে মান্দারপুর গ্রামে কবর দেন। তাঁর শহীদ হওয়ার খবর তাঁর মা-বাবাকে জানানো হয় স্বাধীনতার পর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. এনায়েত হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম চিকাজানি, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।
বাবা তোসাদ্দেক হোসেন, মা জুলেখা খাতুন।
স্ত্রী হামিদা খানম। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪০৯।

কামালপুর জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত সীমান্ত বিওপি। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সুরক্ষিত একটি ঘাঁটি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জুলাইয়ের পর থেকে সেখানে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েক দিন পর পর কামালপুরে আক্রমণ চালান। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ নভেম্বর গভীর রাতে (ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ১৫ নভেম্বর) মুক্তিযোদ্ধারা বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনার জন্য কামালপুরে সমবেত হন। মুক্তিবাহিনীর তিন কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে কামালপুরের পাশের দুটি গ্রামে (ধানুয়া ও খাসিরহাট) অবস্থান নেন। একটি দলে আছেন মো. এনায়েত হোসেন। কাট অফ পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে একটি দল।

আক্রমণ শুরু করার আগে একদল মুক্তিযোদ্ধা সড়কের ওপর মাইন স্থাপন করেন। এরপর তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে একযোগে আক্রমণ শুরু করার জন্য নিজ নিজ অবস্থানে অপেক্ষায় ছিলেন। এ সময় একজন মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র থেকে মিস ফায়ার হয়। তখন রাত আনুমানিক দুইটা। ভোরে আক্রমণ শুরু করার কথা ছিল। এদিকে গুলির শব্দে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। তারা সতর্ক অবস্থাতেই ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। আকস্মিক আক্রমণে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হন। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তখন মো. এনায়েত হোসেনসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালান। ১৫ নভেম্বর সকাল ১১টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর আবু তাহের (বীর উত্তম ও পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) আহত হন। অধিনায়ক যখন আহত হন, তখন মো. এনায়েত হোসেন তাঁর কাছাকাছি ছিলেন। তিনি কয়েকজন সহযোদ্ধার সহযোগিতায় তাঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

মো. এনায়েত হোসেন ১৯৭১ সালে পঞ্চগড় চিনিকলে চাকরি করতেন। মার্চে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তিনি বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসের শেষ দিকে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরের অধীনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. গোলাম ইয়াকুব, বীর প্রতীক

গ্রাম নারানদিয়া, ইউনিয়ন নহাটা, মহম্মদপুর, মাগুরা।
বাবা জমিরউদ্দীন মোল্লা, মা সাজু বিবি।
স্ত্রী শামছুন্নাহার। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮২। মৃত্যু ২০০১।

মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত নহাটা। নহাটার পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেছে নবগঙ্গা নদী। দক্ষিণে নড়াইল জেলা। তখন একটি কাঁচা রাস্তার মাধ্যমে নহাটার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। এই এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের কোনো স্থায়ী ঘাঁটি ছিল না। কিন্তু তারা নিয়মিত টহল দিত। ১৯৭১ সালের ২১ আগস্ট একদল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার নৌকাযোগে নবগঙ্গা নদী দিয়ে নহাটায় আসবে, এ খবর মুক্তিযোদ্ধাদের দলনায়ক মো. গোলাম ইয়াকুব গুপ্তচরের মাধ্যমে আগেই পেয়ে যান। তিনি পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করার সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিযোদ্ধারা তখন সেই এলাকাতেই ছিলেন। ইয়াকুবের দলে ছিলেন ময়মনসিংহের অসীম সাহা, যশোরের দেলোয়ার ও গরিব হোসেন, মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার পরিতোষ প্রমুখ। তাঁদের কাছে ছিল সাতটি এসএলআর, একটি এসএমজি ও তিনটি রাইফেল।

গোলাম ইয়াকুব ও তাঁর সঙ্গীরা দ্রুত তৈরি হয়ে অবস্থান নিলেন নহাটা বাজারের পাশে পাকা স্কুল ভবনের ছাদ ও তহশিল অফিসে। এলাকাটা ফাঁকা। ঘাট পর্যন্ত দেখা যায়। স্থানীয় লোকজন নিরাপদ স্থানে সরে গেছে। একটু পর পাকিস্তানি সেনারা নৌকাযোগে এসে ঘাটে নামে। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার মিলে প্রায় ১০০ জন। গোলাম ইয়াকুবের দলে মাত্র ১১ জন। গোলাম ইয়াকুব আক্রমণের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা তাঁদের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে সবার অস্ত্র। গুলির শব্দের মধ্যে তাদের আর্তচিৎকারও শোনা যেতে থাকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অনেক পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হতবিহ্বল। পাকিস্তানি সেনারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিহত হয় তাদের ৩০ থেকে ৩৫ জন। পরে তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করলে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ স্থানে চলে যান।

এত ক্ষয়ক্ষতির পরও সেদিন পাকিস্তানি সেনারা সেখানেই থেকে যায়। পরদিন ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা আবার পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালান। এই আক্রমণেও বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

মো. গোলাম ইয়াকুব আনসার বাহিনীতে চাকরি করতেন। শুরুতে মাগুরায় প্রতিরোধযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। পরে ভারতে গিয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ নেন। মুক্তিবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দলের নেতৃত্ব দিয়ে তাঁকে গেরিলা অপারেশন করার জন্য মাগুরা এলাকায় পাঠানো হয়। নহাটায় অ্যামবুশ করার দিন কয়েক পর মহম্মদপুর থানার জয়রামপুরে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম চরবাতিয়া, শাহজাদপুর, পাবনা।
বাবা কেরামত আলী, মা লুৎফন নেছা।
স্ত্রী রওনক জাহান। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৭২।

পাবনার পাকশী ও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা রেলস্টেশনের মাঝ বরাবর পদ্মা নদীর ওপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। ১ দশমিক ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ রেলসেতুর পুরোটাই ইস্পাতের তৈরি। দেশের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই রেলসেতু ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের সময় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ রক্ষার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাতে নদীর দুই পাড়ে শক্তিশালী সার্চলাইট জ্বালিয়ে রাখত। নদীতে কচুরিপানা ভেসে গেলেও দেখা যেত। কয়েকটি গানবোট সর্বক্ষণ টহল দিয়ে বেড়াত। সেতুর দুই পাশে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প। প্রথমবার মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোরা সেতুতে অপারেশন করতে ব্যর্থ হন। ফিরে যাওয়ার পথে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পরে নৌ-কমান্ডো আহসানউল্লাহর (বীর প্রতীক) নেতৃত্বে আরেকটি দলকে এ জন্য ভারত থেকে পাঠানো হয়। এ দলে ছিলেন মো. নজরুল ইসলাম। তাঁরাও প্রথমবার ব্যর্থ হন। এরপর তাঁরা দুর্যোগপূর্ণ একটি দিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কয়েক দিন পরই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। ওই দিন সমুদ্র এলাকায় ছিল ৯ নম্বর বিপৎসংকেত। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকের একটি দিন।

নৌ-কমান্ডো নজরুল ইসলামসহ তাঁর দলনেতা অপারেশনের জন্য বেছে নিলেন এ দিনটিই। গোপন ঘাঁটিতে বিকেল থেকে শুরু হলো প্রস্তুতি। সন্ধ্যায় খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে রওনা হলেন তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন নদীর ধারে। তারপর নেমে পড়লেন নদীতে। তখন মধ্যরাত। টার্গেটের (রেলসেতু) আশপাশে কড়া পাহারা। চারদিক আলোকিত। নদীর দুই পাড়ে শক্তিশালী সার্চলাইট জ্বালানো। অন্যদিকে নদীতে প্রবল স্রোত। সবকিছু উপেক্ষা করে নজরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোদ্ধারা এগিয়ে যেতে থাকলেন রেলসেতুর নির্দিষ্ট পিলার লক্ষ্য করে। অনেক কষ্টে পৌঁছালেন সেখানে। তারপর পিলার বেয়ে ওপরে উঠলেন। সেতুর দুই পাশে লোহার ফেন্সিং। তাতে ডেটোনেটর লাগানোর কাজ শেষ হলো মিনিট কয়েকের মধ্যে। তারপর সেফটি ফিউজ অন করে ঝাঁপ দিলেন নদীতে। স্রোতের অনুকূলে ডুব দিয়ে চলে গেলেন নিরাপদ জায়গায়। ১৫-২০ মিনিট পরই ঘটল বিস্ফোরণ। সেতুর ওপর ভেঙে পড়ল লোহার বিরাট রেলিং।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পাকিস্তানি সেনাদের কঠোর প্রহরার মধ্যেই দুঃসাহসিকতার সঙ্গে নজরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোদ্ধারা এই অপারেশন পরিচালনা করেন। সেতুর মূল কাঠামো ধ্বংস করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। রেল যোগাযোগ ব্যাহত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। সেদিন তাঁরা সফলতার সঙ্গে তা করতে সক্ষম হন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নজরুল ইসলাম পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধের সময় পাবনা জেলার কাশীনাথপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। এরপর ভারতে চলে যান। পরে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'অপারেশন জ্যাকপট'-এর অধীনে মংলা বন্দরে অপারেশন পরিচালনার পাশাপাশি আরও কয়েকটি অপারেশনে তিনি অংশ নেন।

মো. নূর ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম ধানুয়া, বকশীগঞ্জ, জামালপুর। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম সূর্যনগর, বকশীগঞ্জ। বাবা রইসউদ্দিন, মা নবীরন নেছা। স্ত্রী নুরুননাহার। তাঁদের চার ছেলেমেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮৩।

AMARBOI.COM

মো. নূর ইসলাম ১১ নম্বর সেক্টরের অধীন মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন। তাঁর যুদ্ধ এলাকা ছিল কামালপুর। তাঁর বাড়িও এই এলাকায়। ১৯৭১ সালে এপ্রিল পর্যন্ত ওই এলাকা মুক্ত ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী কামালপুরে ঘাঁটি স্থাপন করলে ২২ মে তিনি ভারতে গিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ যুবশিবিরে আশ্রয় নেন। পরে তেলঢালা পাহাড়ে এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে যোগ দেন।

জুলাইয়ের শেষ থেকে কামালপুর এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ হয়। নূর ইসলাম খাসিয়াপাড়া, বাট্টাজোড়, কামালপুর, উঠানিপাড়া, গলাকাঠি, খাসির গ্রাম, তেনাচিড়া ও ধানুয়ার যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি স্থানীয় লোক হওয়ায় যুদ্ধে তাঁর আরেকটি দায়িত্ব ছিল। তাঁকে বেশির ভাগ সময় গাইড হিসেবে কাজ করতে হতো। নূর ইসলাম মুক্তিযোদ্ধাদের রাস্তাঘাট চিনিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করতেন। সে কারণে বেশির ভাগ সময় তাঁকে সবার পুরোভাগেই থাকতে হতো।

১৭ অক্টোবর ধানুয়ায় সম্মুখযুদ্ধে নূর ইসলাম গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে তুরায় পাঠিয়ে দেন। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রথমে গোয়াহাটি, পরে লক্ষ্ণৌতে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে থাকা অবস্থায় দেশ স্বাধীন হয়।

নূর ইসলাম জানান, তিনি দুটি খেতাব পেয়েছেন—'বীর প্রতীক' ও 'বীর বিক্রম'। এটি তিনি ২০১১ সালে জেনেছেন। তিনি বীর প্রতীকের সনদ পেয়েছেন, কিন্তু বীর বিক্রম খেতাবের সনদ এখনো পাননি। বীর বিক্রমের গেজেটে তাঁর নম্বর ১৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নোয়াব মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম কুড়িপাইকা, দক্ষিণ ইউনিয়ন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা মনতাজ উদ্দিন, মা আজিবন নেছা। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৩২৩। শহীদ ১৯৭১ (১৬ শ্রাবণ)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিঙ্গারবিলের অপর পারে ত্রিপুরার আগরতলার নরসিংহগড়। সেখানে টিনশেডের একটি লম্বা ঘরে থাকতেন মো. নোয়াব মিয়াসহ মুক্তিবাহিনীর ছাত্র প্লাটুনের (স্টুডেন্ট প্লাটুন) ৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা। আকাশে মেঘ, দিনে-রাতে কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি, কখনো মুষলধারে বৃষ্টি। ১৫ শ্রাবণ তাঁদের জানানো হলো, আজ কালাছড়া চা-বাগানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটিতে আক্রমণ চালানো হবে। বাগানটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই ঘাঁটির কারণে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতরে গিয়ে অপারেশন চালাতে পারছেন না। ১৬ শ্রাবণ রাতে তাঁরা টিলা ও পাহাড় বেয়ে নেমে আসেন বিষ্ণুপুরের কালাছড়া চা-বাগানে। তাঁদের সঙ্গে ছিল নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর আরও দুটি দল। নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন (বীর প্রতীক) ও লেফটেন্যান্ট হারুন-অর-রশিদ (বীর প্রতীক)। চা-বাগানের দক্ষিণ দিকে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। ভোর থেকে সেখানে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ।

নোয়াব মিয়া এলএমজির গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁকে কাভার দেন কয়েকজন সহযোদ্ধা। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের একেবারে কাছে চলে যান। তাঁর এলএমজির গুলিতে লুটিয়ে পড়ে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তাঁর এই সাহসিকতা সহযোদ্ধাদের মনেও সাহস জোগায়। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে একপর্যায়ে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন নোয়াব মিয়া। তখনো সহযোদ্ধাদের বুঝতে দেননি যে তাঁর বুকে গুলি লেগেছে। চিৎকার করে সহযোদ্ধাদের বলতে থাকেন, 'ফায়ার ফায়ার, পাকিস্তানি সেনাদের একজনও যেন বাঁচতে না পারে।'

ভোরের আলো ফুটলে নোয়াবের বুকে গুলি লাগার বিষয়টি জানা যায়। তখনো তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। পরে গ্রুপ কমান্ডার হাবিলদার আবদুল আলীম ও সহযোদ্ধারা গাড়িতে করে তাঁর লাশ নিয়ে যান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের লংকামুড়া গ্রামে। পরিবারের সদস্যদের হাতে তাঁরা তুলে দেন তাঁর লাশ। তাঁর মা-বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যরা দেশ থেকে পালিয়ে এসে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নোয়াব মিয়াকে ভারতের লংকামুড়ায় সমাহিত করা হয়। নোয়াব মিয়ার বাড়ি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন এলাকায়।

নোয়াব মিয়া পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি ত্রিপুরায় প্রশিক্ষণ নেন। বয়স কম বলে তাঁকে রাখা হয় স্টুডেন্ট প্লাটুনে। এই প্লাটুনে তাঁর নিজের গ্রাম আখাউড়ার কুড়িপাইকা, পার্শ্ববর্তী হীরাপুরসহ কয়েকটি গ্রামের বেশ কজন ছাত্র ছিলেন। কালাছড়া চা-বাগানের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নোয়াব মিয়াসহ দুজন শহীদ ও আহত হন কয়েকজন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৫-১৬ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. বজলুল গনি পাটোয়ারী

বীর প্রতীক

গ্রাম মদনগাঁও, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। বর্তমান ঠিকানা মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা। বাবা আবদুর রহিম পাটোয়ারী, মা আফিয়া খাতুন। স্ত্রী লায়লা পারভীন। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮।

মো. বজলুল গনি পাটোয়ারীর প্রথম যুদ্ধ ছিল কামালপুরে। সেদিন তিনি তাঁর অস্ত্র চালাতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলি ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ একটি গুলি লাগে তাঁর পেছনে থাকা এক সহযোদ্ধার বুকে। চোখের সামনেই ঢলে পড়েন তাঁর সহযোদ্ধা। এ দৃশ্য দেখে ভয় পেলেন না তিনি। বরং দীর্ঘদিন অস্ত্র না চালানোর অনভ্যস্ততা তাঁর মুহূর্তে কেটে গেল। মনে জেদও চাপল। তারপর বিরামহীনভাবে অস্ত্র চালাতে লাগলেন।

বজলুল গনি পাটোয়ারী এরপর যুদ্ধ করেন অনেক জায়গায়। তাঁর সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল ১৪ ডিসেম্বর এমসি কলেজে। সেদিন তাঁর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দলের সামনে হঠাৎ এসে থামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আর্টিলারি গান ও দুটি জিপের কনভয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সহযোদ্ধাদের বলেন গোলাবর্ষণ করতে। মর্টারের গোলায় জিপে আগুন ধরে যায়। হকচকিত পাকিস্তানি সেনারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। এ সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। তারপর সেখানে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। সীমান্ত এলাকা থেকে অগ্রসরমাণ মুক্তিযোদ্ধারা ১৩ ডিসেম্বর রাতে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজসংলগ্ন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থানের মুখোমুখি হন। তাঁরা অবস্থান নিয়েছিলেন পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের ৫০০ গজ দূরে টিলার ওপর। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ডি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন মো. বজলুল গনি পাটোয়ারী। তাঁদের কাছাকাছি ছিল লেফটেন্যান্ট হাফিজউদ্দীন আহমদের (বীর বিক্রম, পরে মেজর) নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের বি কোম্পানি।

তখন খাদিমনগরে যুদ্ধ চলছিল। সেই প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভেতর দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা এত তাড়াতাড়ি সিলেট শহরে আসবেন, তা পাকিস্তানি সেনারা কল্পনাও করেনি। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের পোশাক, হেলমেট ও অস্ত্রশস্ত্রও ছিল দেখতে পাকিস্তানি সেনাদের মতোই। এতে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের দলের লোক বলেই ধারণা করেছিল। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা চিৎকার করে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করে। মুক্তিযোদ্ধারা জবাব না দিয়ে নীরবে পরিখা খুঁড়ে অবস্থান নিতে থাকেন। সকালে মো. বজলুল গনি পাটোয়ারীর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের সামনের রাস্তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি আর্টিলারি গান ও দুটি জিপের কনভয় এসে থামে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা ওই কনভয়ের ওপর আক্রমণ চালান।

মো. বজলুল গনি পাটোয়ারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। জুলাইয়ের শেষ দিকে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডি কোম্পানির অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. মোস্তফা কামাল, বীর প্রতীক

গ্রাম বসন্তপুর, ইউনিয়ন বাতিসা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
বাবা বজলুর রহমান, মা আছমতের নেছা। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৪০।
গেজেটে নাম মোহাম্মদ মোস্তফা। শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা কামাল নিজের কাছে থাকা গ্রেনেড বিস্ফোরণে শহীদ হন। কারও কারও মতে, এ ঘটনা ঘটে দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই দিন পর। সে সময় তিনি কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় কর্মরত ছিলেন। ৭ ডিসেম্বর কুমিল্লা শহর মুক্ত হয়। কিন্তু কুমিল্লা সেনানিবাস এবং এর আশপাশের কিছু এলাকা পাকিস্তানি সেনাদের দখলে ছিল।

১ ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল আইন উদ্দিনের (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল) নেতৃত্বে কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হয়। ৭ ডিসেম্বর দলটি কুমিল্লা শহরে প্রবেশ করে। তারা ২ নম্বর সেক্টরের নির্ভয়পুর সেক্টর থেকে যাত্রা শুরু করে পথে তেমন বাধার সম্মুখীন হয়নি। কুমিল্লা শহর মুক্ত হওয়ার পর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা কুমিল্লা সেনানিবাসের চারদিকে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। তখন তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারাও যোগ দেন। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের সদস্য ছিলেন মো. মোস্তফা কামাল।

মুক্তিযোদ্ধারা আইন উদ্দিনের নেতৃত্বে কুমিল্লা সেনানিবাসে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন মিত্রবাহিনীর হাইকমান্ড থেকে আইন উদ্দিনকে জানানো হয়, কুমিল্লা সেনানিবাস আক্রমণ করতে হবে না। কুমিল্লা সেনানিবাসে মিত্রবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে, যাতে পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করে। এই নির্দেশের পর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ না করে সেনানিবাসের চারদিকে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। একটি প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন মো. মোস্তফা কামাল। ১৪ ডিসেম্বর দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় অনবধানতাবশত তাঁর পকেটে থাকা একটি গ্রেনেডের পিন খুলে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়ে বেঁচে গেলেও আত্মরক্ষার জন্য নিজের কাছে থাকা গ্রেনেড বিস্ফোরণে তিনি শহীদ হন।

মো. মোস্তফা কামাল চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ছুটিতে ছিলেন। ২৫ মার্চের পর তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় বেশ কিছু প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশ নেন। পরে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকার অধীন কুমিল্লা অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধ করেন। লাকসাম রেলওয়ে জংশনের উত্তরে বাগমারা রেলসেতু ধ্বংস, মিয়াবাজার ও নোয়াবাজার অপারেশনে তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেন। বাগমারা রেলসেতু ধ্বংসের অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণে মোস্তফা কামালের বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধা হতাহত হন। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। তাঁদের ওই অপারেশনের ফলে কয়েক দিনের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম মধ্যভাটের চর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
বাবা আবদুল আলী দেওয়ান, মা ফরিদা খাতুন।
স্ত্রী ডালিয়া সুলতানা। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩২।

মো. রফিকুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ২৮ মে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মেলাঘরে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ২ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। পরে মুন্সিগঞ্জ জেলায় থানা কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৪ আগস্ট মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় মধ্যভাটের চরে একটি সেতু ধ্বংসের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত শেলের আঘাতে তিনি আহত হন। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে তিনি আবার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

মো. রফিকুল ইসলাম মুন্সিগঞ্জ, টঙ্গিবাড়ী, গজারিয়া, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, হোমনা, দেবীদ্বার, পানতি, পাহাড়পুর, কোনাবন এবং ঢাকার মাতুয়াইলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের তাঁবেদার রাজাকারদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় গেরিলা কায়দায় খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করেন।

১৯৭১ সালে মো. রফিকুল ইসলামের বয়স ছিল ১৫। সে সময় তিনি মুন্সিগঞ্জ রামপাল হাইস্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন।

AMARBOI.COM

মো. রুস্তম আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম ঘোড়ামারা, ইউনিয়ন সোনাইছড়ি, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
বাবা মখলেছুর রহমান, মা জোবেদা বেগম।
স্ত্রী কুলসুম আরা। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৮৩।

মো. রুস্তম আলী পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের শুরুতে ছুটি নেন। মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে পাকিস্তানি সেনাদের মতিগতি তাঁর ভালো মনে হয়নি। তাই তিনি চাকরিতে যোগ না দিয়ে আবার ছুটির আবেদন করেন। এর মধ্যে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সে সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন। ২৬ মার্চেই প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন যুদ্ধে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকের ঘটনা। কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি বহর যাচ্ছিল চট্টগ্রামের দিকে। কুমিরা হয়েই তাদের যেতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিরোধযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়ার নেতৃত্বে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ এবং স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে গড়া প্রতিরোধযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করবেন। রুস্তম আলীও ছিলেন এ দলের একজন সদস্য।

কুমিরার প্রধান সড়কে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিক বরাবর ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো করে অবস্থান নিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। একটা দিক খোলা রাখা হলো। সেদিকে তাঁরা সৃষ্টি করলেন ব্যারিকেড। এ কাজে জনগণও তাঁদের সহায়তা করল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল ব্যারিকেডের সামনে পৌঁছে তৎপর হলো সেটি অপসারণে। ঠিক তখনই গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রগুলো। সামনের বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আকস্মিক এ হামলায় পাকিস্তানি সেনারা হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ চলল এখানে। সেদিন পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হলো।

প্রথম দিনের যুদ্ধে রুস্তম আলীসহ প্রায় ১৫০ জন যোদ্ধা অংশ নেন। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাসংখ্যা ছিল কয়েক শ। থেমে থেমে কয়েক দিন এখানে যুদ্ধ চলে। শেষ দিন পাকিস্তানি সেনারা বিপুল শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়। তাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র মোকাবিলা করার শক্তি প্রতিরোধযোদ্ধাদের ছিল না। ফলে তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। এ যুদ্ধে প্রতিরোধযোদ্ধাদের ১৪ জন শহীদ হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শতাধিক সদস্য নিহত হয়।

এ যুদ্ধের পর প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে রুস্তম আলী ভারতে চলে যান। সেখানে নতুন করে আবার যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। ট্রেনিং শেষে তাঁকে একটি গেরিলাদলের নেতা করে আবার সীতাকুণ্ড এলাকায় পাঠানো হয়। তিনি গেরিলাযুদ্ধে অংশ নেন। ডিসেম্বরের ১২-১৩ তারিখে বাঁশবাড়িয়া-কুমিরা এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে তিনি মুখোমুখি যুদ্ধ করেন। এটি ছিল তাঁর শেষ যুদ্ধ।

AMARBOI.COM

মো. শহীদুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম পূর্ব বশিকপুর, ছাগলনাইয়া, ফেনী। বর্তমান ঠিকানা মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা। বাবা আলী আহমদ, মা আফিয়া খাতুন। স্ত্রী সায়মা শহীদ। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম জেলা শুরু হওয়ার আগে একটি ছোট ভূখণ্ড ঢুকে গেছে ভারতের ভেতরে। এর তিন দিকে ভারতীয় সীমান্ত। পরশুরাম থানার অন্তর্গত এ অঞ্চলেরই নাম বিলোনিয়া। প্রায় ২৮-২৯ কিলোমিটার লম্বা ও ১০ কিলোমিটার প্রশস্ত এ অঞ্চল। ৩ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রথম বিলোনিয়ায় আক্রমণ করে। যুদ্ধ চলে ২১ জুন পর্যন্ত।

বিলোনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। পশ্চিম দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর নোয়াপাড়া এলাকায় ছিলেন মো. শহীদুল ইসলাম। ৩ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল বান্দু-দৌলতপুর রেললাইন ও ছাগলনাইয়া থেকে উত্তর দিক অভিমুখী রেললাইন বরাবর অগ্রসর হয়ে প্রথম আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ চালালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং পিছু হটে। ১১ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবার আক্রমণ করে। এবারও তারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এর পর থেকে প্রতিদিন সেখানে যুদ্ধ চলতে থাকে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান নাজুক হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক বুঝতে পারলেন, পাকিস্তানি সেনাদের আর ঠেকানো যাবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন পশ্চাদপসরণের। মুক্তিবাহিনীর সব দলকে খবর পাঠালেন। এক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মো. শহীদুল ইসলাম। তিনি অধিনায়কের বার্তা পাননি। তিনি থেকে যান নিজেদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনার একটি বহর বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করল তাঁদের অবস্থান লক্ষ্য করে। শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা মো. শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে চললেন।

২১ জুন বিকেলের দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার, ট্যাংক নিয়ে আক্রমণ শুরু করে। সারা রাত সেখানে যুদ্ধ চলে। গোটা এলাকায় গোলাগুলির ফলে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ছেড়ে যাওয়া এলাকা সহজেই দখল করে নেয়, শুধু নোয়াপাড়ার অংশ ছাড়া। মো. শহীদুল ইসলাম তাঁর দল নিয়ে কয়েক ঘণ্টা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। এভাবে বিলোনিয়ার প্রথম যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

মো. শহীদুল ইসলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মুলতান সেনানিবাসের ৬ সিগন্যাল ব্যাটালিয়নে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময় ছুটিতে দেশে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। পরে ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অপারেশনের মধ্যে আছে ছাগলনাইয়া এবং ফুলগাজী রেল ও সড়কসেতু আক্রমণ।

AMARBOI.COM

মো. শহীদুল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম বদলকোট, চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা ফজলুল হক মুন্সী, মা জমিলা খাতুন।
স্ত্রী আমেনা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৮১। মৃত্যু ২০০৮।

ভারতের তেলিয়ামুড়া থেকে রাতে আকাশে ডানা মেলে দিল একটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার। তাতে দুজন পাইলট ও একজন গানার। পাইলট সুলতান মাহমুদ (বীর উত্তম, পরে এয়ার ভাইস মার্শাল ও বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমানবাহিনীর প্রধান) ও বদিউল আলম (বীর উত্তম, পরে স্কোয়াড্রন লিডার)। গানারের নাম মো. শহীদুল্লাহ। গন্তব্য নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল। হেলিকপ্টারটি রাতের অন্ধকারে কুমিল্লা-ঢাকা মহাসড়ক লক্ষ্য করে দাউদকান্দির দিকে অগ্রসর হয়। তারপর দ্রুত ঢাকার ডেমরার কাছে এসে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দক্ষিণে গোদনাইলের দিকে রওনা হয়। লক্ষ্যস্থলের কাছে যাওয়ামাত্র মো. শহীদুল্লাহ তেলের ট্যাংকার লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। মুহূর্তেই ট্যাংকারগুলো বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। চোখের পলকে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে আকাশ। বিস্ফোরণের শব্দে জেগে ওঠা মানুষ ও পাকিস্তানি সেনারা অবাক বিস্ময়ে দেখে সেই আগুনের লেলিহান শিখা। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতের ঘটনা এটি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই অপারেশন এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। এত দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জলে-স্থলে আক্রমণ চালিয়েছে, এবার ব্যতিক্রম ঘটল। মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং গঠিত হওয়ার পর অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে পাকিস্তানি সেনারা ত্রিমুখী আক্রমণের শিকার হতে থাকে। ৩ ডিসেম্বর দুটি জায়গায় একযোগে আক্রমণ পরিচালিত হয়—চট্টগ্রামে ইস্টার্ন রিফাইনারি-সংলগ্ন তেল ডিপো ও গোদনাইলের তেল ডিপোতে। এ দুই ডিপোতে পাকিস্তানি সেনারা বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল যুদ্ধের জন্য মজুদ করে রেখেছিল। এসব ডিপো থেকে তাদের স্থল, নৌ ও আকাশযানের জন্য জ্বালানি সরবরাহ করা হতো। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকবার চেষ্টা করেও তেল ডিপোর ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হন। সেদিনের আক্রমণে তেল ডিপো দুটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং বেশির ভাগ জ্বালানি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এতে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল ভেঙে পড়ে।

মো. শহীদুল্লাহ চাকরি করতেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঢাকায়। ২৫ মার্চ রাতে তিনি কুর্মিটোলায় ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেন। বাঙালি সহকর্মী ওয়ারেন্ট অফিসার মজিদসহ একজনকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁর চোখের সামনেই গুলি করে হত্যা করে। কয়েক দিন পর তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। পরে ভারতে চলে যান। ভারতের আগরতলায় থাকার সময় তিনি মুক্তিবাহিনীর নবগঠিত বিমান উইংয়ে যোগ দেন। এখানে যোগ দেওয়ার আগে আগরতলায় মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্পে সংগঠক ও প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন। ভারত সরকার সেপ্টেম্বরে মুক্তিবাহিনীকে তিনটি বিমান দেয়। একটি ডিসি ৩ বা ডাকোটা, একটি অটার ও অন্যটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার। এর মধ্যে শেষের দুটি যুদ্ধবিমানের উপযোগী ছিল না। মো. শহীদুল্লাহসহ কয়েকজন বিমান দুটিকে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. শহীদুল্লাহ, বীর প্রতীক

মনেশ্বর রোড, লালবাগ, ঢাকা।
বাবা সফিকউল্লাহ, মা আংগুরা বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩০।
নৌকাডুবিতে নিহত ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মো. শহীদুল্লাহ খোকন ১৯৭১ সালে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলেন। পুরান ঢাকায় মামার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়াশোনা করতেন। তাঁর মামা কাজী কাদের সে সময় বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। মামার জন্য মো. শহীদুল্লাহ যুদ্ধে যোগ দিতে পারছিলেন না। মে মাসের শেষ দিকে মামার বাড়ি থেকে পালিয়ে শহীদুল্লাহ পুরান ঢাকার কয়েকজনের সঙ্গে ভারতে চলে যান। সেখানে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁরা ১১ নম্বর সেক্টর এলাকায় ছোটখাটো অপারেশনে অংশ নিতে থাকেন। এ সময় ২ নম্বর সেক্টরের প্রধান মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁদের কথা জানতে পারেন। তিনি ঢাকা শহরের অধিবাসী বলে তাঁদের নিজের সেক্টরে নিয়ে এসে ঢাকাবাসী কয়েকজন ছাত্র-যুবকের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁদের পুনরায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে ঢাকা মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে গেরিলাযুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়। কিশোর মো. শহীদুল্লাহ বেশ কয়েকটি দুঃসাহসিক অপারেশনে অংশ নেন। তাঁদের দল বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে।

খোলামুড়া ঘাট ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পুরান ঢাকার অধিবাসী কয়েকজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কেরানীগঞ্জে। বেশির ভাগই পুরান ঢাকার বাসিন্দা। তাঁরা ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে মুন্সিগঞ্জ, ঢাকার কেরানীগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায় গেরিলাযুদ্ধে অংশ নেন। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করার পর ১৭ ডিসেম্বর তাঁরা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ঢাকায় ফিরছিলেন। পথে ধলেশ্বরী নদী। নদীটি তখন ছিল বেশ প্রমত্তা ও প্রশস্ত। মো. শহীদুল্লাহ, আবুল হোসেনসহ আরও একদল মুক্তিযোদ্ধা একটি নৌকায় চেপে খোলামুড়া ঘাট থেকে নদী পার হচ্ছিলেন। মাঝ নদীতে নৌকাটি হঠাৎ ডুবে যায়। মো. শহীদুল্লাহ, আবুল হোসেনসহ বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধাই সাঁতার জানতেন না। সাঁতার জানা সহযোদ্ধারা দু-তিনজনকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা নদীতে ডুবে মারা যান। পরে স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় তাঁদের মরদেহ নদীর বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. সাইফউদ্দীন, বীর প্রতীক

গ্রাম দেউলপাড়া, ইউনিয়ন পাইথন, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। বাবা মফিজউদ্দীন, মা আজিমুন নেছা। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের ছয় ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮৬।

মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব আর্টিলারি গঠন ও ব্যবহার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রশিক্ষণ শেষে এই ইউনিট প্রথম অপারেশন করে দক্ষিণগুলে। পরে এই ইউনিটের নাম হয় 'রওশনআরা ব্যাটারি'। এই ইউনিটের কাছে ছিল ছয়টি ১০৫ মিলিলিটার কামান। এই অপারেশনের আগে বড়লেখার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিবাহিনীর আর্টিলারি ইউনিট কামান নিয়ে অবস্থান নেয়। একটি কামান থেকে গোলা ছোড়ার দায়িত্বে ছিলেন মো. সাইফউদ্দীন।

দক্ষিণগুল চা-বাগান মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে ঘাঁটি করে। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২২ বালুচ রেজিমেন্টের একাংশ। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একাংশ দক্ষিণগুল চা-বাগানের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করে। তখন মুক্তিবাহিনীর একদল সেনা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান। ওয়্যারলেসে আর্টিলারিকে বলা হয় পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণের জন্য। ছয়টি কামানের মধ্যে কেবল মো. সাইফউদ্দীনের কাছে থাকা কামানটিই ছিল পাকিস্তানি অবস্থানের আওতায়। নির্দেশ পেয়ে তিনি অনেক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সঙ্গে কামানের গোলা ছোড়েন। এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম কামানের গোলা দিয়ে আক্রমণ। তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল, কামান থেকে সঠিকভাবে গোলা নিক্ষিপ্ত হবে কি না। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তিনি তাঁর সহযোগীদের গোলা ছোড়ার নির্দেশ দেন। মুহূর্তের মধ্যে কামান থেকে গোলা উৎক্ষিপ্ত হয়। এরপর ওই কামান থেকে আরও কয়েকটি গোলা ছোড়া হয়। পরে তাঁদের জানানো হয়, সঠিক স্থানে গোলা পড়েছে এবং নিক্ষিপ্ত গোলায় অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা হতাহত ও ছিন্নভিন্ন হয়েছে। পরে তাঁরা সিলেট অভিমুখে রওনা দেন। ৭ ডিসেম্বর সিলেটের কাছাকাছি পৌঁছে সিলেট শহরের দিকে কামান তাক করে সাইফউদ্দীন ও তাঁর সহযোদ্ধারা গোলাবর্ষণ করেন।

সাইফউদ্দীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। এ সময় তিনি আহত হন। সুস্থ হয়ে জুন মাসের শেষে ভারতে যান। ৪ নম্বর সেক্টরের কুকিতল সাব-সেক্টরে যাওয়ার পর তাঁকে মুক্তিবাহিনীর আর্টিলারি ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. হেলালুজ্জামান, বীর প্রতীক

গ্রাম দেবশ্রী, সদর, নেত্রকোনা। বর্তমান ঠিকানা কাইলাটি সড়ক, কুড়পাড়, নেত্রকোনা। বাবা আবদুল গফুর, মা হালিমা আক্তার খাতুন। স্ত্রী হামিদা আক্তার। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯০।

মো. হেলালুজ্জামান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তান কমান্ডের সদর দপ্তরের প্রকৌশল শাখায় কর্মরত ছিলেন। মার্চের প্রথম দিকে হেলালুজ্জামানসহ কয়েকজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ শোনার জন্য কর্মস্থলে প্রচারণা চালান। এ জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের কালো তালিকাভুক্ত করে। বিষয়টি জানতে পেরে তিনি কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যান। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ২৫ মার্চ রাতে তিনি নারায়ণগঞ্জে ছিলেন। পরে সেখান থেকে পালিয়ে নিজ এলাকা নেত্রকোনা হয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের মহেষখোলায় যান। কিছুদিন পর সেখানে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

জামালপুর জেলা ছিল মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরের আওতায়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জামালপুরের কামালপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বড় ঘাঁটি। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সাব-সেক্টর কমান্ডার আবু তাহেরের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল ১৫ আগস্ট ভোরে কামালপুরে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণ করে। মো. হেলালুজ্জামান ছিলেন একটি দলের নেতৃত্বে। তাঁদের কাছে অস্ত্র বলতে ছিল এসএমজি, স্টেনগান ও রাইফেল। যথাসময়ে তাঁরা আক্রমণ শুরু করেন। হেলালুজ্জামানের ওপর দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৫ নম্বর বাংকারে আক্রমণ করার। এই বাংকার ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থানে। হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতিতে আক্রমণের পর তাঁদের সবার সেখান থেকে সরে পড়ার কথা ছিল। অন্যান্য দল নিরাপদে পেছনে সরে গেলেও হেলালুজ্জামানের দলটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যায়। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর বেশ কিছু গ্রেনেড ছোড়েন। গ্রেনেড বিস্ফোরণে বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। একপর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য দল এগিয়ে এসে পাল্টা আক্রমণ করলে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে তাদের মূল ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়। সেদিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৫-১৬ জন নিহত হয়। আহত হন মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন।

হেলালুজ্জামান পরে আরও কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। ১৪-১৫ নভেম্বর কামালপুরে সেক্টর কমান্ডার আবু তাহেরের নেতৃত্বে কামালপুরে এক বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হেলালুজ্জামান ছিলেন একটি দলের নেতৃত্বে। সেদিন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও তাঁরা ব্যর্থ হন। ১৫ নভেম্বর সকালে বিজয় নিশ্চিত ভেবে সেক্টর কমান্ডার আবু তাহের নিরাপদ অবস্থান ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতরে চলে আসেন। তখন তিনি নিজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। সে সময় মো. হেলালুজ্জামান তাঁর কাছেই ছিলেন। সকাল নয়টার দিকে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া একটি শেল সেখানে এসে পড়ে বিস্ফোরিত হয়। শেলের একটি টুকরা আবু তাহেরের একটি পায়ে আঘাত করে। তাঁর পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। মুক্তিযোদ্ধাদের এই আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। আহত মেজর আবু তাহেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দ্রুত ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

মোজাফ্ফর আহম্মদ, বীর প্রতীক

গ্রাম সোনাপুর, ইউনিয়ন কাজীরবাগ, সদর, ফেনী।
বাবা সেখ আহম্মদ ভূঞা, মা জায়রা খাতুন।
স্ত্রী আমেনা খাতুন। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৯।

AMARBOI.COM

মোজাফ্ফর আহম্মদ ১৯৭১ সালে চুয়াডাঙ্গার ইপিআর উইংয়ে কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত ইপিআর জওয়ানদের নিয়ে বিদ্রোহ করে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে তিনি নিজের উদ্যোগে ও চেষ্টায় মোজাফ্ফর বাহিনী গঠন করেন এবং সেই বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হন। পরে উইং কমান্ডার মেজর এম আবু ওসমান চৌধুরীর (পরে লে. কর্নেল) নির্দেশে ৩০-৩১ মার্চ কুষ্টিয়ার হেজামারায় যুদ্ধ করেন।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ইপিআর আয়োজিত কুচকাওয়াজে তিনি অংশ নেন। সেখানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁদের সালাম গ্রহণ করেন। আগস্ট থেকে বিজয় লাভ পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা, বৈদ্যনাথতলা (মুজিবনগর), প্রাগপুর, কাজীপুর, ঝিকরগাছা, নাভারন, বিশখালী, বেনাপোলসহ আরও কয়েকটি স্থানে তিনি যুদ্ধ করেন।

দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে পারিবারিক অভাব-অনটন মোকাবিলায় তিনি নানা রকম ব্যবসা করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ইপিআরে যোগ দেন।

মোজাফ্ফর আহম্মদ ১৯৮৫ সালে অনারারি ক্যাপ্টেন হিসেবে বিডিআরের চাকরি থেকে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজাম্মেল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম সোলমাইদ, ইউনিয়ন ভাটারা, ঢাকা।
বাবা হাসেনউদ্দিন, মা তারা বানু।
স্ত্রী নূরজাহান বেগম। তাঁদের এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২২।

১৯৭১ সালে মোজাম্মেল হক কিশোর। সবে দশম শ্রেণীতে উঠেছেন। ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদের নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ নিজের চোখে দেখেন। তারপর শোনেন রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা। এসব ঘটনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গেলেন ভারতে। মেলাঘরের ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার তাঁকে গেরিলাবাহিনীর সদস্য হিসেবে রিক্রুট করে প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে একটি দলের সঙ্গে ঢাকায় পাঠানো হয় এক অপারেশনের জন্য। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন। পথিমধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর অ্যামবুশে পড়ে তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র সব খোয়ান। এরপর তাঁরা ভারতে ফিরে গেলে ক্যাপ্টেন হায়দার জানান, তাঁদের আর কোনো দায়িত্ব দেওয়া হবে না। এ রকম সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও মোজাম্মেল হক তাঁর মনোবল হারাননি। তিনি লেগে থাকেন। এক দিন ক্যাপ্টেন হায়দার তাঁকে বললেন, 'মোনায়েম খান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। সে একজন কুখ্যাত লোক। তুমি কি তার বাড়িতে অপারেশন চালাতে পারবে?'

মোজাম্মেল হকের মুক্তিযোদ্ধা-জীবনে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মোনায়েম খানের বাড়িতে অপারেশনই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্যাপ্টেন হায়দার তাঁকে এ কথা বলামাত্র তিনি রাজি হয়ে যান।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের এক দিন মোজাম্মেল হক তাঁর চাচার সহযোগিতায় মোনায়েম খানের বাড়িতে ঢোকার সুযোগ পান। তাঁর সঙ্গীরা থেকে গেলেন বাইরে। তাঁর চাচা তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন ওই বাড়ির দুই কাজের লোকের সঙ্গে। তাঁরা মোনায়েম খানের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁদের সহযোগিতা সত্ত্বেও তিনি প্রথমবার সফল হলেন না। দুই-তিন দিন পর আবার গেলেন। এবারও ব্যর্থ হলেন। বাড়ির লোকজন ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা টের পেয়ে যাওয়ায় দেয়াল টপকে তিনি পালিয়ে যান। সেদিন কোনোমতে তাঁর জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন। কয়েক দিন পর আবার গেলেন। এবার তাঁর সঙ্গে আছেন শুধু আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক)।

এদিন তাঁরা সফল হলেন। সন্ধ্যার পর তিনি ও আনোয়ার হোসেন মোনায়েম খানের বাড়িতে ঢুকে ড্রয়িংরুমে গিয়ে একসঙ্গে স্টেনগানের গুলি চালান। আনোয়ার হোসেন একটি গ্রেনেডও ছুড়ে মারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটি বিস্ফোরিত হয়নি। এরপর তাঁরা দ্রুত দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এর পরের ঘটনা তো ইতিহাস। মোনায়েম খান নিহত হওয়ার ঘটনা মুক্তিযুদ্ধে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোদাসসের হোসেন খান, বীর প্রতীক

গ্রাম কাজী কসবা, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি-৩৯, সড়ক-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
বাবা তোফাজ্জল হোসেন খান, মা রোকেয়া বেগম।
স্ত্রী সৈয়দ মুস্তারী খান। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪০।

১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট কুড়িগ্রাম জেলার ঘুঘুমারীতে প্রায় দেড় শ মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হলেন। তাঁরা পাঁচটি দলে বিভক্ত। একটি দলের নেতৃত্বে মোদাসসের হোসেন খান। তাঁরা কয়েক মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে উলিপুরের বিভিন্ন স্থানে একযোগে অপারেশন করবেন। এর মধ্যে উলিপুর শহরের অপারেশনটি ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এ কাজের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পড়েছে মোদাসসের হোসেন খানের ওপর। তাঁর দলে রয়েছেন দুই প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা। এক প্লাটুন আক্রমণ করবে রাজাকার ক্যাম্প, অন্যটি ডাকবাংলোয় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের। তিনি নিজে থাকবেন প্রথম দলের সঙ্গে।

তখন বর্ষা। ভরা ব্রহ্মপুত্র উত্তাল। বিকেল পাঁচটার দিকে মোদাসসের হোসেন খান সহযোদ্ধাদের নিয়ে নৌকাযোগে রওনা হলেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে পৌঁছালেন তাঁরা নদীর ওপারে। নৌকা থেকে নেমে অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে দ্রুত অবস্থান নিলেন নির্দিষ্ট স্থানে। প্রথমে তাঁরা রকেট লাঞ্চার থেকে শেল ছুড়লেন। রাতের নিস্তব্ধতার বুক চিরে নিক্ষিপ্ত শেল বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল কয়েক মাইল দূর থেকেও।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তাঁরা সবাই রওনা হলেন ফরওয়ার্ড অ্যাসেম্বলি এরিয়ায়। তখনই ঘটল বিপত্তি। একদল পাকিস্তানি সেনা পথে তাঁদের পেছন থেকে আক্রমণ করল। মোদাসসের হোসেন খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। গোলাগুলির একপর্যায়ে তিনি দেখতে পান, তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গে মাত্র সাত-আটজন রয়েছেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, সবার ধরা পড়ার মতো অবস্থা। সবার অস্ত্রের গুলিও প্রায় শেষ। আছে শুধু হ্যান্ড গ্রেনেড। তিনি হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করতে লাগলেন। হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়তে লাগলেন তাঁর সহযোদ্ধারাও। সেদিন অল্পের জন্য তাঁরা ধরা পড়েননি। এরপর তাঁরা দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে যান। পরে দলের অন্য সদস্যরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

মোদাসসের হোসেন খান ১৯৭১ সালে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে তিনি প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। ২৩ মে তিনি পালিয়ে ভারতে আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টরে এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে। উলিপুর ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ নকশি বিওপি ও ধামাই চা-বাগান আক্রমণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোসলেহউদ্দিন আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম মোসলহাট্টা, আটপাড়া, নেত্রকোনা। বর্তমান ঠিকানা নিউ টাউন, বিলপাড়, নেত্রকোনা। বাবা ছামিরউদ্দিন মাস্টার, মা মেহেরুন নেছা। স্ত্রী মজিদা আহমেদ। খেতাবের সনদ নম্বর ৯৮।

১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষ দিক। নদীতে বৃষ্টির পানির ঢল। বর্ষার পানিতে হাওর-নদী ভরে গেছে। হাওরবেষ্টিত এলাকা সুনামগঞ্জের ধরমপাশা উপজেলা। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকা ১১ নম্বর সেক্টরের রংড়া সাব-সেক্টরের অধীনে ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা জুলাই মাস থেকে কয়েকবার এখানে আক্রমণ চালিয়েও এলাকাটি মুক্ত করতে পারেননি।

মুক্তিবাহিনীর রংড়ার সাব-সেক্টর কমান্ডার ধরমপাশা মুক্ত করার জন্য দায়িত্ব দিলেন মোসলেহউদ্দিন আহমেদকে। ওই সময় সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আরও চারটি দল অবস্থান করছিল। গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সবাই মিলে সম্মুখযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন।

সব মিলিয়ে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রায় ২৫০। অক্টোবরের শেষ দিকের এক দিন। বেলা দুইটা। ধরমপাশা মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মোসলেহউদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা তিন দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালান। সেদিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর একসময় শত্রুপক্ষের দিক থেকে গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের সহযোগী রাজাকারসহ ধরমপাশা থেকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে মোসলেহউদ্দিন সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। ধরমপাশা সেদিন মুক্ত হয়।

ধরমপাশা মুক্ত হওয়ার পর অতি-উৎসাহী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আটপাড়া উপজেলার সুখাইড় ইউনিয়নের দেওশ্রী বাংকারে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন শত্রুপক্ষের গুলিতে শহীদ হন দেওশ্রী গ্রামের যুবক মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল। শত্রুপক্ষের বাংকারের কাছ থেকে মোফাজ্জলের মৃতদেহ উদ্ধার করা ছিল খুবই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। মোসলেহউদ্দিন সেদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মোফাজ্জলের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন।

মোসলেহউদ্দিন ধরমপাশা ছাড়াও নেত্রকোনা জেলার মদন, মোহনগঞ্জ, জয়শ্রীসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় নেত্রকোনা ছিল মহেশখোলা সাব-সেক্টরের অধীনে।

১৯৭১ সালে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে হাবিলদার পদে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মোসলেহউদ্দিন আহমেদ পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোস্তফা কামাল, বীর প্রতীক

গ্রাম চাকুলি, ইউনিয়ন বেতাগা, ফকিরহাট, বাগেরহাট।
বাবা কফিলউদ্দীন শিকারি, মা আমেনা খাতুন।
স্ত্রী লতিফা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৩৭।

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম কাশিপুর। এখানে আছে একটি সেতু। দুপুরের দিকে কয়েকটি গাড়িতে করে শতাধিক পাকিস্তানি সেনা সেখানে হাজির হলো। সেতুর পূর্ব প্রান্তে গাড়ি রেখে তারা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দিকে।

মোস্তফা কামাল ও তাঁর সহযোদ্ধারা ছিলেন সেতুর পূর্ব প্রান্তে। পাকিস্তানি সেনারা সেতু অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিল নিশ্চিত মনে। তারা কল্পনাও করেনি মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি। এ সময় একসঙ্গে গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা হকচকিত ও দিশেহারা। তাদের বেশ কজন নিহত ও আহত হলো। অবশ্য তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। যুদ্ধ চলল কয়েক ঘণ্টা। পাকিস্তানি সেনাদের বেশির ভাগই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। যারা পালাতে পারল না, তারা আত্মগোপন করল।

এরপর মোস্তফা কামাল ও তাঁর সহযোদ্ধারা তাদের খুঁজতে লাগলেন। তিনি ও তাঁর এক সহযোদ্ধা আরব আলী যাচ্ছিলেন পাটখেতের পাশ দিয়ে। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পান ছয় পাকিস্তানি সেনাকে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল তাঁদের অস্ত্র। নিহত হলো তিন পাকিস্তানি সেনা। বাকি তিনজন আত্মগোপন করে একটি বাড়িতে। পরে তাদের লক্ষ্য করে তাঁরা গুলি চালান। এর মধ্যে একজন ছিল লেফটেন্যান্ট পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তা। তিনি মরার ভান করে পড়ে ছিলেন। মোস্তফা কামাল একা তাঁর কাছে যাওয়ামাত্র তিনি উঠে তাঁকে জাপটে ধরেন। দুজনের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। মোস্তফা কামাল শেষ পর্যন্ত ওই পাকিস্তানি লেফটেন্যান্টকে পরাস্ত করেন। ১৯৭১ সালের ২৭ কিংবা ২৮ জুনের ঘটনা এটি। সেদিন কাশিপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ১৫-১৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও অসংখ্য আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সুবেদার মনিরুজ্জামান (বীর বিক্রম) শহীদ হন এবং কয়েকজন আহত হন।

মোস্তফা কামাল ১৯৭১ সালে যশোর ইপিআর সেক্টরের বর্নি বিওপিতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি ভারতে যান। পরে ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরের গোয়ালহাটি-ছুটিপুর, বর্নি, গঙ্গাধরপুর, বেলতাসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে মোস্তফা কামালসহ আরও চারজন গোয়ালহাটি-ছুটিপুরের অগ্রবর্তী প্যাট্রোল পার্টির দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ ও গতিবিধি লক্ষ করতেন। তাঁদের দলনেতা ছিলেন ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (বীরশ্রেষ্ঠ)। এক দিন (৫ সেপ্টেম্বর) হঠাৎ পাকিস্তানি সেনারা তিন দিক থেকে তাঁদের ঘেরাও করে আক্রমণ চালায়। তখন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে দলনেতা নূর মোহাম্মদ শেখ শহীদ হন এবং সহযোদ্ধা নান্নু মিয়া (বীর প্রতীক) আহত হন।

২০০৫ সাল পর্যন্ত মোস্তফা কামাল বিডিআরে চাকরি করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বীর প্রতীক

গ্রাম জানিপুর, খোকসা, কুষ্টিয়া। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি-১০৭, সড়ক-৮, নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা আলতাফুর রহমান, মা আজিরন নেছা। স্ত্রী খুরশিদা আনোয়ার। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পৌঁছে গেলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছাকাছি। তাঁদের আরআর গোলার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেল পাকিস্তানি সেনাদের অনেক বাংকার। সন্ধ্যার মধ্যেই সেখানকার জীবিত পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেল। তাঁদের দখলে এল ছাতকের বিরাট এলাকা। এ ঘটনা ১৪ অক্টোবর ১৯৭১ সালের। সিলেট জেলার অন্তর্গত সুরমা নদীর তীরবর্তী ছাতক গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর। দেশের একমাত্র সিমেন্ট কারখানাও ছিল এখানে। এখানেই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। মুক্তিবাহিনীর ৫ নম্বর সেক্টরের শেলা সাব-সেক্টরের অধীন এলাকা।

ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকার একাংশ দখলে নেওয়ার পর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন জানতে পারলেন, সড়কপথে সিলেট থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন একটি দল সেখানে আসছে। ১৫ অক্টোবর সকালে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তিনটি হেলিকপ্টার দেখতে পান। সেগুলো থেকে তাঁদের অবস্থানের ওপর বিরামহীনভাবে মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হতে থাকে। এতে তাঁর দলের অনেকে আহত হন। কিন্তু তাঁরা অবস্থান ধরে রাখেন। ১৬ অক্টোবর সকালে তাঁরা দেখতে পান, পেছনে উঁচু টিলার ওপরে কিছু পাকিস্তানি সেনা। সকালে সেখানে আবার শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। দিনভর যুদ্ধ চলার পর সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকাটি তাঁদের দখলে আসে। কিন্তু তাঁকে চিন্তিত করে তুলল পেছনে পাকিস্তানি সেনাদের আনাগোনা। ক্রমে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এরা সিলেট থেকে আসা নতুন পাকিস্তানি সেনা। দলটি তাদের চারদিক দিয়ে ঘেরাও করার চেষ্টা করছে। এ খবর পেয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ, পাকিস্তানি সেনাদের পরিকল্পনা সফল হলে তাঁরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়বেন।

তিনি পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পিছিয়ে যাওয়াও তখন তাঁদের জন্য সহজ নয়। তাঁরা কেউই ওই এলাকার পথঘাট চেনেন না। রেকি ও পরিকল্পনা ছাড়াই তাঁরা যুদ্ধ শুরু করেছেন। শেষ পর্যন্ত এ কাজে সহযোগিতা করল স্থানীয় এক রাজাকার। তাঁকে মুক্তিযোদ্ধারা আটক করার পর থেকে সে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছিল। ওখানকার চোরাপথ তার জানা ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা তার সঙ্গে হাওর-বিলের মধ্য দিয়ে কোথাও হাঁটুপানি, কোথাও গলাপানি অতিক্রম করে পেছনে ওয়াপদার বেড়িবাঁধ এলাকায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। এ অপারেশনের খবর তখন বিদেশি সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। ৩০ মার্চ তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। ৮ এপ্রিল বদরগঞ্জে এক যুদ্ধে তিনি আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

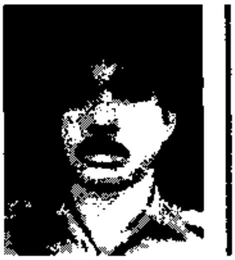

মোহাম্মদ আলী, বীর প্রতীক

মাদ্রাজ, ভারত। বর্তমান নিবাস রসুলপুর (বারিনগর বাজার), যশোর। স্ত্রী ফাতেমা খাতুন। তাঁদের চার মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৮। শহীদ ১৯৭১।

অবাঙালি মোহাম্মদ আলীর পৈতৃক নিবাস ভারতের মাদ্রাজে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর সেখান থেকে তিনি একা পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) আসেন। পরে যোগ দেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, এনসিও-জেসিও এবং সেনারা মেজর জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তখন তিনিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ তাঁর এই আগ্রহে সন্দেহ প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রতিরোধযোদ্ধাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি দলের অধীনে বাঙালিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন।

২৯ মার্চ অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে কালুরঘাটে সমবেত হন। ৩০ মার্চ সেনাদের একাংশ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে রামগড়ে যায়। একাংশ থেকে যায় কালুরঘাটে। বাকি সবাই বান্দরবানের কাছাকাছি অবস্থান নেন। মোহাম্মদ আলী বান্দরবানে ছিলেন। ১১ এপ্রিল কালুরঘাটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কালুরঘাটের পতন হলে সেখানে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারাও মেজর শওকত আলীর (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) নেতৃত্বে বান্দরবানে সমবেত হন। তাঁর দলটি সেখানে মাত্র এক দিন অবস্থান করার পর রামগড়ে চলে যায়। কিন্তু মোহাম্মদ আলীদের দল বান্দরবানেই অবস্থান করতে থাকে। দিন কয়েক পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে। তখন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মোহাম্মদ আলী যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব দেখান। যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনি শহীদ হন। প্রতিরোধযোদ্ধারা সেখানেই তাঁকে সমাহিত করেন। কিন্তু সেই কবর তাঁরা চিহ্নিত করে রাখেননি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মোহাম্মদ আলীর পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেনি, তিনি কী অবস্থায় আছেন। স্বাধীনতার পর জানতে পারে, তিনি শহীদ হয়েছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, তিনি কালুরঘাটে এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা তখন ছোট। স্ত্রীর বাড়িও ছিল মাদ্রাজে। বাংলাদেশে তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। ১৯৭১ সালে তাঁর ছেলেমেয়েসহ স্ত্রী ছিলেন যশোরে। মোহাম্মদ আলী একসময় যশোর সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। সেখানে কর্মরত অবস্থায় রসুলপুরে জায়গা কিনে বাড়ি করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ রবিউল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম বড় ধুশিয়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।
বাবা জাফর আলী, মা দুধবরেন্নেছা। স্ত্রী রাজিয়া বেগম।
তাঁদের ছয় ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৪২।

পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ চলছে। ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাই সকালে মোহাম্মদ রবিউল্লাহ তাঁর কোম্পানির অধিনায়কের কাছাকাছিই ছিলেন। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে অধিনায়ক আহত হন। গুলি লেগে অধিনায়কের হাতে থাকা স্টেনগান ও ওয়্যারলেস ছিটকে পড়ে দূরে। তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। রবিউল্লাহর চোখের সামনেই ঘটে ঘটনাটা। অধিনায়ক তাঁকে বললেন, স্টেনগান ও ওয়্যারলেস উদ্ধার করে পেছনে যেতে। যুদ্ধের ময়দানটা দুই পক্ষের লাশে ভরে গেছে। তিনি গুলি-পাল্টা গুলির মধ্যেই অধিনায়কের স্টেনগান, ওয়্যারলেস ও এক শহীদ সহযোদ্ধার লাশ নিয়ে ক্রল করে পেছনে যাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আহত অধিনায়ককে বাঁচাতে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন। গ্রেনেড হাতে নিয়ে তিনি আবার ছুটলেন সেদিকে। এবার দৌড়েই গেলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন, তাঁর অধিনায়ক সেখানে নেই। ঠিক তখনই রবিউল্লাহ নিজেও গুলিবিদ্ধ হলেন। পড়ে গেলেন মুখ থুবড়ে। বুকে গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিনিটও যায়নি, আরেকটি গুলি লাগল তলপেটের নিচে। তিনি যে স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, সে স্থানটা তাঁর সহযোদ্ধাদের রক্তে আগে থেকেই রঞ্জিত ছিল। তাঁর বুক ও তলপেট থেকে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। তিনি কোনোরকমে উঠে গুলির মধ্যেই পেছনে যেতে থাকলেন। বৃষ্টির মতো গুলি পড়ছে। কিন্তু আর কোনো গুলি লাগল না তাঁর গায়ে। অন্যের সাহায্য ছাড়াই দূরে একটি খেতে পৌঁছালেন তিনি। বুঝতে পারলেন, বেঁচে যাবেন। কিন্তু তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে।

খেতের পানিতে শুয়ে আছেন তিনি। তিন পাকিস্তানি সেনাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তিনি গ্রেনেড হাতে লড়াই করে মরার সংকল্প নিলেন। পাকিস্তানি সেনারা অবশ্য তাঁর কাছে আসেনি। তাঁকে মৃত ভেবে দূর থেকেই চলে যায়। এরপর তিনি উঠে দৌড় দেন। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে গুয়াহাটি হাসপাতালে পাঠান। সেখানে তাঁর চিকিৎসা হয়।

এই যুদ্ধ হয় জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার কামালপুর বিওপিতে। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি ছিল। জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমানের (তিনি কিছুদিনের জন্য ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন) নির্দেশে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেখানে আক্রমণ করে। তাদের সঙ্গে ছিল গণবাহিনীর একদল স্বল্প প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। রবিউল্লাহ ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের ব্রাভো কোম্পানিতে। তাঁর অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন (বীর বিক্রম, পরে মেজর)। ৩০ জুলাই রাতে সেখানে হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যাসল্ট ফরমেশন তৈরিতে দেরি হয়। অন্যদিকে, ভারত থেকে ছোড়া কামানের গোলা ভুলক্রমে তাঁদের ওপরই এসে পড়ে। সব মিলিয়ে কিছুটা বিশৃঙ্খল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থার সৃষ্টি হয়। তার পরও মনের জোর ও অদম্য সাহসে ভর করে তাঁরা সেদিন কামালপুরে আক্রমণ করেন।

মোহাম্মদ রবিউল্লাহ ১৯৭১ সালে যশোর সেনানিবাসে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চের পর তাঁরা আক্রান্ত হন। তখন তাঁরা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যশোরের চৌগাছায় সমবেত হন। সীমান্ত এলাকায় থাকার সময় এপ্রিলের শেষ দিকে বেনাপোলে যুদ্ধ করেন। এরপর তাঁদের ভারতের তেলঢালায় পাঠানো হয়। তিনি পরে সুস্থ হয়ে সিলেট এলাকায় যুদ্ধ করেন।

মোহাম্মদ লোকমান, বীর প্রতীক

গ্রাম ওয়াসেকপুর, ইউনিয়ন অম্বরনগর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। বাবা ইসমাইল হোসেন, মা সামছুন নাহার। স্ত্রী কাওছারা বেগম। তাঁরা নিঃসন্তান। খেতাবের সনদ নম্বর ২১৪। শহীদ ৫ জুন ১৯৭১।

AMARBOI.COM

প্রতিরক্ষা অবস্থানে মোহাম্মদ লোকমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা সতর্ক। যেকোনো সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। রাতে পালা করে তাঁদের কেউ ঘুমালেন, কেউ জেগে থাকলেন। ভোর হতেই শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ চালালেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা বেশ বেপরোয়া। গোলাগুলিতে হতাহত হলো বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তার পরও তারা এগিয়ে আসতে থাকল। মোহাম্মদ লোকমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকলেন। থমকে গেল পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা। প্রচণ্ড গোলাগুলি চলতে থাকল। এ সময় হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মোহাম্মদ লোকমান। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ৫ জুন ছাগলনাইয়ায়।

ছাগলনাইয়া ফেনী জেলার অন্তর্গত থানা (বর্তমানে উপজেলা)। ১৯৭১ সালে ফেনীর বিলোনিয়া এলাকা ২২ জুন পর্যন্ত মুক্ত ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা মুক্ত বিলোনিয়ায় অবস্থান নিয়ে আশপাশের এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করছিলেন। জুনের প্রথমার্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্ত বিলোনিয়া এলাকা দখলের জন্য অভিযান শুরু করে। ৩ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ফেনী থেকে বান্দু-দৌলতপুর রেললাইন ও ছাগলনাইয়া হয়ে উত্তর দিক অভিমুখী লাইন ধরে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম দিন তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। ৪ জুন মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে তাদের প্রথম যুদ্ধ হয়। সেদিন তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে পিছু হটে। পরদিন, অর্থাৎ ৫ জুন তারা অতর্কিতে আবার আক্রমণ শুরু করে। এদিন ছাগলনাইয়ার দিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের দল ছিল বেশ বেপরোয়া। ছাগলনাইয়ায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হতে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের বিপুল বিক্রমে প্রতিরোধ করেন। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তার পরও তারা এগোতে থাকে। তখন ছাগলনাইয়ায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। কয়েক ঘণ্টা চলা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীই জয়ী হয়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে মোহাম্মদ লোকমানসহ তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও কয়েকজন আহত হন। মোহাম্মদ লোকমান একটি বাংকারে ছিলেন। সেখান থেকেই যুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর শরীরে একঝাঁক গুলি লাগে। তিনি শহীদ হন। সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরও ৪০-৫০ জন হতাহত হয়। যুদ্ধ শেষে মোহাম্মদ লোকমানসহ তিনজন শহীদের মরদেহ সমাহিত করা হয় পাঠাননগরে।

মোহাম্মদ লোকমান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিলেট ইপিআর সেক্টরের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টরের অধীনে। শুভপুর, মুন্সিরহাটসহ কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধে সাহসের পরিচয় দেন তিনি।

মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম কৈলাইন, চান্দিনা, কুমিল্লা।
বাবা সাহেবউল্লাহ, মা রাবেয়া খাতুন।
স্ত্রী নাসিমা আক্তার। তাঁদের এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৩। মৃত্যু ২০০৮।

AMARBOI.COM

মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ সকালে নিজেদের প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো সুরক্ষিত করছেন। তখন আনুমানিক বেলা আটটা। এ সময় শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণ। প্রথম গোলা এসে পড়ল তাঁর অবস্থান থেকে ২৫০-৩০০ গজ দূরে। বিরাট আগুনের কুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠে গেল। ভয় না পেয়ে সহযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে থাকলেন। দ্বিতীয় গোলা এসে পড়ল ঠিক তাঁর ১০০ গজ সামনে। এক-দেড় মিনিটের ব্যবধানে তৃতীয় গোলা এসে পড়ল একদম তাঁর কাছাকাছি অবস্থানে। কিছু বোঝার আগেই বাতাসের প্রবল ধাক্কা তাঁকে অনেক ওপরে তুলে দড়াম করে নিচে ফেলে দিল। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বালিয়াডাঙ্গায়।

বালিয়াডাঙ্গা সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার অন্তর্গত। এর পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের সীমান্ত। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সাতক্ষীরা-যশোর এলাকায় ভারত সীমান্ত বরাবর তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান সুদৃঢ় করতে থাকে। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থান দুর্বল করার জন্য আক্রমণের পরিকল্পনা করে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মোহাম্মদ সফিকউল্লাহর নেতৃত্বে এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ১৬ সেপ্টেম্বর সীমান্ত অতিক্রম করে বালিয়াডাঙ্গায় অবস্থান নেন। ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করে। সেদিন সারা দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধারা মোহাম্মদ সফিকউল্লাহর নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পাকিস্তানি সেনারা বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করে। মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ সেসব উপেক্ষা করে সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যান। ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। এদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া গোলার স্প্লিন্টারে মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ আহত হন। আহত হয়েও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাননি। একজন সহযোদ্ধা তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়ার পর ওই অবস্থাতেই ঘণ্টা খানেক তিনি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। এরপর তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। কয়েক ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরলে তিনি আবার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এতে তাঁর সহযোদ্ধারা উদ্দীপ্ত হন।

মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ ১৯৭১ সালে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে বাংলার শিক্ষক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। পরে তিনি ৮ নম্বর সেক্টরের হাকিমপুর সাব-সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁকে ক্যাপ্টেন উপাধি দেওয়া হয়।

মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল পদে থাকাকালে ১৯৯৬ সালে অবসর নেন।

মোহাম্মদ সেলিম, বীর প্রতীক

গ্রাম ক[illegible]র, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।
বাবা [illegible] আলী আকবর, মা নূর বানু। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২০। গেজেটে নাম সলিম।
শহীদ ২৬ নভেম্বর ১৯৭১।

AMARBOI.COM

কিশোরগঞ্জ শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ২ নম্বর সেক্টরে। নভেম্বরে তাঁরা সেক্টর কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে নিজ এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ করার জন্য আসেন লতিফপুর গ্রামে। খায়রুল জাহানের গ্রামের বাড়ি ছিল লতিফপুরে। আর তাঁদের গোপন শিবির ছিল প্যারাভাঙ্গায়। কয়েকটি ছোটখাটো অপারেশনের পর খায়রুল জাহান ও মোহাম্মদ সেলিম দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নেন, ২৬ নভেম্বর সকালে তাঁরা শহরের উপকণ্ঠে রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ করবেন। এদিকে রাজাকারদের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের উপস্থিতির খবর পেয়ে যায় এবং ২৬ নভেম্বর ভোরে একদল পাকিস্তানি সেনা ও বিপুলসংখ্যক রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের চারদিক থেকে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ করেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় ছিলেন অনেক কম। ফলে তাঁদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। এ অবস্থায় সেলিম ও খায়রুল জাহান সহযোদ্ধাদের পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁদের দুজনের কাভারিং ফায়ারের আড়ালে সহযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হলেও তাঁরা দুজন শহীদ হন। সেলিম ধরা পড়ার আগ মুহূর্তে নিজের ওপর নিজেই গ্রেনেড চার্জ করে আত্মাহুতি দেন। রাজাকাররা তাঁর প্রাণহীন দেহ বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে। এতেও তাদের আক্রোশ মেটেনি। সেলিমের ক্ষতবিক্ষত দেহ রাজাকাররা রিকশায় করে সারা শহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরিয়ে জনগণকে দেখিয়ে উল্লাস করে। পরে তাঁর লাশ অজ্ঞাত স্থানে ফেলে দেয় তারা।

মোহাম্মদ সেলিম ১৯৭১ সালে ছিলেন ২০ বছরের যুবক। ১৯৭০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জিডি পাইলট হিসেবে মনোনীত হন। ফেব্রুয়ারিতে চিঠি পান। কিন্তু তিনি পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে আর যোগ দেননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। পরে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরে।

মোহাম্মদ সোলায়মান, বীর প্রতীক

কাপুড়িয়াপট্টি, নাটোর। বর্তমান ঠিকানা দক্ষিণ পটুয়াপাড়া, নাটোর। বাবা আবদুল হাই, মা রহিমা বেগম। স্ত্রী মাজেদা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯২।

AMARBOI.COM

মোহাম্মদ সোলায়মান ১৯৭১ সালে নীলফামারী জেলার (তখন রংপুর জেলার অন্তর্গত মহকুমা) কোতোয়ালি থানায় কর্মরত ছিলেন। সে সময় তিনি টগবগে যুবক। মাত্র এক বছর আগে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক দিন পর থানা থেকে একটি অস্ত্রসহ পালিয়ে এসে যোগ দেন স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের দলে। এ সময় ঠাকুরগাঁও থেকে ইপিআরের একদল সদস্যও পালিয়ে এসে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। ফলে তাঁদের মনোবল আরও বেড়ে যায়।

৭ এপ্রিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাংক, কামান, মেশিনগান ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর আক্রমণ করে। তখন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারী অস্ত্রশস্ত্র মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে তাঁদের প্রতিরোধ। তখন তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যান বিভিন্ন দিকে। মোহাম্মদ সোলায়মান একটি দলের সঙ্গে চলে যান পঞ্চগড় এলাকায়। সেখানে একদিন একজন মহিলা এসে তাঁদের খবর দিলেন যে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের বাংকারের দিকে আসছে। খবরটি সত্যি কি না, সেটি পরখ করার জন্য মোহাম্মদ সোলায়মান বাংকার থেকে উঠে এলেন এবং সামনে একটু এগোতেই একদল পাকিস্তানি সেনাকে দেখতে পেলেন। তারা তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। তিনি দ্রুত একটি গাছের আড়ালে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে তাঁর এলএমজি থেকে ব্রাশফায়ার শুরু করেন। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলির শব্দ শুনে বাংকারে থাকা তাঁর সহযোদ্ধারাও শুরু করেন গুলিবর্ষণ। এতে বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। এ খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তী জগদলহাটে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারাও সেখানে ছুটে আসে। দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। সারা রাত চলে সেই যুদ্ধ। ভোরের আলো তখন সবে ফুটতে শুরু করেছে, এ সময় এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে মোহাম্মদ সোলায়মানের হাতে ও তাঁর এলএমজিতে। তিনি আহত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হন। এ যুদ্ধে মোহাম্মদ সোলায়মান যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। হাসপাতালে প্রায় এক মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর আবার তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। পরে নভেম্বরে জগদলহাটে রেকি করার সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আক্রমণ করে। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। পরে সেখানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সকিমউদ্দীনসহ তাঁর দুই সহযোদ্ধা শহীদ ও কয়েকজন আহত হন।

স্বাধীনতার পর তিনি দিনাজপুর শহরের মহারাজা স্কুল ক্যাম্পে ছিলেন। যুদ্ধের সময় উদ্ধার করা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ ওই ক্যাম্পে মজুদ করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সেখানে আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। সে সময় মোহাম্মদ সোলায়মান ক্যাম্পের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। তবে এ দুর্ঘটনায় কয়েক শ মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারান। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন, তিনিও এতে মারা গেছেন। পরে এ ঘটনার স্মরণে একটি শহীদ মিনার নির্মিত হয়। তাতে শহীদদের নাম খোদাই করা হয়েছিল। ওই তালিকায় দীর্ঘদিন তাঁর নামও ছিল। পরে অবশ্য তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়।

মোহাম্মদ হোসেন, বীর প্রতীক

AMARBOI.COM

গ্রাম পশ্চিম ধলই (শফিনগর), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
বাবা আহমদ মিয়া, মা তমবিয়া খাতুন। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩০০। শহীদ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

নিকষ অন্ধকার রাতে নিজেদের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন মোহাম্মদ হোসেন, ফরিদসহ ১১ জন নৌ-কমান্ডো। বিভিন্ন পথ দিয়ে গেলেন কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পারে জলদিয়া বাতিঘরে। নেমে পড়লেন সমুদ্রে। তখন সবে ভাটা শুরু হয়েছে। অদূরে ভেসে আছে অনেক জাহাজ। ১১ জন একে অন্যের হাত ধরে চিৎসাঁতার দিয়ে যেতে থাকেন লক্ষ্যস্থলের দিকে। এভাবে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলেন। প্রত্যেকের পায়ের ফিনস ওঠানামা করছে। এভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা বা তার বেশি সময় পেরিয়ে গেল। এদিকে তখন শুরু হয়েছে জোয়ারের পালা। জোরে ফিনস চালিয়েও আর সামনে যাওয়া যাচ্ছে না। নৌ-কমান্ডোরা মাথা তুললেন। তখন তাঁদের সংবিৎ ফিরল। দেখলেন, দূরত্ব কমেনি একটুও। ভয়ংকর হয়ে উঠছে সমুদ্র। ক্রমেই বাতাসের বেগ বাড়ছে, তুঙ্গে উঠছে ঢেউয়ের গর্জন। হালকা ছোট ঢেউ বিশাল বিশাল ঢেউয়ে রূপ নিচ্ছে। পাহাড়সমান উঁচু ঢেউ শোঁ শোঁ শব্দে গভীর সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসছে। শত চেষ্টা করেও ভেসে থাকা যাচ্ছে না। উত্তাল তরঙ্গ তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে পানির অতল গভীরে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন একে অন্যের কাছ থেকে। সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করছেন তীরে পৌঁছার। কিন্তু ব্যর্থ হলো তাঁদের সেই চেষ্টা। হারিয়ে গেলেন অতল পানির গর্ভে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের। ঘটেছিল চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে। নৌ-কমান্ডোদের দলনেতা ফারুক-ই-আজম সিদ্ধান্ত নেন বহির্নোঙরে অপারেশনের। তখন সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষমাণ ছিল বেশ কয়েকটি জাহাজ। জোয়ার-ভাটার সময়কেই অপারেশন চালানোর সময় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু এ অভিযানের জন্য রেকি করতে গিয়ে একটা বিরাট ভুল করেন কমান্ডোরা। ভুলটি ঘটে নিজেদের অজ্ঞাতেই। সেটা হলো দূরত্বের হিসাব। তাঁরা আন্দাজ করেছিলেন, ওই দূরত্ব তিন কিলোমিটারের বেশি হবে না। বাস্তবে সে দূরত্ব ছিল চার-পাঁচ গুণ। জলপথের দূরত্ব পরিমাপে তাঁরা কেউ অভিজ্ঞ ছিলেন না। আরেকটি ভুল তাঁরা করেন। ভাটার সময় টার্গেটের কাছে তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল নৌকায় চেপে। কিন্তু নৌকা না পেয়ে তাঁরা সাঁতরে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত এক করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে ওই অপারেশনের সমাপ্তি ঘটে। পানিতে ডুবে যাওয়ার পর তাঁরা জীবন্মৃত অবস্থায় তীরে পৌঁছান। মোহাম্মদ হোসেনসহ চারজন নদীর পশ্চিম মোহনায় মেরিন একাডেমি জেটির কাছে তীরে ভেসে ওঠেন অজ্ঞান অবস্থায়। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ধরে নিয়ে যায়। জ্ঞান ফেরার পর পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ ও পাশবিক নির্যাতন করে। নির্মম নির্যাতনে মোহাম্মদ হোসেন শহীদ হন। বাকি তিনজন অবশ্য বেঁচে যান। জনশ্রুতি আছে, পায়ে ফিনস ও পেটে মাইন বাঁধা অবস্থায় পাওয়ার কারণেই পাকিস্তানি সেনারা মোহাম্মদ হোসেনের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। বিরামহীন নির্যাতনের একপর্যায়ে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নেওয়া হয় একটা নর্দমার ম্যানহোলের কাছে। ম্যানহোলের মধ্যে মাথা নিচু করে কোমর পর্যন্ত ঢুকিয়ে হেঁচকা টান দেওয়া হয়। এতে তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনপ্রদীপও নিভে যায়।

মোহাম্মদ হোসেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের চেইনম্যান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। তারপর ভারতে চলে যান। সেখানে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মোহাম্মদ হোসেনের ডাকনাম ফরিদ। এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

AMARBOI.COM

রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম ভাটপিয়ারি, সদর, সিরাজগঞ্জ।
বাবা ফরহাদ হোসেন ভূঁইয়া, মা রওশন আরা খাতুন।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১।
১৯৮১ সালে জিয়া হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

সন্ধ্যা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। একটি দলে আছেন রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া। রাতের অন্ধকারে তাঁরা ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে এসেছেন। মধ্যরাতের আগেই পৌঁছেছেন দত্ত নগরে। সেখানে আছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি।

দত্তনগর কৃষি খামার চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার অন্তর্গত। এটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা। এখানে ছিল সরকারি কৃষি খামার। এই কৃষি খামার বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শক্তিশালী একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপন করে। এ ঘাঁটিতে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা সহযোগী রাজাকারদের নিয়ে সীমান্ত এলাকায় টহল দিত। নভেম্বরের প্রথম দিক থেকে মুক্তিবাহিনী সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর একের পর এক আক্রমণ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল সীমান্ত এলাকা থেকে পাকিস্তানি সেনাদের বিতাড়ন করা। তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিবাহিনীর ৮ নম্বর সেক্টরের বানপুর সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ১৭ নভেম্বর ভোরে দত্তনগর কৃষি খামারের ওপর আক্রমণ চালান। মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন তিনটি দলে (তিন কোম্পানি) বিভক্ত। একটি দল তেঁতুলিয়া, দ্বিতীয় দল নারায়ণপুর ও তৃতীয় দল হাসনাবাদের দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দত্তনগর কৃষি খামারের ক্যাম্পে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। ত্রিমুখী আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া সাহস ও রণকৌশল দেখান। দু-তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনাদের প্রবল প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। তখন তারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। নিজ এলাকায় প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। সেখানে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে পাঠানো হয় উচ্চতর প্রশিক্ষণে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরের মানকারচর সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন তিনি। কোদালকাটির যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট রণনৈপুণ্য দেখান। অক্টোবরে ৮ নম্বর সেক্টরের অধীন বানপুর সাব-সেক্টরে যোগ দেন। নভেম্বরের শেষ দিকে তাঁকে দ্বিতীয় বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওয়ার কোর্সের প্রশিক্ষণ চলা অবস্থায় দেশ স্বাধীন হয়।

রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

AMARBOI.COM

রত্তন আলী শরীফ, বীর প্রতীক

নতুন হাট, গ্রাম রাকুদিয়া, ইউনিয়ন দেহেরগতি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল। বাবা নূর মোহাম্মদ শরীফ, মা কদবানু। স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯১। গেজেটে নাম রতন শরীফ।

মধ্যরাতে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছেন একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের নেতৃত্বে রত্তন আলী শরীফ। তাঁরা যাচ্ছেন পাকিস্তানি সেনাদের একটি ক্যাম্প আক্রমণ করতে। ভোর হওয়ার আগেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন পাকিস্তানি সেনাদের ওই ক্যাম্পের কাছে। মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় প্রায় ১০০। তাঁদের সবার হাতে অস্ত্র নেই। ৭০ জন সশস্ত্র যোদ্ধা। বাদবাকি সবাই তাঁদের সহযোগী।

রত্তন আলী শরীফ ও তাঁর সহযোদ্ধারা ক্যাম্পের কাছে দ্রুত পৌঁছে গেলেন। সূর্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো ফোটার আগেই প্রথমে গর্জে উঠল তাঁর অস্ত্র। তিনি গুলি করামাত্র অন্যদের অস্ত্রও একসঙ্গে গর্জে উঠল। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা গুলি চালাল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মুখে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ল। দিশেহারা পাকিস্তানি সেনারা যুদ্ধে টিকতে না পেরে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করল।

এদিকে বেলা যত বাড়তে থাকল, স্থানীয় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দা, কুড়াল, খন্তা নিয়ে যোগ দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচারে গ্রামবাসী ছিলেন অতিষ্ঠ। তাই তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের খুঁজে বের করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করলেন। পাকিস্তানি সেনারা পার্শ্ববর্তী খালের পানিতে নেমে কচুরিপানার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। গ্রামবাসী তাদের এক এক করে খুঁজে বের করলেন। মুক্তিযোদ্ধারা পরে এসব পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেন। এর আগে গ্রামবাসী দা, খন্তা, কুড়াল, কোদাল ইত্যাদি দিয়ে তাদের জখম করে।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে এ ঘটনা ঘটেছিল বরিশাল জেলার সন্ধ্যা নদীর পূর্ব পারের দোয়ারিকায়। এর আগে আগস্টের শেষে রত্তন আলী শরীফ পার্শ্ববর্তী নতুন হাট এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি ক্যাম্পে আক্রমণ চালান। সেখানে ৩৫ জন বিহারি রাজাকার ও বাঙালি পুলিশ তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

রত্তন আলী শরীফ ১৯৭১ সালে করাচিতে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মার্চের মাঝামাঝি ছুটি নিয়ে তিনি দেশে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয়ভাবে একটি দল গঠন করে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধের পর তিনি প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেন জুলাইয়ের শেষে, সুগন্ধা নদীর পশ্চিম পারে। শেষ যুদ্ধ করেন ৩ ডিসেম্বর। সেদিন বরিশালের গৌরনদী থেকে একদল পাকিস্তানি সেনা বরিশালের দিকে যাচ্ছিল। তিনি তাদের ওপর আক্রমণ চালান। সকাল সাতটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। সেদিন তাঁর দুই সহযোদ্ধা আবুল হোসেন (ইপিআর সদস্য) ও আবুল বাশার (গণবাহিনীর সদস্য) শহীদ হন। তিনি নিজেও আহত হন। তাঁর হাত ও পায়ে গুলি লাগে।

AMARBOI.COM

রফিকুল আহসান, বীর প্রতীক

গ্রাম ও ইউনিয়ন দুর্গাপাশা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
বাবা আসমত আলী, মা রাবেয়া খাতুন।
স্ত্রী পারভীন আহসান। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮৬। মৃত্যু ১৯৯২।

থানার চারদিকে অস্ত্র হাতে অবস্থান নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল। একটি দলে আছেন রফিকুল আহসান। তাঁদের সবার নেতৃত্বে সাব-সেক্টর কমান্ডার শাহজাহান ওমর। মুক্তিযোদ্ধাদের এবার যুদ্ধ করতে হলো একদল বাঙালির বিরুদ্ধেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের। ঘটেছিল বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায়। বাকেরগঞ্জ ছিল ৯ নম্বর সেক্টরের অধীন একটি এলাকা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের কখনো কখনো যুদ্ধ করতে হয়েছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে। তখন মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। সে সময় বাকেরগঞ্জে পাকিস্তানি সেনারা ছিল না। থানায় ছিল তাদের সহযোগী একদল বাঙালি রাজাকার ও পুলিশ। সংখ্যায় ছিল তারা ৩০০ থেকে ৪০০ জন। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মালেক। তাঁর ধারণা, এ দেশ কোনো দিন স্বাধীন হবে না।

৩ ডিসেম্বর গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা ওই থানা ঘেরাও করে পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী রাজাকার ও পুলিশকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। কিন্তু বাঙালি ওসি মালেক তা প্রত্যাখ্যান করেন। সকালে শুরু হয় যুদ্ধ। কয়েক দিন চলে সেই যুদ্ধ। ৭ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ চালান। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করে। মুক্ত হয় বাকেরগঞ্জ থানা। এ যুদ্ধে রফিকুল আহসান যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এই সাহসী যোদ্ধা মায়ের অনুপ্রেরণায় বাবার বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। বাকেরগঞ্জের নাসির বাহিনীর সঙ্গে থেকে পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটি, লঞ্চ ও গানবোটে আক্রমণ পরিচালনায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালিশুরী যুদ্ধ, বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপাশা ইউনিয়নে নদীপথে পাকিস্তানি সেনাবাহী লঞ্চে আক্রমণ, শ্যামপুর এবং ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার চাচৈর যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

রফিকুল আহসানের ডাকনাম বাদশা। সবার কাছে তিনি রফিকুল আহসান বাদশা নামেই পরিচিত।

রফিকুল আহসান জানতে পারেননি, তিনি বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছেন। ১৯৯২ সালে সরকার খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে শুরু করলে তাঁর খেতাব পাওয়ার কথা জানা যায়।

AMARBOI.COM

রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম কংশী, উজিরপুর, বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা গণকটুলি, আজিমপুর, ঢাকা। বাবা আবদুর রশিদ খান, মা রাজিয়া বেগম। স্ত্রী শিউলী ইসলাম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮৮।

'স্বাধীনতার এত বছর পর মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে এই প্রথম কেউ আমার বাড়িতে এল। খুব ভালো লাগছে। আমার প্রাণে আবার শক্তি সঞ্চারিত হলো। আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম মায়ের প্রেরণায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে মা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন বললেন, "রফিকুল, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে বীরের মতো বেঁচে থাকা ভালো। তুই যুদ্ধে চলে যা। দেশকে শত্রুমুক্ত কর।" মা আমাকে উৎসর্গ করেন দেশের জন্য। এরপর আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চলে যাই ভারতে। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৮-১৯।' রফিকুল ইসলাম আবেগঘন কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

রফিকুল ইসলাম ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ৯ নম্বর সেক্টরের টাকি সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন। প্রথম অপারেশনে অংশ নেন আগস্টের শেষ দিকে। আগস্টের ২০ তারিখে টাকি থেকে তিনিসহ ১২০ জন মুক্তিযোদ্ধা বরিশালের উজিরপুরের হাবিবপুরে এসে ক্যাম্প করেন। চার-পাঁচ দিন পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল পার্শ্ববর্তী হাটতারা বাজারে আসে। স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় তারা বাজার ও পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে নির্বিচারে লুটতরাজ করতে থাকে। খবর পেয়ে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দল ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের এই আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তাঁদের আকস্মিক এ আক্রমণে ছয়জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার আহত হয়। তাঁরা মর্টারগান দিয়ে গোলাবর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা লঞ্চযোগে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে রফিকুল ইসলাম যথেষ্ট সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

এরপর রফিকুল ইসলাম বাবুগঞ্জ থানা অপারেশনে অংশ নেন। তখন তাঁদের দলের অবস্থান ছিল স্বরূপকাঠি থানার বিন্নাকাঠিতে। সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের প্রথম দিকে এক দিন তাঁরা রাতের অন্ধকারে বিন্নাকাঠি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বাবুগঞ্জে গিয়ে সেখানকার থানায় আক্রমণ চালান। বাবুগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারাও এ যুদ্ধে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। সেখানে নানা কৌশলে তাঁরা যুদ্ধ করেন। সম্মুখযুদ্ধে তাঁদের ১৭ জন আহত হন। প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েও বাবুগঞ্জ তাঁরা মুক্ত করতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনারা তাদের বাবুগঞ্জের অবস্থান ধরে রাখে। পরে এখানে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে তাঁদের আরেকটি বড় যুদ্ধ হয়। এরপর তারা বানারীপাড়া ও উজিরপুর থেকে পশ্চাদপসরণ করে বাবুগঞ্জে গিয়ে অবস্থান নেয়। ফলে বাবুগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাবুগঞ্জের যুদ্ধে রফিকুল ইসলামদের দলের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর আরও কয়েকটি দল অংশ নেয়। তাঁদের প্রচণ্ড আক্রমণের জবাবে পাকিস্তানি সেনারাও গোলাগুলির মাধ্যমে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাবুগঞ্জে যুদ্ধ চলে কয়েক দিন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিবাহিনীর কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হয়। রফিকুল ইসলাম আরও কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। এর মধ্যে বড়কোটা গ্রাম, স্বরূপকাঠির বিন্না ও বরিশাল শহরের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম হুগলিয়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
বাবা নূর মিয়া, মা গুলবানু।
স্ত্রী আসমা খানম। তাঁদের চার মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫২।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম কয়েক বছর ধরে অসুস্থ। অসুস্থতার কারণে এখন স্মৃতিশক্তি ও মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীরে আমরার কথা কইওবায়নি (প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের কথা বলবেন কি)?'

রফিকুল ইসলাম ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকায়। বিলোনিয়ার যুদ্ধে আহত হন। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া শেলের টুকরা আঘাত করে তাঁর পায়ের গোড়ালি ও হাঁটুতে। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে আবার যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। এর কদিন পরই দেশ স্বাধীন হয়।

বিলোনিয়া ফেনীর অন্তর্গত। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান। ২ নভেম্বর থেকে বিলোনিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। সেদিন মধ্যরাতে মুক্তিযোদ্ধারা রাজনগর থেকে বিলোনিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন। ৩ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ টের পায়নি। এ সময় এক স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা টহলে বের হওয়া কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাকে প্রথম আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ওই টহল দলের সব পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। সারা দিন চলে সেই যুদ্ধ। ৪ নভেম্বরও তা থেমে থেমে চলে। এদিন বিকেলে পাকিস্তানি চারটি জঙ্গি বিমান মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে বোমাবর্ষণ করে। পরদিন থেকে টানা যুদ্ধ চলে। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অবস্থানে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। পরে সরাসরি আক্রমণও শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। শেষ পর্যন্ত ১০ নভেম্বর বিলোনিয়ার বেশির ভাগ এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে ফেনীর কাছাকাছি অবস্থান নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

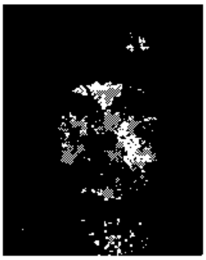

রশিদ আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম সাইজগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
বাবা মনসুর আলী, মা করিমুন নেছা।
স্ত্রী হাওয়ারুন নেছা। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২২৪। শহীদ আগস্ট ১৯৭১।

রশিদ আলী মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন—এ কথা অনেক দিন তাঁর মা-বাবা, স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন জানতেন না। তাঁরা জানতেন, তিনি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছেন। তারপর দেশ স্বাধীন হলো। তাঁরা সবাই রশিদের প্রতীক্ষায়। ১৪ দিন পর জানতে পারেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু এ খবর কেউ, বিশেষত তাঁর স্ত্রী বিশ্বাস করেননি। তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন একই এলাকার আমির হোসেন। তাঁরা দুজন একসঙ্গে ইপিআরে চাকরি করতেন। যুদ্ধও করেন একসঙ্গে। আমির হোসেনের কাছে শোনার পর তাঁরা বিশ্বাস করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে জীবননগর উপজেলা। এর পাশে ধোপাখালী বিওপি দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানটির কারণে মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে বাংলাদেশের ভেতরে এসে গেরিলা অপারেশন করতে পারছিলেন না। ফলে ওই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা অপারেশন স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পাকিস্তানি সেনাদের সেখান থেকে বিতাড়ন বা তাদের পরিধি সীমিত করার জন্য নিয়মিত মুক্তিবাহিনী সেখানে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫ আগস্ট বানপুর সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন এম মুস্তাফিজুর রহমানের (বীর বিক্রম, পরে জেনারেল ও সেনাপ্রধান) নেতৃত্বে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি দল সেখানে আক্রমণ করে। দলটির বেশির ভাগই ইপিআর সদস্য। তাদের মধ্যে ছিলেন রশিদ আলী। সঙ্গে গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারাও ছিলেন। তাঁদের এই সম্মিলিত বাহিনী ধোপাখালী বিওপির কাছাকাছি পজিশন নিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার হাতে ছিল পুরোনো থ্রি নট থ্রি রাইফেল। মাত্র কয়েকজনের কাছে ছিল আধুনিক অস্ত্র। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের অনর্গল গুলিবর্ষণের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের মাথা তোলাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। রশিদ আলীসহ কয়েকজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এ অবস্থার মধ্যেও যুদ্ধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে হঠাৎ মেশিনগানের গুলি এসে লাগে রশিদ আলীর শরীরে। তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। সেদিন এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর রশিদ আলী, আবদুল গফুর (নোয়াখালী), আবু বাকের (যশোর), সিদ্দিক আলী ও আবদুল আজিজ (ঢাকা) শহীদ এবং চারজন গুরুতর আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা রশিদ আলীসহ চারজনের মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হন। পরে তাঁদের সমাহিত করা হয় বাংলাদেশের মাটিতেই।

রশিদ আলী ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ৪ নম্বর উইংয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর ইউনিটের সঙ্গে যোগ দেন যুদ্ধে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন যশোরের বেনাপোল এলাকায় ও পরে বানপুর সাব-সেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

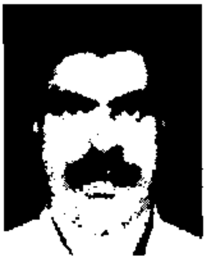

রাসিব আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম বাদে দেউলি, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
বাবা হোসেন আলী, মা খুরশেদা বিবি।
স্ত্রী ময়নু বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬২। মৃত্যু ১৯৯৬।

লাতু মৌলভীবাজারের বড়লেখা থানার শাহবাজপুরের অন্তর্গত। এখানে ছিল একটি রেলস্টেশন। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী একটি ঘাঁটি। বড়পুঞ্জি সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আবদুর রবের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি দল ১০ আগস্ট লাতুতে আক্রমণ করে। এই দলে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা রাসিব আলী।

রাসিব আলী এখন বেঁচে নেই। তাঁর সহযোদ্ধা ও ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা আজমল আলী এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'তখন আগস্ট মাস। বর্ষা মৌসুম। প্রতিদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। এক দিন ক্যাপ্টেন আবদুর রবের নেতৃত্বে আমরা শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা বড়পুঞ্জি ক্যাম্প থেকে যাই পাকিস্তানি সেনাদের লাতু ক্যাম্প আক্রমণ করতে। আমরা কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিলাম। রাসিব ভাই একটি দলের নেতৃত্বে। তাঁর ছিলাম আমি। পরিকল্পনামতো বিকেলে শুরু হয় আক্রমণ। বৃষ্টির মধ্যেই আমরা চলে যাই পাকিস্তানি ক্যাম্পের একদম কাছে। আমাদের আক্রমণে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদেরও কয়েকজন শহীদ হন। এ সময় খবর আসে, পাকিস্তানি সেনাদের নতুন একটি দল আমাদের আক্রমণ করার জন্য সেখানে এসেছে। তখন অধিনায়ক আমাদের পেছনে যেতে বলেন। আমরা গুলি করতে করতে পেছনে যেতে থাকি। পাকিস্তানি সেনারা আমাদের ধাওয়া করে। তখন রাসিব ভাই কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ নর্দমায় পড়ে যান।'

রাসিব আলী ও সহযোদ্ধারা ওই নর্দমা থেকে আর ওপরে উঠতে পারছিলেন না। এদিকে একটু দূরেই ছিল পাকিস্তানি সেনারা। ওই অবস্থাতেই রাসিব আলী ব্রাশফায়ার করেন পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে। এতে নিহত হয় পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা। বাকি সেনারা তখন পালিয়ে যায়। এরপর অনেক কষ্টে ওই নর্দমা থেকে তাঁরা উঠে নিরাপদে ক্যাম্পে ফিরতে সক্ষম হন।

১০ আগস্ট সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে লাতু রেলস্টেশন থেকে পাকিস্তানি সেনাদের বড় একটি অংশ পালিয়ে যায়। বাকিরা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের বেশির ভাগই হতাহত হয়ে অবস্থান ত্যাগ করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি ক্যাম্পে উড্ডীন পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা উত্তোলন করেন। ঠিক তখনই খবর আসে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন একটি দল তাঁদের আক্রমণ করার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে। সম্ভাব্য এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের যে দলের (কাট অফ পার্টি) ওপর দায়িত্ব ছিল, তাঁরা তা করতে ব্যর্থ হন। অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনারা লাতুতে ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে। এ অবস্থায় ক্যাপ্টেন আবদুর রব সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিবাহিনীর কুতুবউদ্দিন, মান্নান, ফয়েজসহ ছয়জন শহীদ ও পাঁচজন আহত হন।

রাসিব আলী চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে তিনিসহ অনেক বাঙালি ইপিআর সদস্য কর্মরত ছিলেন ঢাকার গভর্নর হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন)। ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্টের একটি দল তাঁদের ঘেরাও করে অস্ত্র জমা দিতে বলে। কিন্তু তাঁরা অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকার করেন। পরে বাঙালি সুবেদারের নির্দেশে তাঁরা অস্ত্র জমা দেন। ২৭ মার্চ কারফিউ শিথিল হলে বেশির ভাগ বাঙালি ইপিআর সদস্য গভর্নর হাউস থেকে পালিয়ে যান। রাসিব আলীও পালাতে সক্ষম হন। বাড়ি ফিরে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধ করেন মুক্তিবাহিনীর ৪ নম্বর সেক্টরের বড়পুঞ্জি সাব-সেক্টর এলাকায়। কানাইঘাট থানা আক্রমণে তিনি আহত হন।

রুহুল আমিন, বীর প্রতীক

গ্রাম মঙ্গলকান্দি, সোনাগাজী, ফেনী।
বাবা আবদুল জব্বার, মা ফুলবিয়া।
স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৮৭।

সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজ। কলেজের উত্তর দিকে বেশ কয়েকটি টিলা। ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর। শীতকালের সকাল। তখন ওই টিলাগুলোর ওপর এলেন একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা ও গণবাহিনীর সদস্য। রুহুল আমিন এ বাহিনীরই একজন হাবিলদার।

মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে ৫০০ গজ দূরেই পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের পোশাক, মাথায় পরা স্টিলের হেলমেট, অস্ত্রশস্ত্র দেখতে হুবহু পাকিস্তানি সেনাদের মতো ছিল। ফলে পাকিস্তানি সেনারা চিন্তাই করতে পারেনি যে তাঁরা মুক্তিবাহিনীর সদস্য।

পাকিস্তানি সেনাদের চোখের সামনেই মুক্তিযোদ্ধারা পরিখা খুঁড়ে পজিশন নিতে থাকেন। হঠাৎ মুক্তিবাহিনীর ডেলটা কোম্পানির অবস্থানের সামনের রাস্তায় পাকিস্তানি বাহিনীর দুটি জিপের কনভয় আসে। মুক্তিযোদ্ধারা জিপ দুটির ওপর আক্রমণ চালান। এতে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ।

দুপুরে পাকিস্তানি সেনারা মরিয়া হয়ে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুক্তিবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। লড়াইয়ের একপর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর মর্টারের গোলা শেষ হয়ে যায়। তখন রুহুল আমিনসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে হালকা মেশিনগান ও রাইফেল দিয়েই দৃঢ়তার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করেন। তাঁদের সাহস, মনোবল, বীরত্ব ও রণকৌশলের কাছে পাকিস্তানি বাহিনী

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়। সেদিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৮০ জন নিহত ও অসংখ্য আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর ২০ জন শহীদ ও ২১-২২ জন আহত হন। রুহুল আমিনও এ যুদ্ধে আহত হন।

শুধু এখানেই নয়, রুহুল আমিন সিলেট এমসি কলেজ, আটগ্রাম, ৩০-৩১ জুলাই জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার কামালপুরে সংঘটিত যুদ্ধের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। কামালপুরের প্রচণ্ড যুদ্ধেও তিনি সামনের সারির সেনা ছিলেন।

রুহুল আমিন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার ছিলেন। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। মার্চের শুরু থেকে তাদের কিছুসংখ্যক সেনা শীতকালীন প্রশিক্ষণে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা ২৯ মার্চ গভীর রাতে সেনানিবাসে ফিরে আসেন এবং এর এক দিন পর, অর্থাৎ ৩০ মার্চ বিদ্রোহ করেন। পরে তাঁরা চৌগাছায় সমবেত হন। ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে এরপর যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে।

রেজাউল করিম মানিক, বীর প্রতীক

পৈতৃক নিবাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। বর্তমান ঠিকানা হাসনাবাদ কলোনি, [illegible]বাজার, ঢাকা।
বাবা মো. ওয়াজেদ আলী, মা রাজিয়া বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২৪। গেজেটে নাম মানিক।
শহীদ ১৪ নভেম্বর ১৯৭১।

AMARBOI.COM

সকাল থেকেই গোপন আস্তানায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উত্তেজনা। সবাই নিজেদের অস্ত্র পরীক্ষা শেষে প্রয়োজনীয় গুলি গুছিয়ে রাখলেন। বিস্ফোরক দ্রব্য সব ঠিকমতো আছে কি না, তা-ও পরখ করে দেখলেন। সন্ধ্যার পর তাঁরা যাবেন একটি সেতু ধ্বংস করতে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আছেন রেজাউল করিম মানিক, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু (নাট্য পরিচালক), মিলন, শফিউল, ওমর, হামিম, ইফু, তৌফিকসহ কয়েকজন। তাঁরা সবাই ২ নম্বর সেক্টরের ঢাকা (উত্তর) গেরিলাদলের সদস্য।

দুপুরে রেজাউল করিম মানিকসহ সবাই একসঙ্গে ভাত খেলেন। এরপর কিছু সময় বিশ্রাম নিলেন। কোনো অপারেশনে যাওয়ার আগে ঘুমিয়ে নেওয়া তাঁদের জন্য একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার। কিন্তু রেজাউল করিম মানিকের জন্য ওই ঘুম ও খাবারই ছিল শেষ ঘুম ও শেষ খাবার। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৪ নভেম্বরের।

সন্ধ্যার পর মুক্তিযোদ্ধারা রওনা হলেন। তাঁদের লক্ষ্য, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাই থানার অন্তর্গত ভায়াডুবি সড়কসেতু। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এই সেতু ধ্বংস করা খুবই জরুরি। ২ নম্বর সেক্টর থেকে নির্দেশ এসেছে ওই সেতু ধ্বংস করার। কারণ, এ সড়ক দিয়েই দেশের উত্তর-দক্ষিণের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ।

রাতের অন্ধকারে রেজাউল করিম মানিকসহ অন্য গেরিলাযোদ্ধারা নিঃশব্দে পৌঁছালেন সেখানে। তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত বাহিনীর কয়েকজনও আছেন। সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে সার্বক্ষণিক পাহারায় আছে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা। অতর্কিতে তাঁরা আক্রমণ করলেন সেখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনাদের দিক থেকে প্রতিরোধ স্তিমিত হয়ে যায়। দু-তিনজন নিহত হওয়ার পর তাদের বাকি সবাই পালিয়ে যায়। এরপর গেরিলাযোদ্ধারা সেতু ধ্বংস করার কাজ শুরু করেন। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের একটি কনভয় সেখানে এসে তাঁদের আক্রমণ করে। ফলে চোখের পলকে দুই পক্ষে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। এর মধ্যেই রেজাউল করিম মানিকসহ কয়েকজন সেতুটি ধ্বংস করার কাজ সম্পন্ন করেন। পরে রেজাউল করিম মানিকও যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁরা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। তখন রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টা। বীরের মতো লড়ছিলেন রেজাউল করিম মানিক। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া মর্টারের তপ্ত স্প্লিন্টার এসে আঘাত করে তাঁর গায়ে। কুঁকড়ে যায় তাঁর শরীর। শহীদ হন তিনি। তাঁর সেদিনের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। পাকিস্তানি সেনাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন তাঁর সহযোদ্ধারা।

রেজাউল করিম মানিককে সমাহিত করা হয় ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে। সহযোদ্ধারা তাঁর লাশ উদ্ধার করে প্রথমে তাঁদের নিজেদের জিম্মায় নিয়ে যান। পরে তাঁর মা-বাবা খবর পেয়ে ধামরাই যান এবং সন্তানের লাশ ঢাকায় এনে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করেন।

রেজাউল করিম মানিক ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস (সম্মান) বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে নরসিংদী যান। পরে আগরতলা হয়ে পশ্চিম দিনাজপুরে পৌঁছান। ঢাকার আরও বেশ কিছু ছাত্র-যুবক সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। প্রশিক্ষণ চলাকালে ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) তাঁদের কথা জানতে পারেন। তাঁদের তিনি নিজের সেক্টরে নিয়ে এসে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলাদলে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই দল ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ করে। ঢাকা (উত্তর) গেরিলাদল রাজধানীতে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি অপারেশন পরিচালনা করে।

লুৎফর রহমান, বীর প্রতীক

ভাটিয়াপাড়া, সদর, গোপালগঞ্জ।
বাবা সাইদুর রহমান, মা জোবেদা খানম।
স্ত্রী মর্জিনা রহমান। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২০৪।

সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা বিওপিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তরেখা বরাবর আছে বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ইপিআর, নিয়মিত সেনা ও ছাত্র-যুবকের সমন্বয়ে গড়া মুক্তিবাহিনীর একটি দল সেখানে অবস্থান নেয়। ওই দলে ছিলেন লুৎফর রহমান। বাঁধের ওপর থেকে দুই দিকে অনেক দূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৮ মে মধ্যরাতে তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে হঠাৎ আক্রমণ করে। সহযোদ্ধা সাজ্জাদ আলী ও হারুনুর রশিদকে নিয়ে লুৎফর রহমান ছিলেন ভোমরা বাকাল সেতুর নিচে চেকপোস্ট মসজিদের কাছে। বাঁধের বিভিন্ন স্থানে ছিল তাঁদের প্রতিরক্ষা বাংকার। তাঁর অবস্থান থেকেই প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়। তারপর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

রাত আড়াইটা-তিনটার দিকে হঠাৎ শব্দ পেয়ে বাংকারে থাকা লুৎফর রহমান ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা সতর্ক হন। তিনি বুঝতে পারেন, এটা বুটের শব্দ। তাঁদের দিকেই আসছে। শব্দ কাছাকাছি আসামাত্র লুৎফর রহমান বলেন, 'হল্ট।' জবাব আসে গুলিতে। তিনি বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অবস্থানে আক্রমণ করেছে। গর্জে ওঠে তাঁর অস্ত্র। কিছুক্ষণ আগেও পুরো এলাকা ছিল নীরব। এখন গোলাগুলির শব্দে চারদিক প্রকম্পিত। লুৎফর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে থাকেন।

রাতে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় অভুক্ত ছিলেন। পরদিন ২৯ মে সকাল ১০টার দিকে তাঁরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর দুই সহযোদ্ধা গোলাগুলির মধ্যেই ক্রল করে খাবার আনতে যান। তিনি একা যুদ্ধ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর এলএমজি বিকল হয়ে যায়। তখন দুই-তিন পাকিস্তানি সেনা তাঁর বাংকারের একদম কাছে এসে গ্রেনেড ছোড়ে। বিস্ফোরিত গ্রেনেডের একটি টুকরা তাঁর পেটের ডান দিকে আঘাত করে ভেতরে ঢুকে যায়, আরেক টুকরা ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে লাগে। এরপর লুৎফর রহমান ক্রল করে সীমান্তের বিএসএফ ক্যাম্পে যেতে সক্ষম হন, তারপর জ্ঞান হারান। সেদিন যুদ্ধে লুৎফর রহমান অসম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁর তিন সহযোদ্ধা শহীদ হন; আহত হন তাঁরা নয়জন।

লুৎফর রহমান ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সাতক্ষীরার কলারোয়ায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন প্রতিরোধযুদ্ধে। যশোরে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে দলের সঙ্গে অবস্থান নেন ভোমরায়। পরে ৮ নম্বর সেক্টরের ভোমরা সাব-সেক্টর এলাকাতেই যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

শওকত আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম খট্টেশ্বর, রানীনগর, নওগাঁ। বর্তমান ঠিকানা সড়ক-২, ইশানা ভ্যালি আ/এ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
বাবা এম আশরাফ আলী, মা শিরীন আরা বেগম।
স্ত্রী নাসিমা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৯।

শওকত আলী প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছেন। তাঁর বাবা পথ আটকে বললেন, 'তুই যাসনে। এ ঘটনা তিন দিনেই থেমে যাবে। আগেও এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না।' কিন্তু তাঁর মা বললেন, 'ওকে যেতে দাও। দেশের দুর্দিনে সে ঘরে বসে থাকতে পারে না।' এরপর বাবা তাঁকে আর আটকালেন না।

শওকত আলী ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মার্চের মাঝামাঝি যান তাঁর বাবার কর্মস্থল চট্টগ্রামে। বাবা ছিলেন রেলওয়ের চিফ ট্রাফিক ম্যানেজার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১ এপ্রিল কালুরঘাটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি দল প্রতিরোধযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। এ সময় সেতুর পশ্চিম প্রান্তে বাঁ দিকে তিনি ও কয়েকজন গণযোদ্ধা প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন। ডান দিকে ক্যাপ্টেন হারুন আহমদ চৌধুরী (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) ও কয়েকজন গণযোদ্ধা। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ঘেরাও করে ফেলে। এ সময় হারুন আহমদ চৌধুরীর পেটে গুলি লাগে। তিনি সেতুর ওপর পড়ে যান। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে তাঁকে উদ্ধারের কাজটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজই করেন শওকত আলী। সেদিনের যুদ্ধে তাঁদের আটজন শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধা শমসের মবিন চৌধুরী আহত অবস্থায় পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দী হন। এভাবে কালুরঘাট যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে তাঁরা অবস্থান নেন রাঙামাটি জেলার নান্নেরহাট থানার বুড়িরহাটে। ১৮ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো ব্যাটালিয়ন তাঁদের অবস্থানে আক্রমণ করে। তখন তাঁদের লোকবল খুবই কম। গোলাবারুদ নেই বললেই চলে। শুধু অসীম মনোবল ও প্রত্যয় নিয়ে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করেন এবং একসময় পিছিয়ে যান। মুন্সী আবদুর রউফ (বীরশ্রেষ্ঠ) এখানে শহীদ হন। এরপর তাঁরা অবস্থান নেন মহালছড়িতে। ২৭ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো দল স্থানীয় মিজোদের সঙ্গে নিয়ে তিন দিক থেকে তাঁদের আক্রমণ করে। এ সময় তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদেরের (বীর উত্তম) সঙ্গে। প্রচণ্ড যুদ্ধের একপর্যায়ে তাঁর চোখের সামনেই গুলিবিদ্ধ হন আফতাবুল কাদের। শওকত আলী সহযোদ্ধা ফারুককে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে রামগড়ে যান।

শওকত আলী এরপর ভারতে যান। পরে যোগ দেন প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে। প্রশিক্ষণ শেষে ১ নম্বর সেক্টরের মনুঘাট সাব-সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে যোগ দেন। ফটিকছড়িতে এক যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক অফিসারসহ বিপুলসংখ্যক সেনা তাঁদের হাতে নিহত হয়। পরে হেঁয়াকো-নাজিরহাটে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে কিছু এলাকা মুক্ত করে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

AMARBOI.COM

শফিকউদ্দীন আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম বর্নি, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।
বাবা তজমুল আলী, মা সামছুন নাহার।
স্ত্রী ছালেহা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২১৭। মৃত্যু ২০০৪।

২০-২৫ মিনিট যুদ্ধ করার পর পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা পালাতে শুরু করল। দুই ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে এল। ঘাঁটিতে উড়ছিল পাকিস্তানি পতাকা। মুক্তিযোদ্ধা শফিকউদ্দীন আহমেদের কাছে ছিল বাংলাদেশের পতাকা। তিনি পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালেন। মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে গোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকা মুখরিত করলেন। কিন্তু তাঁদের এই আনন্দ বেশিক্ষণ থাকল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা এসে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করল। আবারও শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে গেলে তাঁদের অধিনায়ক পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। দলের বেশির ভাগ যোদ্ধা পশ্চাদপসরণ করে নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। শফিকউদ্দীন আহমেদ ও তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েকজন সময়মতো সে খবর পাননি। তিনি সেখানে একটি টিলার ফাঁকে হালকা মেশিনগান দিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন; কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে ক্রমে তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। চোখের সামনে শহীদ হলেন সহযোদ্ধা ইপিআরের হাবিলদার কুতুবউদ্দীন (বাড়ি বিয়ানীবাজারের ঘোলাটিকর), নায়েক আবদুল মান্নান (বাড়ি গোলাপগঞ্জের হেতিমগঞ্জ) এবং কামাল চৌধুরী (বাড়ি গোলাপগঞ্জের লক্ষ্মীপাশা)। এ অবস্থায় শফিকউদ্দীনসহ যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তখন সেখানে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। এরপর তিনি বেঁচে যাওয়া সহযোদ্ধাদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে যান।

এ ঘটনা ঘটে মৌলভীবাজার জেলার লাতুতে। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি। তাদের সহযোগী হিসেবে ছিল স্কাউট ও রাজাকাররা। ১০ আগস্ট মুক্তিবাহিনী সেখানে আক্রমণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা ভোর সাড়ে পাঁচটায় একযোগে আক্রমণ চালান। এর আগে কয়েক ঘণ্টা পাকিস্তানি অবস্থানে আর্টিলারি থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। আটটার মধ্যে লাতু রেলস্টেশন এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। এখানেই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি।

শফিকউদ্দীন আহমেদ ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিলেট সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে ১ নম্বর উইংয়ে। এ উইংয়ের অবস্থান ছিল কুমিল্লার কোটবাড়ীতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কোটবাড়ী থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। পরে ভারতে গিয়ে যোগ দেন মুক্তিবাহিনীতে। যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরের বড়পুঞ্জি সাব-সেক্টরে। জুড়ী উপজেলার দিলকুশা চা-বাগানে সম্মুখযুদ্ধে তিনি এক পাকিস্তানি সেনাকে আটক করেন।

AMARBOI.COM

শহীদুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম সুখী পলাশপাড়া, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।
বর্তমান ঠিকানা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা।
বাবা হেলাল উদ্দীন, মা সুধামণি।
স্ত্রী মালা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪২৫। মৃত্যু ২০০৫।

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বভূষণ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শহীদুল ইসলাম সর্বকনিষ্ঠ। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তিনি লালু নামে বেশি পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিবাহিনী ছাড়াও দেশের ভেতরে বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় কয়েকটি সশস্ত্র আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে ওঠে। এর মধ্যে কাদেরিয়া বাহিনী অন্যতম। এ বাহিনীর একটি দলের সঙ্গে ছিলেন শহীদুল ইসলাম। শুরুতে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা, অস্ত্র-গোলাবারুদ বহন ও সংবাদ সংগ্রহের কাজ করতেন। পরে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরায় অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেন। দেশে ফেরার পর তাঁকে গোপালপুর থানা সদরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আদ্যোপান্ত জানার জন্য সেখানে পাঠানো হয়। শহীদুল ইসলাম গোপালপুরে অবস্থান করে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কাদেরিয়া বাহিনীর কয়েকটি দল গোপালপুরে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করে। শহীদুল ইসলামও এ যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি পাকিস্তানি ক্যাম্পে কয়েকটি গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটান। এতে বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী হতাহত হয়।

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত একটি থানা গোপালপুর। জেলা সদর থেকে উত্তরে এবং জামালপুর জেলার সীমান্তে এর অবস্থান। ১৯৭১ সালের ৭ অক্টোবর গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা গোপালপুরে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালালে দুই পক্ষে শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। যুদ্ধ চলার সময় ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল থেকে আরও পাকিস্তানি সেনা এসে নিজেদের ঘাঁটির শক্তি বৃদ্ধি করে। কমান্ডার আবদুল হাকিম, হুমায়ুন, তারা ও বেনুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ৮ অক্টোবর বিকেল পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। কিন্তু থানার পতন ঘটাতে পারলেন না। এ ঘটনা কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অসম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তিযোদ্ধাদের মূল দলনেতা আবদুল হাকিম চিন্তা করতে থাকলেন পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। এতে কিছুটা সাফল্য আসে। পাকিস্তানি সেনারা ঘাঁটির ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সময় এক দিন শহীদুল ইসলাম কাজের ছেলের ছদ্মবেশে পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটিতে যান। তাদের বিভিন্ন ফাই-ফরমাশ খেটে আস্থা অর্জন করেন। পরে গ্রেনেডসহ ঘাঁটিতে প্রবেশ করে সেখানে গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক অভিযানে পাকিস্তানি সেনা, তাদের সহযোগীসহ আটজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। এই সফল গ্রেনেড হামলার পর শহীদুল ইসলাম আরও কয়েকবার দূর থেকে সেখানে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। এতে পাকিস্তানি সেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নভেম্বরের শেষ দিকে মুক্তিযোদ্ধারা আবার গোপালপুর আক্রমণ করেন। দু-তিন দিন যুদ্ধ চলে। এরপর পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধেও শহীদুল ইসলাম অংশ নেন। গোপালপুরের যুদ্ধ ছাড়াও কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

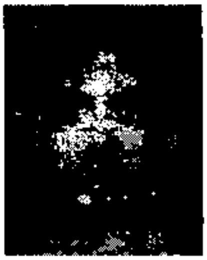

শাহজালাল আহম্মদ, বীর প্রতীক

গ্রাম হরিণকাটা, ইউনিয়ন ওমুরুখা, সেনবাগ, নোয়াখালী।
বাবা আলতাফ আলী, মা জমিলা খাতুন।
স্ত্রী সাফিয়া খাতুন। খেতাবের সনদ নম্বর ১২৪।
শহীদ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

নোয়াখালীর সেনবাগ থানার (বর্তমানে উপজেলা) দক্ষিণে ফেনী-লক্ষ্মীপুর সড়কের সংযোগস্থলে কল্যাণদী। এটি সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চলাচলের অন্যতম সংযোগস্থল। ১৯৭১ সালে কল্যাণদীতে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের সুরক্ষিত একটি ক্যাম্প। এ ক্যাম্পে ছিল পাকিস্তানি মিলিশিয়া, এদেশীয় রাজাকার ও আলবদরের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ১৫০ জনের একটি দল। নির্যাতন-হত্যা-লুণ্ঠনের মাধ্যমে তারা আশপাশের গ্রামগুলোয় কায়েম করেছিল ত্রাসের রাজত্ব। পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগের রাতে (১৮ সেপ্টেম্বর) সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল অপারেশনে অংশ নেয়। ১ নম্বর কাট অফ পার্টি দায়িত্ব পালন করে সেবারহাট বাজারে। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল পূর্ব দিক থেকে যাতে পাকিস্তানি সেনাদের ওই ক্যাম্পে কোনো ধরনের সহায়তা আসতে না পারে। ২ নম্বর কাট অফ পার্টি জমিদারহাটে অবস্থান নেয়। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল চৌমুহনীর দিক থেকে যাতে কোনো সহায়তা আসতে না পারে। অ্যাকশন পার্টি আক্রমণ পরিচালনা করে। এই দলে ছিলেন শাহজালাল আহম্মদসহ ৪০ জন। তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালান।

পরিকল্পনামতো তাঁরা প্রথমে টুইঞ্চ রাইফেল দিয়ে এনারগা গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটান। হঠাৎ এই আক্রমণে পাকিস্তানি মিলিশিয়া-রাজাকার ও আলবদররা হতভম্ব হয়ে যায়। তাদের এই হতভম্ব দশা কাটতে না-কাটতেই স্পেশাল টাস্ক পার্টি পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন বাংকারে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। মুক্তিযোদ্ধারা শুনতে পান শত্রুদের আর্তনাদ। এ সময় অ্যাকশন পার্টির মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প দখল করার জন্য দৌড়ে সেদিকে যেতে থাকেন। তখনই ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানি সেনারা ব্রাশফায়ার করে। এতে শাহজালাল আহম্মদ, সহযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী (হাবিলদার) ও আবু তাহের গুলিবিদ্ধ হন। শাহজালাল আহম্মদ ও আবু তাহের শাহাদাতবরণ করেন। মোহাম্মদ আলী পরে মারা যান। সেখানে এক ঘণ্টার বেশি সময় যুদ্ধ হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ যখন শেষ হয়, তখন ভোরের প্রথম লগ্ন। ঈদের দিন সকাল। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা তিন সহযোদ্ধার মরদেহ নিয়ে যখন ফিরছিলেন, তখন গ্রামবাসী ঈদের জামাতের কথা ভুলে তাঁদের সঙ্গী হন। পরে কানকিরহাট হাইস্কুলের মাঠে জানাজা শেষে শহীদ তিনজনকে হাইস্কুল মাঠের দক্ষিণে বড় দিঘির পশ্চিম পাশে সমাহিত করা হয়।

শাহজালাল আহম্মদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসে। মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন যুদ্ধে। ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টরের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ছিলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহজাহান কবীর, বীর প্রতীক

গ্রাম দাসাদী, ইউনিয়ন কল্যাণপুর, সদর, চাঁদপুর। বর্তমান ঠিকানা মাদারটেক, ঢাকা। বাবা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মা আছিয়া বেগম। স্ত্রী বেরজিছ বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩০২।

১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট ভোরে চাঁদপুর নৌবন্দরে অপারেশন শেষে শাহজাহান কবীর এবং তাঁর সহযোদ্ধা অন্য নৌ-কমান্ডোরা বেশ বিপদে পড়েন। তাঁদের ফেরার পথে বিশাল জাহাজ 'গাজী'কে নদীর পাড় ঘেঁষে প্রেতচ্ছায়ার মতো ভেসে আছে। সেটা দেখে তাঁরা কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

এ সময়ই গাজী চলতে শুরু করল। বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে গাজী নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এ সুযোগই শাহজাহান কবীর ও অন্যরা কাজে লাগালেন। তাঁরা সাঁতরাতে করছে। দেড়-দুই কিলোমিটার দূরে নদীর পাড়সংলগ্ন এক পাটখেতে আশ্রয় নিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। একটা করে অন্তর্বাস ছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের শরীর প্রায় অনাবৃত। আত্মরক্ষার জন্য কারও কাছে কোনো অস্ত্র নেই। হাতে শুধু ফিনস।

তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা পাটখেত থেকে রওনা হলেন যেখানে তাঁদের আশ্রয় নেওয়ার কথা, সেই গন্তব্যের উদ্দেশে। শাহজাহান কবীরসহ ছয়জন নৌ-কমান্ডো একটি দলে। দলনেতা বদিউল আলম কয়েকজনকে নিয়ে আরেকটি দলে। তৃতীয় একটি দলে বাকি যোদ্ধারা।

শাহজাহান কবীর তাঁর সঙ্গে থাকা নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে একটি জেলেনৌকায় করে সন্ধ্যার দিকে এসে পৌঁছালেন তাঁদের আশ্রয়স্থলে। অপারেশন শেষে সবার একত্র হওয়ার কথা ছিল শাহজাহান কবীরের বাড়িতেই। তাঁর বাড়ি ছিল ওই এলাকাতেই। তাঁরা ছয়জন ভালোভাবে সেখানে পৌঁছালেও অন্যদের খোঁজ না পাওয়ায় তিনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

এদিকে ১৭ আগস্ট সকালে উপস্থিত হলো আরেক বিপদ। পাকিস্তানি সেনারা শাহজাহান কবীরের বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে ও তাঁর বাবাকে আটক করল। তাঁর সঙ্গে আসা পাঁচ সহযোদ্ধা পাশে আরেকটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা নৌ-কমান্ডোদের সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য তাঁর ও তাঁর বাবার ওপর নির্যাতন চালায়, কিন্তু তাঁরা কোনো কিছুই স্বীকার করলেন না।

এরপর পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের নিয়ে রওনা হলো ঘাঁটির দিকে। এ সময় শাহজাহান কবীরের বাবা পাকিস্তানি সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কৌশলে ছেলের হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেলতে সক্ষম হন। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে শাহজাহান কবীর ঝাঁপিয়ে পড়েন নদীতে। ডুবসাঁতার দিয়ে তিনি চলে যান পাকিস্তানি সেনাদের নাগালের বাইরে। তারপর তিনি অনেক কষ্টে চলে যান ভারতে। পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে তাঁর বাবাকে।

শাহজাহান কবীর নৌ-কমান্ডো ছিলেন। চাঁদপুর নৌবন্দর ছাড়া আরও কয়েকটি অপারেশনে তিনি অংশ নেন। উল্লেখযোগ্য অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন চাঁদপুরের এখলাসপুর ও মোহনপুরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ আজিজুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম ডুমাইল, মধুখালী, ফরিদপুর। বর্তমান ঠিকানা রায়ের মহল, মহানগর, খুলনা। বাবা শেখ আবদুল হাকিম, মা জোহরা খাতুন। স্ত্রী ফিরোজা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৮৮।

একাত্তর সালের শুরুতে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের ছুটি প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। শেখ আজিজুর রহমান মার্চের শুরুতে স্ত্রীর অসুখের কথা বলে ছুটি নেন। করাচি থেকে ৭ মার্চ বাংলাদেশে পৌঁছান। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সহকর্মী মোখলেসুর রহমানকে নিয়ে নিজ এলাকা কামারখালী কলেজ মাঠে স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করেন তিনি। তেমন কোনো অস্ত্র ছিল না তাঁদের। তা সত্ত্বেও নিজের জ্ঞান সম্বল করে শতাধিক যুবককে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এক মাস পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কামারখালী দখল করলে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। শেখ আজিজুর রহমান এবার নিজ এলাকার যুবকদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে পাঠাতে থাকেন। জুলাই মাসে তিনি নিজেও ভারতে যান। কলকাতার থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ে গেলে তাঁকে কল্যাণীতে মুক্তিবাহিনীর ৮ নম্বর সেক্টরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা জানান, মুক্তিবাহিনীর জন্য বিমানবাহিনী গঠন করা হবে।

কল্যাণী ক্যাম্পে দুই মাস থাকার পর বিমানবাহিনী গঠনের কোনো কার্যক্রম না দেখে আজিজুর রহমান ১৪ জন সঙ্গীকে নিয়ে সেক্টর কমান্ডার এম এ মঞ্জুরের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের ভেতরে যুদ্ধ করার অনুমতি চান। তখন তাঁদের বয়রা সাব-সেক্টরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে বেশ কয়েক দিন থাকার পর ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা তাঁদের গোপালগঞ্জে যেতে বলেন। সেপ্টেম্বরে বয়রা থেকে গোপালগঞ্জে যাওয়ার পথে মাগুরার শালিখা থানার আড়পাড়ার পশ্চিমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলের সামনে পড়েন তাঁরা। শুরু হয় যুদ্ধ। ওই এলাকার মুক্তিযোদ্ধারাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আজিজুর রহমানসহ যোদ্ধারা রাস্তার একপাশে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্র দিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধ করেন বীরত্বের সঙ্গে। ওই যুদ্ধে বিমানসেনা মান্নান, হানিফ ও তিন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৮ জন নিহত হয়। গ্রামের মানুষ পাঁচ মুক্তিযোদ্ধাকে দাফন করেন। বেঁচে যাওয়া যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে আজিজুর রহমান মাগুরা, ফরিদপুর, ঝিনাইদহ ও গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অপারেশন চালান এবং রাজাকার ক্যাম্প দখল ও সড়কের কালভার্ট ধ্বংস করেন। গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়ায় ছিল পাকিস্তানি সেনাদের একটি ক্যাম্প। ডিসেম্বরের ১২-১৩ তারিখে মুক্তিবাহিনী ওই ক্যাম্প আক্রমণ করে। ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনিও অংশ নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ আবদুল মান্নান, বীর প্রতীক

গ্রাম দিঘুহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা। বর্তমান ঠিকানা শেখ মঞ্জিল, কচুক্ষেত, ঢাকা। বাবা এম এল শেখ, মা আমেনা বেগম। স্ত্রী খুশনুন নাহার। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩১৪। গেজেটে নাম মান্নান।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শেখ আবদুল মান্নান ছিলেন ঢাকার ফার্মগেট এলাকায়। কারফিউ শিথিল হলেও তিনি বাড়ি ফেরেননি। ২৮ মার্চ সেখান থেকে গোপীবাগে যান। সেখানে থাকতেন তাঁর বন্ধু মুনসুরুল আলম দুলাল (বীর প্রতীক)। তাঁরা দুজন সিদ্ধান্ত নেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবেন। দুলালকে সঙ্গে নিয়ে সেদিনই ঢাকা ছাড়েন। রওনা হন ভারতের আগরতলার উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছে তাঁরা খোঁজখবর নিতে থাকেন, কীভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেওয়া যায়। এর মধ্যে তাঁর আরও কয়েকজন বন্ধু সেখানে যান। কিছুদিন পর তাঁদের দেখা হয় খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম) ও এ টি এম হায়দারের (বীর উত্তম) সঙ্গে। তাঁরা তাঁদের মুক্তিবাহিনীতে গেরিলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। শুরু হয় প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে ঢাকায় ফেরেন। এই দলে তিনি ও দুলাল ছাড়াও ছিলেন বজলুল মাহমুদ (বীর প্রতীক), সিদ্দিক, আলমগীর, বাদল, আবদুল্লাহ, কটু ও খালেদ।

শেখ আবদুল মান্নান প্রথম অপারেশন করেন গ্রিন রোডে। জুন মাসের একদিন এক পাকিস্তানি সেনার ওপর আকস্মিকভাবে চড়াও হয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে তার এসএমজি কেড়ে নিয়ে তিনি পালিয়ে যান। এই মাসেই তিনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তেজগাঁও কলেজে হামলা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন পরীক্ষার আয়োজন করেছিল। তাঁরা সেই পরীক্ষা ভণ্ডুল করার জন্য প্রবেশপত্র লুট করেন। সায়েন্স ল্যাবরেটরির পাশে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের একটি ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে ছিল কয়েকজন পাকিস্তানি মিলিশিয়া। জুলাই মাসের একদিন রাত নয়টার দিকে তিনি ও কয়েকজন সহযোদ্ধা সেই ক্যাম্পে আকস্মিকভাবে হামলা করেন। তাঁদের হামলায় বেশ কয়েকজন মিলিশিয়া ও তাদের সহযোগী আনসার হতাহত হয়।

১৫ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে শেখ আবদুল মান্নানসহ আরও দুজন গ্রিন রোডের ওয়াপদা (এখন পানি উন্নয়ন বোর্ড) অফিসের পাকিস্তানি ক্যাম্পে হামলা চালান। হতভম্ব পাকিস্তানি মিলিশিয়ারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই এলাকা থেকে তাঁরা দ্রুত সরে পড়েন। এরপর তিনি অপারেশন করেন ২১ আগস্ট। এই অপারেশনের নেতৃত্বে ছিলেন তিনিই। সহযোদ্ধা ছিলেন দুলাল, বজলুল মাহমুদ, আবদুল্লাহ ও আলমগীর। রাত একটার দিকে গ্রিন রোডে মাইন পুঁতে তাঁরা অবস্থান নেন হোটেল নূরের দোতলায়। তাঁদের কাছে অস্ত্র বলতে ছিল দুটি এসএমজি, দুটি এসএলআর। রাত দুইটার দিকে সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জিপ ও লরি আসামাত্র মাইনগুলো বিস্ফোরিত হয়। তখন তাঁরা একযোগে কিছুক্ষণ গুলি করে সরে পড়েন। তাঁদের হামলায় সেদিন বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় জিপ ও লরি। এই অপারেশনের খবর বিবিসিতে প্রচারিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ মোক্তার আলী, বীর প্রতীক

পূর্বপাড়া, গ্রাম হরিদাসপুর, ইউনিয়ন লতিফপুর, সদর, গোপালগঞ্জ। বাবা আজহারউদ্দীন শেখ, মা বুরু বিবি। স্ত্রী হালিমুন্নেছা। তাঁদের চার ছেলে ও সাত মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২২৩। গেজেটে নাম মোক্তার আলী।

ভোরে গুপ্তচরের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা খবর পান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল হিজলী হয়ে আন্দলিয়া যাবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলকে অ্যামবুশ করার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হলেন মুক্তিবাহিনীর ২৭ জন যোদ্ধা। তাঁরা মোট তিনটি দলে বিভক্ত। প্রতি দলে নয়জন করে সদস্য। একটি দলের নেতৃত্বে মোক্তার আলীর। অন্য দুই দলের নেতৃত্বে যথাক্রমে আসাদ আলী (বীর প্রতীক) ও জাকির। তাঁদের সবার নেতৃত্বে লেফটেন্যান্ট অলিক কুমারগুপ্ত (বীর প্রতীক)। হিজলী গ্রামের এক জায়গায় জমির আইলে এসে তাঁরা অবস্থান নিলেন। মোক্তার আলীর দল সবার মাঝখানে। ডানে ১০০ গজ দূরে আসাদ আলীর দল, বাঁয়ে জাকিরের দল। এরপর অপেক্ষা।

সূর্য তখন মাথার ওপর। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের বড়সড় একটি দল চলে এল মোক্তার আলী ও আসাদ আলীর দলের কাছাকাছি। গুলির আওতায় আসামাত্র মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে গুলি করতে শুরু করলেন। লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। বেঁচে যাওয়া হতভম্ব বাকি সেনারা দ্রুত পজিশন নিয়ে শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। এরপর চলতে থাকল যুদ্ধ। মোক্তার আলী দেখলেন, আসাদ আলীর দলের একজন ছাড়া বাকি সবাই কোনো কিছু না বলে পিছে হটে গেছেন। পাকিস্তানি সেনারা ততক্ষণে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে এবং প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ঠেকাতে পারছেন না। এখন পিছু হটে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো উপায় নেই। তিনি আসাদ আলীর দলের ওই মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পেছাতে থাকেন। গুলির আওতার বাইরে এসে মাথা নিচু করে তাঁরা দৌড়াতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ধাওয়া করে। মোক্তার আলী একটু পেছনে পড়ে যান। পথে ছিল এক আমবাগান। দৌড়াতে গিয়ে সেই আমবাগানের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে যান তিনি।

পাকিস্তানি সেনারা তখন একদম কাছে। আমবাগানের শেষে একটা জলাধার। মোক্তার আলী উঠে আবার দৌড়াতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া বুলেট ছুটে যাচ্ছিল তাঁর ডান ও বাঁ দিক দিয়ে। জলাধারের ভেতর দিয়ে বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারলেন না। পড়ে গেলেন পানিতে। পাকিস্তানি সেনারা মনে করল, গুলি লেগেছে। তারা জলাধারে না নেমে ফিরে যেতে থাকল। একটু পর মোক্তার আলী জলাধার থেকে উঠে মিলিত হন নিজের দলের সঙ্গে। সহযোদ্ধাদের সংগঠিত করে তিনি আবারও পিছু নেন পাকিস্তানি সেনাদের। অ্যামবুশ স্থানের কাছাকাছি গিয়ে দেখেন, পাকিস্তানি সেনারা হতাহত সেনাদের লাশ সরাতে ব্যস্ত। এ সময় শুরু হয় ভারত থেকে আর্টিলারি গোলাবর্ষণ। আর্টিলারি সাপোর্ট পেয়ে তাঁরা আবার পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। একদিকে তাঁদের আক্রমণ, অন্যদিকে আর্টিলারি গোলাবর্ষণ। পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তারা নিহত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাদের লাশ ফেলেই সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

হিজলী যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার অন্তর্গত। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে এর অবস্থান। ৩ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্যাট্রোল দলকে অ্যামবুশ করে। এতে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন আহত হন।

শেখ মোক্তার আলী চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে। তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন, পরে ভারতে সংগঠিত হওয়ার পর যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরে। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছুটিপুর ও গরীবপুরের যুদ্ধ। গরীবপুরের সম্মুখযুদ্ধে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে তাঁদের সবার কাছে অস্ত্র ও গুলি থাকলেও অস্ত্রে গুলি ভরার সময় ছিল না। তখন বেয়নেট চার্জ করা হতে থাকে। অনেকের বেয়নেট ভেঙে যায়। এরপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে পেটাপিটি করতে থাকেন। শেষে শুরু হয় দুই পক্ষের হাতাহাতি। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হন।

সামসুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম হাতুড়াবাড়ী, বাইদর ইউনিয়ন, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আবদুর রাজ্জাক, মা চন্দ্র বানু। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৪৯। শহীদ ২২ নভেম্বর ১৯৭১।

AMARBOI.COM

সামসুল হক ইপিআরে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন সিলেট ইপিআর হেডকোয়ার্টারের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টর এলাকায়। তবে তিনি কোন কোন যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায়নি। লতুয়ামুড়া-চন্দ্রপুর যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। এ তথ্য দিয়েছেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাইউম।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা রেলস্টেশনের পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে চন্দ্রপুর। ১৮ নভেম্বর মিত্রবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টরের অধিনায়ক মেজর আইন উদ্দিনকে (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল) জানান, তাঁরা যৌথভাবে চন্দ্রপুর-লতুয়ামুড়ায় আক্রমণ করবেন। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। কিন্তু মিত্রবাহিনীর এই আক্রমণের পরিকল্পনা মুক্তিবাহিনীর গঙ্গাসাগর সাব-সেক্টরের অধিনায়কের মনঃপূত ছিল না। কারণ, চন্দ্রপুর গ্রামের সঙ্গেই লতুয়ামুড়া পাহাড়। পাহাড়ে আছে পাকিস্তানি সেনাদের সুরক্ষিত অবস্থান। চন্দ্রপুরে আক্রমণ করলে পাকিস্তানি সেনারা সহজেই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতি করতে পারবে। কিন্তু মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার তাঁর এই যুক্তি মানতে রাজি ছিলেন না। এ অবস্থায় আইন উদ্দিন তাঁকে অনুরোধ করেন, আক্রমণে যতজন মুক্তিযোদ্ধা যাবেন, মিত্রবাহিনীর ততজন সেনাকেও তাতে অংশ নিতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার এই অনুরোধ মেনে নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২২ নভেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌথভাবে পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনীর একটি দলে ছিলেন সামসুল হক। চন্দ্রপুরে সেদিন ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর একজন মেজর (কোম্পানি কমান্ডার), তিনজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ ৪৫ জন এবং মুক্তিবাহিনীর লেফটেন্যান্ট খন্দকার আবদুল আজিজসহ ২২-২৩ জন শহীদ হন। আহত হন ৩৫ জন। সারা রাত চলে যুদ্ধ। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পিছু হটে। মুক্তি ও মিত্রবাহিনী চন্দ্রপুর দখল করে। কিন্তু বেশিক্ষণ এ অবস্থান তাঁদের পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। কয়েক ঘণ্টা পর পাকিস্তানি সেনারা আবার প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে চন্দ্রপুর-লতুয়ামুড়া দখল করে নেয়। ২৩ নভেম্বর বিকেলে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল আহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ উদ্ধারের জন্য চন্দ্রপুরে যান। কিন্তু তাঁদের কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে শহীদ হন। ওই দলের সদস্যরা মাত্র আটজনের লাশ উদ্ধারে সক্ষম হন। পাকিস্তানি সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করে।

চন্দ্রপুরের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েন। এ যুদ্ধের পর তাঁদের মনোবলে বড় রকমের চিড় ধরে। কারণ, এত মুক্তিযোদ্ধা একসঙ্গে ২ নম্বর সেক্টরের কোনো রণাঙ্গনে শহীদ হননি।

সামসুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম [illegible]পুর, ইউনিয়ন পূর্ব চন্দ্রপুর, দাগনভূঞা, ফেনী।
বাবা আবদুল লতিফ, মা সুফিয়া খাতুন।
স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২৫।

AMARBOI.COM

বিদ্যুৎকেন্দ্রে

বিদ্যুচ্চমকের মতো একঝলক আলো দেখা গেল। তারপর প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। একটু পর আরও কয়েকটি। কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। বিস্ফোরণস্থলে কালো ধোঁয়া আর আগুন। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকা শহরের একাংশ অন্ধকার।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বরে ঘটেছিল নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রে। বিস্ফোরণের শব্দ, আগুন আর কালো ধোঁয়া দেখে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা একেবারে হতবাক। জীবনের দায়ে সেখানে থাকা বাঙালিরাও হকচকিত। পাকিস্তানি সেনারা ছোটাছুটি করতে করতে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে অবস্থান নেয় এবং অনবরত চালিয়ে যেতে থাকে গুলি। লক্ষ্যহীন ছিল সেই গুলিবর্ষণ। কাকে লক্ষ্য করে তারা গুলিবর্ষণ করছে, নিজেরাও সেটা জানত না। এসব কিছুই ঘটল মিনিট কয়েকের মধ্যে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারদিকে পাকিস্তানি সেনাদের সতর্ক প্রহরা। মূল ফটকে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা, রাজাকার আর কেন্দ্রের নিজস্ব প্রহরী। ভেতরে ঢোকার সময় সব বাঙালিকেই তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করা হয়। এর মধ্যেই সামসুল হক শুরু করলেন তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপন অভিযান—ভেতরে বিস্ফোরক উপাদান, অর্থাৎ পিকে, ফিউজ ওয়্যার ও ডেটোনেটর নেওয়ার কাজ। তাঁর ভাইয়ের সহায়তায় সেগুলো তিনি ভেতরে নিলেন কয়েক দিন ধরে।

একদিন রাতে সামসুল হক ও তাঁর ভাই বিস্ফোরকগুলো স্থাপন করলেন। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য, কোনো কারণে তা বিস্ফোরিত হলো না। কিছুদিন পর তিনি আবার একই কায়দায় নতুন বিস্ফোরক উপাদান ওই কেন্দ্রের ভেতরে নিলেন। রাতে তিনি বিস্ফোরক স্থাপন করলেন। এবার তিনি সফল হলেন। বিস্ফোরণের পরপরই সামসুল হক তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে পাশের একটি গ্রামে আশ্রয় নিলেন। পরে চলে যান ভারতে।

সামসুল হক ছিলেন বিদ্যুৎকেন্দ্রের বয়লার ফিটার। ফিটার পদে চাকরি করতে করতে তাঁর নাম হয়ে যায় সামসুল হক ফিটার। তাঁর ভাই নূরুল হকও সেখানে চাকরি করতেন। তিনি বিদ্যুৎকেন্দ্রের একজন প্রকৌশলীর গাড়িচালক ছিলেন। মার্চে তিনি ও তাঁর ভাই ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা ভারতের মেলাঘরে চলে যান। পরে সেখানে বিস্ফোরক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। এ সময় পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ সরকারি ও আধা সরকারি চাকরিজীবী—যাঁরা কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিলেন—তাঁদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। সামসুল হক এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভাই নূরুল হককে সঙ্গে নিয়ে চাকরিতে যোগ দেন। তাঁরা দুজনই মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের গেরিলাবাহিনীর গোপন সদস্য ছিলেন। নূরুল হকও বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছেন। তাঁরা দুই ভাই পরে গেরিলা কায়দায় বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

সাহাব উদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম উত্তর আনন্দপুর, ইউনিয়ন মুন্সিরহাট, ফুলগাজী, ফেনী। বাবা আলী নেওয়াজ মজুমদার, মা ছাবেদা খাতুন। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১২৩। শহীদ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

মুন্সিরহাটে ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার অন্তর্গত মুন্সিরহাট। ১৯৭১ সালের ১০ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল সেদিকে অগ্রসর হয়। পথে বাদুয়ায় ছিল একটি সেতু। সেতুটি মুক্তিযোদ্ধারা ভেঙে দিয়েছিলেন। এর অদূরেই ছিল মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের অবস্থান। এই দলে ছিলেন সাহাব উদ্দিন। সেদিন পাকিস্তানি সেনারা ভাঙা সেতু পার হওয়ার জন্য এর ওপর বাঁশের সেতু তৈরি করছিল। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা লুকিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা সেই সেতু পার হতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই একসঙ্গে গর্জে উঠল তাঁদের অস্ত্রগুলো। পাকিস্তানি সেনা, যারা প্রথমে সেতু পার হচ্ছিল, তারা সবাই গুলি লেগে পানিতে পড়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা পিছু হটে। হতাহত হয় তাদের বেশ কয়েকজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানি সেনারা হতবিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে প্রবলভাবে আক্রমণ করে। এবার তারা সংখ্যায় ছিল অনেক। সাহাব উদ্দিন ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। পাকিস্তানি সেনারা বৃষ্টির মতো তাঁদের অবস্থানে কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাঁরা মূল ঘাঁটিতে পশ্চাদপসরণ করেন। পাকিস্তানি সেনারা দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে মুক্তিবাহিনীর মূল ঘাঁটিতে আক্রমণ করে। তখন শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সেদিন মুক্তিবাহিনীর মাইনের ফাঁদে পড়ে ও গুলিবিদ্ধ হয়ে শতাধিক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনার লাশই মুক্তিবাহিনী উদ্ধার করে।

এই যুদ্ধের সাড়ে তিন মাস পর ফুলগাজীর করৈয়া-কালিকাপুর এলাকায় এক প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন সাহাব উদ্দিন। তাঁদের অবস্থানের সামনেই ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। দুই পক্ষেই তখন নিয়মিত গোলাগুলি হতো। ৩০ সেপ্টেম্বরও দুই পক্ষে গোলাগুলি চলছিল। এ দিন হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে সাহাব উদ্দিন শহীদ হন। এরপর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে মুক্তাঞ্চল মনতলায় সমাহিত করা হয়। স্বাধীনতার পর তাঁর কবরে নামফলক লাগানো হয়।

সাহাব উদ্দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা ছিলেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় এসে যুদ্ধে যোগ দেন। ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি মুন্সিরহাট, করৈয়া-কালিকাপুর ছাড়াও ফুলগাজী, [illegible], চিথলিয়াসহ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

সাহেব মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম শিমরাইল, ইউনিয়ন মেহারি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা লেশিয়ারা, কুটি, কসবা। বাবা আলতাফ আলী, মা জর্জেমা নেছা। স্ত্রী আলেয়া বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০০।

মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের একদল মুক্তিযোদ্ধা নভেম্বরের শেষ দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানা এলাকায় এসে অবস্থান নেন। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন সাহেব মিয়া। মূল দলটির তাঁরা অগ্রবর্তী অংশ। আড়াইহাজার থানা সে সময় মুক্ত। কিন্তু ঢাকা-নরসিংদী সড়কে তখনো পাকিস্তানি সেনাদের চলাচল অব্যাহত। সড়কের কয়েক জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান। পাঁচরুখি বাজারে ছিল তাদের এ রকমেরই একটি প্রতিরক্ষাব্যূহ। পাকিস্তানি সেনাদের এখান থেকে হটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ এল সাহেব মিয়ার দলের প্রতি।

নির্দেশ পেয়ে সাহেব মিয়া পাকিস্তানি সেনাদের ওই ক্যাম্প আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল মুক্তিবাহিনীর স্থানীয় কয়েকটি দল। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা একদিন মধ্যরাতে অবস্থান নিলেন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের চারদিকে। তাঁদের অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের দূরত্ব দেড় থেকে দুই শ গজ। নির্ধারিত সময়ে একসঙ্গে গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের সব অস্ত্র। পাকিস্তানি সেনারাও শুরু করল পাল্টা গুলিবর্ষণ। সাহেব মিয়ারা চারদিক ঘিরে অবস্থান নেওয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের পালানোর পথ ছিল রুদ্ধ। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও গ্রামবাসীর সহযোগিতায় তাদের আটক করা হয়। সেদিন তাঁরা ১৭ জন পাকিস্তানিকে আটক করতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে একজন নিহত হয়।

সাহেব মিয়া ভারতের অমপিনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। এখানে ২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। নভেম্বরের প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনীর একটি দলের দলনেতা করে তাঁকে দেশের ভেতরে পাঠানো হয়। তিনি প্রথম যুদ্ধ করেন কুমিল্লা এলাকায়। পরে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে যুদ্ধ করেন।

সাহেব মিয়া ১৯৭১ সালে যশোর সেনানিবাসে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হন। তখন তাঁরা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যশোরের চৌগাছায় সমবেত হন। কিন্তু সাহেব মিয়া সেখানে যেতে পারেননি। বেনাপোল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে নানা পথ ঘুরে তিনি আগরতলায় যান। সেখানে তাঁকে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

সিকান্দার আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম পূর্ব অলকা, পরশুরাম, ফেনী।
বাবা আলী আহমেদ, মা জেবুন নেছা।
স্ত্রী রুচিরা আক্তার। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৪।
শহীদ ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১।

ফেনী জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম পূর্ব অলকা। এই গ্রামে একটি পুকুরপাড়ে গাছপালার নিচে কয়েকটি কবর। একটু দূরে আরেকটি কবর। সেটি চিহ্নিত, কিন্তু তাতে বেশ অবহেলা ও অযত্নের ছাপ। এই কবরে যিনি শায়িত, তিনি খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সিকান্দার আহমেদ বীর প্রতীকের কবর সেটি।

১৯৭১ সাল। নভেম্বরের শেষ দিক। চারদিকে মুক্তিবাহিনীর জোরালো আক্রমণ চলছে। পাকিস্তানি সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তারা পিছু হটছে। মুক্তিযোদ্ধারা মুক্ত করছেন এলাকার পর এলাকা। ফেনী জেলার বিলোনিয়া মুক্ত করার পর মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছেন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বান্দুয়া-পাঠাননগর এলাকায়। তাঁদের সঙ্গে আছে মিত্রবাহিনী। ২২-২৩ নভেম্বর থেকে সেখানে চলছে যুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনরাত গোলাগুলি। কখনো থেমে থেমে, কখনো টানা এক-দেড় ঘণ্টা। একটু পর পর গোলার কানফাটানো শব্দ। পাকিস্তানি সেনাদের গোলা এসে পড়ছে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের আশপাশে বা সামান্য দূরে। এরই মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজন গোলার আঘাতে আহত হয়েছেন। ৫ ডিসেম্বরও যুদ্ধ চলছিল। এদিন সিকান্দার আহমেদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে সিকান্দার আহমেদের অবস্থান থেকে একটু দূরে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো পাকিস্তানি আর্টিলারি গোলা। গোলার টুকরা এসে আঘাত করল সিকান্দার আহমেদের শরীরে। গুরুতর আহত হলেন তিনি। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। সহযোদ্ধারা চেষ্টা করলেন তাঁকে বাঁচাতে, কিন্তু পারলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিকান্দার আহমেদ ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। সেদিন আহত হন মুক্তিবাহিনীর আরও কয়েকজন। সিকান্দার আহমেদের বাড়ি ছিল বিলোনিয়া এলাকাতেই। সহযোদ্ধারা তাঁর লাশ বাড়িতে নিয়ে সমাহিত করেন। বাড়ির সামনের পুকুরপাড়েই তাঁর কবর।

সিকান্দার আহমেদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানের লাহোরে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেন। তিনি ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ করেন বিলোনিয়া, সালধর বাজার, মুন্সিরহাট, সুবার বাজারসহ আরও কয়েকটি জায়গায়।

WWW.AMARBOI.COM

সিতারা বেগম, বীর প্রতীক

গ্রাম কান্দাইল, ইউনিয়ন জয়কা, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ। বাবা মোহাম্মদ ইসরাইল, মা হাকিমুন্নেছা বেগম। স্বামী ডা. আবিদুর রহমানও একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৫।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আহত বা অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। এ রকম একটি হাসপাতাল ছিল ২ নম্বর সেক্টরে। নাম 'বাংলাদেশ হাসপাতাল'। এখানে ডা. জাফরউল্লাহ, ডা. মোবিন, ডা. আখতার, ডা. সিতারা বেগমসহ আরও অনেক চিকিৎসক, মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী ও সেবিকা নিয়োজিত ছিলেন। এটি প্রথমে স্থাপিত হয় সীমান্তসংলগ্ন ভারতের সোনামুড়ায়। পরে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তা স্থানান্তর করা হয় আগরতলার কাছাকাছি বিশ্রামগঞ্জে। হাসপাতালটি গড়ে তোলা হয়েছিল ইট-সিমেন্টের তৈরি কোনো ভবনে নয়, দেয়াল বলতে চারদিকে বাঁশের বেড়া, মেঝে বলতে মাটির ভিত এবং বাঁশের চারটি খুঁটির ওপর মাচা বেঁধে পাতা হয়েছিল বিছানা। একেকটি ঘরে বিছানার সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০টি। কেবল অপারেশন রুমটি প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে ঘেরা। ওপর-নিচের চারদিকেই প্লাস্টিকের আবরণ। ভেন্টিলেশনের জন্য কয়েকটি জায়গায় ছোট ছোট ফোকর। বেশির ভাগ সময় দিনেই এখানে অপারেশন করা হতো। জরুরি কেস হলে রাতে হারিকেন বা টর্চলাইট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বালিয়ে অপারেশন করা হতো। শেষ দিকে অবশ্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ডা. সিতারা বেগম জুলাইয়ের শেষ দিকে বাংলাদেশ হাসপাতালে যোগ দেন। পরে হাসপাতালের সিও (কমান্ডিং অফিসার) কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। তাঁকে এ পদে নিয়োগ দেওয়ার পর সামরিক হাসপাতাল যেভাবে চলে, সেভাবে এ হাসপাতালও পরিচালিত হতে থাকে।

ডা. সিতারা বেগম বাংলাদেশ হাসপাতালে অসাধ্য সাধনের মতো সব কাজ করতেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিদিনই এ হাসপাতালে পাঠানো হতো। কেউ শেলের স্প্লিন্টারে আঘাতপ্রাপ্ত, কেউ গুলিবিদ্ধ। যতই আহত হন না কেন, মুক্তিযোদ্ধারা সেখানকার সেবায় চাঙা হয়ে উঠতেন। অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাও এখানে হতো। ওষুধপত্র ও চিকিৎসা-সরঞ্জামের স্বল্পতা সত্ত্বেও একজন ছাড়া আর কেউ এ হাসপাতালে মারা যাননি। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল চাঙা রাখতে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা যে অবদান রেখেছেন, তা সত্যিই স্মরণীয়।

ডা. সিতারা বেগম কুমিল্লা সিএমএইচের চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে তিনি বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বড় ভাই এ টি এম হায়দারের সহায়তায় ভারতে চলে যান। পরে বাংলাদেশ হাসপাতালে যোগ দেন।

AMARBOI.COM

সিরাজউদ্দীন আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম [illegible], ইউনিয়ন পাঁচদোনা, সদর, নরসিংদী।
বাবা মো. জোবেদ আলী, মা ঘোষেদা বেগম।
স্ত্রী আলেয়া বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩৫। মৃত্যু ১৯৭২।

সিরাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিতে আক্রমণ চালান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে। আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত পাকিস্তানি সেনারা। কিছুক্ষণ পর তাদের দিক থেকে শুরু হলো প্রতিরোধ। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকল। গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারাই বিজয়ী হলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল জিনারদীতে ১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট।

জিনারদী নরসিংদী জেলার অন্তর্গত (ঘোড়াশালের সন্নিকটে)। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখানে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। ১৩ আগস্ট দুপুরে মুক্তিযোদ্ধারা জিনারদীতে আক্রমণ করেন। আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধের পর ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সাতজন পালিয়ে যায়। একজন নিহত হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা জিনারদী রেলস্টেশন ধ্বংস করেন। তাঁরা ছিলেন মাত্র কয়েকজন। মূলত তাঁর কৌশলী ভূমিকার জন্যই পাকিস্তানি সেনারা সেদিন পরাভূত হয়।

মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম, পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর জেনারেল) এক সাক্ষাৎকারে এ যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে বলেছেন: '...আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে আমাদের একটি গেরিলা দল পাকিস্তানি সেনাদের জিনারদী ক্যাম্প আক্রমণ করে। আড়াই ঘন্টা যুদ্ধের পর একজন নিহত ও ১৫ জন আত্মসমর্পণ করে। সাতজন পালিয়ে যায়। গেরিলারা জিনারদী রেলস্টেশন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। টেলিফোন যোগাযোগও তারা ধ্বংস করে। টিকিট ও অন্যান্য কাগজপত্র জ্বালিয়ে দেয়। ক্যাম্প থেকে আমাদের গেরিলারা একটি হালকা মেশিনগান, ১১টি রাইফেল, হালকা মেশিনগানের ৪৫০০ গুলি, একটি স্টেনগান ও ১০০ রাউন্ড গুলি, ১০টি বেল্ট, ২৬ জোড়া বুট, ১৭ ক্যান আটা, ১১ পেটি দুধ ও আরও জিনিসপত্র উদ্ধার করে।' (*বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র*, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৪)।

১৯৭১ সালে সিরাজউদ্দীন আহমেদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। তখন তাঁর পদবি ছিল লিডিং রাইটার। ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি ছুটিতে বাড়ি ছিলেন। ছুটি শেষ হলেও চাকরিতে আর যোগ দেননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। নরসিংদীর পাঁচদোনার যুদ্ধে (৮-৯ এপ্রিল) তিনি অংশ নেন। এ যুদ্ধের পর তিনি স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। নরসিংদীর পতন হলে তিনি ছাত্র-যুবকদের সঙ্গে নিয়ে ভারতে যান। কয়েক দিন পর এলাকায় ফিরে স্থানীয় আরও কিছু ছাত্র-যুবককে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠান। তাঁরা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসে তাঁর অধীনে গেরিলাযুদ্ধ করেন। নরসিংদী সদর থানা ও এর আশপাশের এলাকায় সংগঠিত আরও অনেক যুদ্ধে তিনি অংশ নেন।

AMARBOI.COM

সিরাজুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম আগ্রপাড়া, ইউনিয়ন দেওকলস, বিশ্বনাথ, সিলেট। বর্তমান ঠিকানা নূরানি সুবিদবাজার, সিলেট। বাবা আলফু মিয়া, মা ছবরুন্নেছা বেগম। স্ত্রী ফাতেমা ফেরদৌস চৌধুরী। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫৪। গেজেটে নাম মিরাজুল ইসলাম।

মাঝরাতে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছেন একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের নেতৃত্বে সিরাজুল ইসলাম। তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বেরিগাঁওয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বাংকার। পূর্বপরিকল্পনামতো নির্দিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ রাত ১২টা এক মিনিটে তাঁরা একযোগে ওই বাংকারে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে সফল হন। গ্রেনেড বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। তাদের আর্তনাদ ও চিৎকারধ্বনি রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের প্রাথমিক ধকল কাটিয়ে উঠে পাকিস্তানি সেনারা বৃষ্টির মতো পাল্টা গুলি শুরু করে। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত ওই এলাকা ছেড়ে নিরাপদ অবস্থানে চলে যান।

সুনামগঞ্জ জেলার উত্তর সীমান্ত ঘেঁষে বালাটের অবস্থান। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের একেবারেই লাগোয়া এলাকা। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল ৫ নম্বর সেক্টরের একটি সাব-সেক্টর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সাব-সেক্টরের বেশির ভাগ যোদ্ধা গণবাহিনী থেকে আসা, অর্থাৎ ছাত্র-যুবক-জনতা। তাঁরা স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মাত্র ২৩৫ জন বাঙালি সেনাসদস্য আর বেশ কিছু মুজাহিদ, পুলিশ ও আনসার। গণবাহিনীর একটি দলের দলনেতা সিরাজুল ইসলাম।

বালাট সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা মূলত 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতেন। কয়েক দিন পর পর হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করে দ্রুত তাঁরা সেখান থেকে সরে পড়তেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল মানসিকভাবে পাকিস্তানি সেনাদের দুর্বল করা। সিরাজুল ইসলাম কয়েকবার তাঁর দল নিয়ে এভাবে সুনামগঞ্জের বেরিগাঁও ও ষোলঘরে অপারেশন চালান।

বেরিগাঁওয়ে পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। বালাট থেকে দীর্ঘ ২৭-২৮ কিলোমিটার হাওর পেরিয়ে সুনামগঞ্জ শহর ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকায় আসার একমাত্র পথ এই বেরিগাঁও। পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা সুনামগঞ্জে অপারেশন চালাতে পারছিলেন না। সে জন্য তাঁরা বারবার এখানে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনাদের বিতাড়নে ব্যর্থ হলেও প্রতিবারই তাদের কিছু না কিছু ক্ষতি করতে তাঁরা সক্ষম হন।

সিরাজুল ইসলাম ১৯৭১ সালে ল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিলের মাঝামাঝি তিনি ভারতে যান। পরে মেঘালয়ের ইকো ওয়ান সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে বালাট সাব-সেক্টরে পাঠানো হয়।

WWW.AMARBOI.COM

সোনা মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম টামটা, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।
বাবা আবদুর রহমান, মা আলিফ জাহান বানু।
স্ত্রী খায়রুন নেছা। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১০৫। মৃত্যু ২০০৩।

সোনা মিয়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে ৩ নম্বর সেক্টর, পরে এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সুবেদার পদে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি দ্বিতীয় বেঙ্গলের একটি ইউনিটের সঙ্গে ভারতে যান। পরবর্তী সময়ে তিনি বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের রামগড়, করেরহাট, সিলেটের তেলিয়াপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শাহবাজপুরসহ আরও কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এস ফোর্সের অধীনে তাঁর ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন এ এস এম নাসিম।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার পূর্ব দিকের শাহবাজপুর ও তার পার্শ্ববর্তী চান্দুরা ছিল সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। আখাউড়ার পতনের পর যৌথ বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগোতে থাকলে শাহবাজপুরে সম্মুখযুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে সোনা মিয়া সাহসিকতা দেখিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৭৮ সালে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ খান, বীর প্রতীক

বিহার রাজ্য, ভারত। বাবা আহমেদ সরদার, মা মজিদন নেছা। দ্বিতীয় স্ত্রী খাইরুন নেছা (প্রথম স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়নি)। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৯৬। গেজেটে নাম সৈয়দ আলী।

কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদী, তার ওপর রেলসেতু। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ থেকে ওই সেতুর ওপর ওত পেতে বসে আছেন সৈয়দ খানসহ একদল বাঙালি প্রতিরোধযোদ্ধা। তাঁরা বসে আছেন শত্রু পাকিস্তানি সেনাদের অপেক্ষায়। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সৈয়দ খান বাঙালি নন, অবাঙালি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এ এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। তারপর সেখানে আরও কয়েকটি দিন কেটে গেল। সময় গড়িয়ে এল ১ এপ্রিল। বেলা ১১টার দিকে একদল পাকিস্তানি সেনাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। এখনো বেশ একটু দূরে তারা। আসছে রংপুরের দিক থেকে। তারা কেউ বুঝতেই পারেনি, সেতুতে কেউ ওত পেতে আছে। তারা প্রতিরোধযোদ্ধাদের গুলির আওতার মধ্যে আসামাত্র একসঙ্গে গর্জে উঠল সব অস্ত্র। পাকিস্তানি সেনাদের সামনে ছিল তাদের এক মেজর এবং এক বাঙালি পুলিশ কর্মকর্তা। তারা প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পেল না। মেজর ও বাঙালি পুলিশ কর্মকর্তাসহ চার-পাঁচজন সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলো। অনেকে হলো আহত। তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। সৈয়দ খানসহ অন্য বাঙালি যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এ দেশে বসবাসকারী অবাঙালিরা (বিহারি) ছিল পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষে। তাদের বেশির ভাগই পাকিস্তানি সেনাদের সক্রিয় সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে। এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে। অবাঙালি কিছু লোক (হাতেগোনা কয়েকজন) বাঙালিদের পক্ষে ছিলেন। সৈয়দ খান তাঁদের মধ্যে একজন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে লড়াই করেছেন। তিনি ইপিআরে ছিলেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন কুড়িগ্রামের চিলমারীতে। কুড়িগ্রাম তখন রংপুর জেলার একটি মহকুমা। চিলমারী বিওপির বাঙালি ইপিআর সদস্যদের সঙ্গে তিনিও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

সৈয়দ খান পরে মুক্তিবাহিনীর একজন যোদ্ধা হিসেবে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম দশদোনা, উপজেলা বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা সড়ক-১৪, সেক্টর-১৪, উত্তরা, ঢাকা। বাবা নান্নু মিয়া সরকার, মা রকিবা খাতুন। স্ত্রী জাহানারা ইসলাম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৮৪।

সৈয়দ রফিকুল ইসলাম চাকরি করতেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দেওয়ায় তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। দেশে ফেরার জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়ে। ১ ফেব্রুয়ারি ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। ১৬ মার্চ ছুটি শেষ হলেও দেশের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেন, চাকরিতে আর যোগ দেবেন না। এর কয়েক দিন পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তিনি যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টর এলাকায়। জুলাই মাসে তিনি তাঁর দলের সঙ্গে ছিলেন নরসিংদীর বেলাবতে। তাঁর দলনেতা ছিলেন সুবেদার আবুল বশর।

১৩ জুলাই সৈয়দ রফিকুল ইসলাম ও তাঁর সঙ্গীরা খবর পান, নরসিংদী থেকে একদল পাকিস্তানি সেনা নদীপথে বেলাব আসছে। দলনেতা আবুল বশরের নেতৃত্বে তাঁরা বানার নদীর পশ্চিম পাড়ে টোক গ্রামের কাছে অ্যামবুশ করেন। তাঁদের কাছে অস্ত্র বলতে ছিল দুটি মেশিনগান, দুটি লাইট মেশিনগান, চারটি স্টেনগান, পাঁচটি রাইফেল, ১৫টি এসএলআর ও একটি রকেট লাঞ্চার। সেনা, ইপিআর ও স্বল্প প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা মিলে তাঁরা ছিলেন মোট ৪০ জন।

রাতভর তাঁরা লঞ্চের অপেক্ষায় বসে থাকেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লঞ্চ রাতে আসেনি। সকালে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা নিরাশ হলেও অবস্থান ত্যাগ করেননি। ওই এলাকায় ছিল কিছু পাকিস্তানি দোসর। তারা মুক্তিবাহিনীর অবস্থান নেওয়ার খবর গোপনে পাকিস্তানি সেনাদের কাছে পৌঁছে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রওনা হয়। সাধারণত লঞ্চযোগে তারা যাতায়াত করত। ১৪ জুলাই তারা লঞ্চ ছাড়াও দেশি নৌকায় করে আসে। লঞ্চ ছিল অনেক পেছনে। দেশি নৌকাগুলো যখন অ্যামবুশ এলাকা পার হচ্ছিল, তখন মুক্তিযোদ্ধারা সন্দেহ করেনি। নৌকাযোগে আসা পাকিস্তানি সেনারা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। একটি ছইওয়ালা নৌকার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় মমতাজ নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা সেই নৌকা থামার নির্দেশ দেন। এর মধ্যে সেখানে লঞ্চও এসে উপস্থিত হয়। পাকিস্তানি সেনারা গুলি শুরু করে। মমতাজ সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হন। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রগুলোও গর্জে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান। তাঁদের আরেকটি বিপর্যয় হয়। রকেট লাঞ্চার বিকল হয়ে যাওয়ায় তাঁরা রকেট ছুড়তে পারেননি। এর পরও বিচলিত না হয়ে তাঁরা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেন। তারপর পশ্চাদপসরণ করেন। সেদিন যুদ্ধে তাঁদের দলনেতা আবুল বশর, সহযোদ্ধা বারিক, সোহরাব হোসেন, নূরুল হক, মমতাজসহ আরও কয়েকজন শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে বিয়ে করেছিলেন। তাঁকে সৈয়দ রফিকুল ইসলামই মুক্তিযুদ্ধে আনেন। নূরুল হকের শহীদ হওয়ার খবর পেয়ে তাঁর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ রেজওয়ান আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম নওয়াজ, লোহাগড়া, নড়াইল। বর্তমান ঠিকানা সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা। বাবা সৈয়দ হাশেম আলী, মা সাজেদা বেগম। স্ত্রী রোকেয়া আক্তার। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৮৯।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি প্রায়ই মনে পড়ে সৈয়দ রেজওয়ান আলীর। বিশেষভাবে মনে পড়ে তাঁর সহযোদ্ধা রইসউদ্দীন (তিনি পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে চাকরি করতেন, ফরিদপুরে বাড়ি) ও আরও দুজন সহযোদ্ধার কথা। একটি সেতু ধ্বংসের অপারেশনে তাঁরা শহীদ হন। তাঁদের লাশ তাঁরা উদ্ধার করতে পারেননি। এই স্মৃতি তাঁকে এখনো তাড়া করে ফেরে। মনে পড়ে বারবার।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের কোনো এক সময়। সঠিক তারিখ সৈয়দ রেজওয়ান আলীর এখন মনে নেই। পাকিস্তানি সেনাদের চলাচল বাধাগ্রস্ত করার জন্য যশোর জেলার অন্তর্গত চুড়ামনকাঠির কাছাকাছি সলুয়া বাজারসংলগ্ন একটি সেতু ধ্বংস করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। তিনি ছিলেন একটি কোম্পানির কমান্ডার। সীমান্ত থেকে ওই সেতু ছিল কিছুটা দূরে। মাঝখানে ছিল কপোতাক্ষ নদ ও খাল-বিল। এক দিন গভীর রাতে অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে তিনি একদল মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে সেখানে সেতু ধ্বংস করতে যান। তাঁর দলে ছিলেন সহযোদ্ধা রইসউদ্দীন ও নাম না-জানা আরও দুজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে সলুয়া বাজারসংলগ্ন সেতুটি ধ্বংস করেন।

সৈয়দ রেজওয়ান আলীর কোম্পানির বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন গেরিলাযোদ্ধা। 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে তাঁরা অপারেশন করতেন। অপারেশন শেষে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতেন নিরাপদ স্থানে। কিন্তু সেদিন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের সাঁড়াশি আক্রমণের মধ্যে পড়ে যান। সলুয়া বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অনেক বাংকার। সেগুলো ছিল বেশ সুরক্ষিত। বেশির ভাগ দৃশ্যমান ছিল না। গোপন বাংকার সম্পর্কে তাঁদের কাছে কোনো তথ্য ছিল না। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে পাকিস্তানি সেনারা তাদের ওই সব বাংকার থেকে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা পাল্টা গুলি করতে করতে ক্রল করে পিছু হটছিলেন। এ সময় রইসউদ্দীন ও তাঁর আরও কয়েকজন সহযোদ্ধা শহীদ এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। সেদিন পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ এতই তীব্র ছিল যে তাঁরা শহীদ সহযোদ্ধাদের সবার লাশ উদ্ধার করতে পারেননি।

সৈয়দ রেজওয়ান আলী যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরের কাশিপুর, ছুটিপুর, চৌগাছা, গরীবপুরসহ বিভিন্ন স্থানে। যুদ্ধ করেন কখনো গেরিলা কায়দায়, কখনো অংশ নেন সম্মুখযুদ্ধে। তিনি সর্বশেষ যুদ্ধ করেন গোপালগঞ্জ জেলার ভাটিয়াপাড়ায়। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলেও ভাটিয়াপাড়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা সেদিন আত্মসমর্পণ করেনি। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে যুদ্ধ চলে।

১৯৭১ সালে সৈয়দ রেজওয়ান আলী ছিলেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর করপোরাল। কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানের পেশোয়ারে। সেখান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হযরত আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম বাউশিয়া, ইউনিয়ন বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
বাবা নজরুল ইসলাম, মা হাসেবান বিবি।
স্ত্রী বেগম নূরজাহান। তাঁদের চার ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৬৬।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ঘটনা কানাইঘাটের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হযরত আলী অংশ নেন। তিনি প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাসদস্য ছিলেন। কানাইঘাট সিলেট জেলার একটি উপজেলা। জৈন্তাপুর-জকিগঞ্জ সংযোগ সড়কে সুরমা নদীর তীরে ছিল উপজেলা সদরের অবস্থান। সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনী—উভয়ের কাছেই কানাইঘাট ছিল সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর কানাইঘাটে যুদ্ধ হয়। এখানে ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানি, পাকিস্তানি স্কাউটস দলের এক প্লাটুন মিলিশিয়া এবং তাদের সহযোগী বেশ কিছু রাজাকার।

২২ নভেম্বর জেড ফোর্সের অধীন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়া মুক্তিবাহিনী কানাইঘাটের সংলগ্ন গৌরীপুরে পৌঁছায়। তখন পাকিস্তানি বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে এগিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘেরাও করে। এরপর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে কয়েক দিন যুদ্ধ চলে। পাকিস্তানি বাহিনী প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। কানাইঘাটের যুদ্ধে হযরত আলী যথেষ্ট সাহস, দক্ষতা ও রণকৌশলের পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ১১ জন শহীদ ও হযরত আলীসহ ২০ জন আহত হন। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষে ৫০ জন নিহত, ২০ জন আহত ও ২৫ জন আত্মসমর্পণ করে। কানাইঘাট মুক্ত হওয়ায় মিত্রবাহিনীর পক্ষে সিলেটের দিকে চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করা সহজ হয়ে ওঠে।

হযরত আলী এর আগে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম, জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার কামালপুরসহ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেছেন। তিনি মূলত মেশিনগান চালাতেন।

হযরত আলী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ৩০ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ বালুচ এবং ২২ এফএফ রেজিমেন্ট তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। তখন তাঁরা প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁরা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে চৌগাছায় সমবেত হন। এরপর ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবিবুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম গাববাড়ী, উজিরপুর, বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা নাসির উদ্দিন রোড, খান সাহেব লেন, দনিয়া, ঢাকা। বাবা আবুল হাসেম হাওলাদার, মা মন্নুজান বেগম। স্ত্রী নূরজাহান বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২২৬।

নলছিটি থানা (বর্তমানে উপজেলা) ঝালকাঠির অন্তর্গত। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধারা সেখানকার থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩ বা ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁরা থানা আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে অংশ নেন হাবিবুর রহমানসহ ৪৫ জন মুক্তিযোদ্ধা। সফল আক্রমণ শেষে তাঁরা ফিরে যান ক্যাম্পে।

এদিকে, থানা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পরদিন ঝালকাঠি থেকে একদল পাকিস্তানি সেনা নলছিটি এসে থানার পার্শ্ববর্তী দেওপাশা ও পরমপাশা গ্রাম দুটি জ্বালিয়ে দেয়। নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালায়। গ্রামবাসীর ওই বিপদের সময় হাবিবুর রহমান নীরব না থেকে তাদের পাশে দাঁড়ান। তাদের রক্ষা করার জন্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে সম্মুখযুদ্ধ শুরু করেন। তাঁরা পরমপাশা স্কুল, তালতলী ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁদের কাছে ভারী অস্ত্র বলতে ছিল একটি এলএমজি। এলএমজিম্যান ছিলেন হাবিবুর রহমান। তিনি তখন 'এলএমজি হাবিব' নামেই খ্যাতি পেয়েছিলেন। তিনি বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ করেন। পাকিস্তানি সেনারা টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায়। হতাহত হয় বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। সেদিন দুজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এ ঘটনা নলছিটিতে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ১৩ বা ১৪ সেপ্টেম্বরে।

হাবিবুর রহমান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন খুলনার ৫ নম্বর ইপিআর উইংয়ের সাপোর্ট প্লাটুনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে যুদ্ধ করেন ৯ নম্বর সেক্টরের টাকি সাব-সেক্টরের অধীনে। রাজাপুর, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ থানা আক্রমণ এবং চাচৈর, গাবখান, বানারীপাড়া যুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। চাচৈর যুদ্ধ ঝালকাঠিতে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য এক যুদ্ধ। নভেম্বরের মাঝামাঝি একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করছিলেন সেখানে। পাকিস্তানি সেনারা বরিশাল ও ঝালকাঠির দিক থেকে সেখানে এসে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায়। ১৪ নভেম্বর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে হাবিবুর রহমান, মানিক, সেকেন্দার আলীসহ কয়েকজন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে শুরু করে। এ সময় খাল পার হতে গিয়ে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। কয়েকজন পালাতে না পেরে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের খুঁজে বের করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবিবুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম শেরপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
বাবা মেহের আলী মণ্ডল, মা রাহেলা বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭৩।
শহীদ ২৬ নভেম্বর ১৯৭১।

পাকিস্তানি সেনারা গুলির আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল হাবিবুর রহমানের অস্ত্র। তাঁর সহযোদ্ধাদের অস্ত্রও একসঙ্গে গর্জে উঠল। আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত পাকিস্তানি সেনারা। তবে দ্রুতই তারা এ অবস্থা কাটিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। শুরু হলো দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ। গোলাগুলিতে পুরো এলাকা তখন প্রকম্পিত। হাবিবুর রহমান লড়াই করে চলেছেন। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের কয়েকটি গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। এ ঘটনা ঘটেছিল শেরপুর গ্রামে ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বরে।

শেরপুর গ্রামটি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার অন্তর্গত। সেপ্টেম্বরের পর মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলে একের পর এক গেরিলা অপারেশন চালাতে থাকেন। অবস্থানগত কারণে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের বিভিন্ন জায়গায় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন অস্থায়ী ক্যাম্প। মুক্তিযোদ্ধারা এসব ক্যাম্পে অবস্থান করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের ওপর প্রায়ই ঝটিকা আক্রমণ চালাতেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ছোট দল শেরপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহল দলের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়।

মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা অ্যামবুশের মধ্যে আসামাত্র মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে গুলি চালাতে শুরু করেন। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা প্রথম হকচকিত হয়ে পড়ে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুবিধাজনক অবস্থান নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। দুই দলের মধ্যে অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলে।

মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন সংখ্যায় কম। উন্নত অস্ত্রশস্ত্রও তেমন ছিল না। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনারা ছিল ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা বেপরোয়াভাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যান। এমন অবস্থায় হাবিবুর রহমানসহ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করছিলেন। একসময় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের তীব্রতা কিছুটা কমে যায়। পরিস্থিতি যখন মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে, ঠিক তখনই হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন হাবিবুর রহমান। পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন তাঁর এক সহযোদ্ধা। পরে গ্রামবাসী তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে সমাহিত করেন। শেরপুর ছিল হাবিবুর রহমানের নিজের গ্রাম।

হাবিবুর রহমান ১৯৭১ সালে দৌলতপুর উপজেলার বাড়াগাংদিয়া হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুনের প্রথম দিকে তিনি ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের শিকারপুর সাব-সেক্টরের অধীনে। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর, মিরপুর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি গেরিলাযুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন-উর রশিদ, বীর প্রতীক

গ্রাম ঘাঘুটিয়া, ইউনিয়ন গাজীরচর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা ৩১১/এ দক্ষিণখান, ঢাকা। বাবা সুলতান ভূঁইয়া, মা উমরিচান বেগম। স্ত্রী হীরাঝিল বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৮।

১৯৭১ সালের ২০ অক্টোবর। মধ্যরাত। গণবাহিনীর দেড় শ মুক্তিযোদ্ধা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছেন। ঘড়ির কাঁটায় রাত সাড়ে তিনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সরারচর রেলস্টেশন ও পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করবেন। মুক্তিযোদ্ধা হারুন-উর রশিদও একটি দলের সঙ্গে রয়েছেন। সরারচরের অবস্থান কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই রেলস্টেশনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পরিকল্পনামতো মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল মাইনের সাহায্যে নিকটবর্তী ঝুমাপুর রেলসেতু ধ্বংস করে দেয়। দ্বিতীয় দলটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সরারচর রেলস্টেশনে অবস্থানরত রাজাকারদের ওপর আক্রমণ করে। তৃতীয় দলটি একই সময়ে আক্রমণ চালায় পার্শ্ববর্তী শিবনাথ স্কুলে অবস্থানরত পাকিস্তানি ৭০ উইং রেঞ্জার্স ফোর্সের ওপর। সে সময় এ বাহিনী সংযুক্ত ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে। যা হোক, মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে সরারচর রেলস্টেশনে দুজন রাজাকার নিহত হয়। অন্যরা আহত অবস্থায় প্যালিয়ে যায়। শিবনাথ স্কুলেও কয়েকজন রাজাকার ও রেঞ্জার্স ফোর্সের একজন নিহত হয়। পরের দিনও সারা রাত মুক্তিযোদ্ধারা শিবনাথ স্কুলে অবস্থানরত পাকিস্তানি রেঞ্জার্স ও রাজাকারদের অবরোধ করে রাখেন। ফলে এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ রাতে পাকিস্তানি রেঞ্জার্স ও রাজাকাররা সরারচর থেকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ছয়জন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন। এখানকার যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা হারুন-উর রশিদ যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহস দেখান।

১৯৭১ সালে হারুন-উর রশিদ টাঙ্গাইলের মির্জাপুরসংলগ্ন গোড়াইয়ে একটি বস্ত্র কারখানায় চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজের এলাকা বাজিতপুরে চলে যান। ভারতের ইকো ওয়ান ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর হাবিলদার মেজবাহ উদ্দিন খানের নেতৃত্বে দেশে আসেন। তাঁর দলনেতা ছিলেন মুজিবুর রহমান মাস্টার। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার ছয়ছটি (ভৈরব উপজেলার অন্তর্গত), কুলিয়ারচর, নরসিংদী জেলার হাঁটুভাঙ্গা, বেলাবসহ আরও কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেন। বেলাব যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুনুর রশিদ, বীর প্রতীক

গ্রাম আঙ্গিয়ারপোতা, সদর, চুয়াডাঙ্গা।
বাবা আহমেদ আলী ওরফে আমোদ আলী।
স্ত্রী সুরাতন নেছা। তাঁদের এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭৫। শহীদ ২৭ নভেম্বর ১৯৭১।

হারুনুর রশিদের দলনেতা খবর পেলেন, তাঁদের এলাকায় একদল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার টহল দিতে এসেছে। দলনেতা তাদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। দ্রুত তাঁরা তৈরি হয়ে অবস্থান নেন বিভিন্ন জায়গায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা চলে এল তাঁদের আওতার মধ্যে। তখন গর্জে উঠল তাঁদের সবার অস্ত্র। পাকিস্তানি সেনারাও তাঁদের পাল্টা আক্রমণ করল। পাল্টাপাল্টি আক্রমণ চলতে থাকল। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকাররা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। সে তুলনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা খুবই কম। তার পরও হারুনুর রশিদসহ কয়েকজন সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। একপর্যায়ে হারুনুর রশিদ গুলি করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকেন সামনের দিকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলেন না। ক্রল করে এগিয়ে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে দেখে ফেলে। তখন তারা গুলি ছুড়তে শুরু করে। হারুনুর রশিদ গুলিবিদ্ধ হন। সহযোদ্ধারা চেষ্টা করলেন তাঁকে সরিয়ে নিতে। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। শত্রুর গুলির মধ্যে তাঁরা নড়াচড়াও করতে পারলেন না। যুদ্ধ শেষে যখন যেতে পারলেন, তখন হারুনুর রশিদের জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বরের। ঘটেছিল চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানার বেগমগঞ্জে। তখন মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। এ সময় সীমান্ত অতিক্রম করে হারুনুর রশিদসহ একদল গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন জীবননগরে। সেদিন সকালে হারুনুর রশিদের দলনেতা খবর পান, পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকাররা বেগমগঞ্জে টহল দিতে আসবে। তখন তাঁরা বেগমগঞ্জের কাছাকাছিই ছিলেন। খবর পেয়ে হারুনুর রশিদের দলনেতা পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের সংখ্যা ছিল তাঁদের প্রায় দ্বিগুণ। তার পরও মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি সেনারা প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। বিশেষত হারুনুর রশিদসহ কয়েকজন বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁদের বীরত্ব ও রণকৌশলে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়।

হারুনুর রশিদ ১৯৭১ সালে ছিলেন ২৫ বছর বয়সী যুবক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৫ এপ্রিল ভারতে চলে যান। সেখানে ডোমপুকুর ও বাঙালজি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিবাহিনীর ৮ নম্বর সেক্টরের বানপুর সাব-সেক্টরের অধীনে তিনি যুদ্ধ করেন। সীমান্ত এলাকায় কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। পরে একটি দলের সঙ্গে তাঁকে দেশের ভেতরে পাঠানো হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারেছ উদ্দীন সরকার, বীর প্রতীক

গ্রাম বদলী বাথান, মিঠাপুকুর, রংপুর।
বাবা সেরাজ উদ্দীন সরকার, মা ওলিমননেছা।
স্ত্রী হাবিবা ফেরদৌসী। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬১। মৃত্যু ২০০৪।

রাতের অন্ধকারে সীমান্ত এলাকা থেকে জিপে করে বাংলাদেশের ভেতরে এলেন হারেছ উদ্দীন সরকার, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বীর বিক্রম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল), নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, আফজাল হোসেন, শওকত আলীসহ ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা। গাড়ির হেডলাইট নেভানো। পথে আছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরা। সেই প্রখর প্রহরা ফাঁকি দিয়ে তাঁরা পৌঁছালেন লক্ষ্যস্থল বড়খাতা তিস্তা রেলসেতুর অদূরে। সেখান থেকে রেলসেতুর দূরত্ব দুই মাইল। তাঁদের সঙ্গে আছে বিস্ফোরক, ডেটোনেটর এবং একটি হালকা মেশিনগান ও তিনটি সাবমেশিন কারবাইন বা স্টেনগান; আর মাত্র একটি তিন ইঞ্চি মর্টার। তাঁরা তিস্তা রেলসেতু ধ্বংস করবেন। এর আগে তিনবার এ অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এবার তাঁদের সফল হতেই হবে। সেদিন পরিস্থিতি তাঁদের কিছুটা সহায় হলো। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। এ সুযোগে তাঁরা সেতুতে বিস্ফোরক স্থাপন করলেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ করে ডেটোনেটরে আগুন লাগিয়ে দূরে অবস্থান নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে উঠল। মনে হলো, আকাশ ভেঙে একের পর এক বজ্রপাত পড়ছে বড়খাতার তিস্তা সেতুর ওপর। একই সময় পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে গর্জে উঠল তাঁদের অস্ত্র। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১২ আগস্টের।

AMARBOI.COM

বড়খাতা লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার অন্তর্গত। পাটগ্রাম থেকে রেল ও সড়কপথ বড়খাতা হয়ে জেলা সদরে এসেছে। বড়খাতায় আছে রেলসেতু। ১৯৭১ সালে সীমান্ত এলাকায় চলাচলের জন্য ওই রেলসেতু বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সেতু রক্ষার জন্য সেখানে নিয়োজিত ছিল এক কোম্পানি পাকিস্তানি সেনা। তাদের চলাচল ব্যাহত করতে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকবার তিস্তা রেলসেতু ধ্বংস করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। প্রতিবারই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন।

একের পর এক অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর ৬ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক পাটগ্রাম সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ও কোম্পানি কমান্ডার হারেছ উদ্দীন সরকারকে ডেকে অবিলম্বে সেখানে সফল অভিযান পরিচালনার জন্য বলেন। তাঁর নির্দেশে তাঁরা আগের অভিযানগুলোর ব্যর্থতা ও ভুলত্রুটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বড়খাতার তিস্তা রেলসেতু ধ্বংসের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

হারেছ উদ্দীন সরকার ১৯৭১ সালে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের পাটগ্রাম সাব-সেক্টরের অধীনে। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশ নেন।

স্বাধীনতার পর তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসানউদ্দিন আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম চর কুশাই, ইউনিয়ন কসুমহাটি, দোহার, ঢাকা। বাবা মেছের উদ্দিন, মা মঙ্গলজান বিবি। স্ত্রী রওশন আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৩।

সাতক্ষীরা জেলা সদর থেকে ১৫-১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভোমরা। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ছাত্র, যুবক ও ইপিআরের সমন্বয়ে গড়া একদল প্রতিরোধযোদ্ধা অবস্থান নেন এখানে। হাসানউদ্দিন আহমেদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ইপিআর সদস্য। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে একদল পাকিস্তানি সেনা তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করে। এ আক্রমণ আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। হাসানউদ্দিন আহমেদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকেন। তাঁরা রাস্তার আড়ালে বা পরিখায় ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে গুলির মধ্যেই তারা ক্রল করে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের কাছে চলে আসে। প্রথম দুই ঘণ্টার যুদ্ধ পাকিস্তানি সেনাদের অনুকূলে থাকে। এ সময় হাসানউদ্দিনসহ ইপিআরের কয়েকজন যথেষ্ট রণকৌশল ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁদের বীরত্বে বেশ কজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। তখন পাকিস্তানি সেনারা পিছিয়ে যেতে থাকে এবং একপর্যায়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। হাসানউদ্দিনের মুক্তিযোদ্ধা জীবনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে এটিই ছিল প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধ।

মে মাসের শেষের দিকে এক দিন ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবার ভোমরায় মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করে। সেদিন হাসানউদ্দিন বাঁধের আড়ালে একটি প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন। তাঁদের দলের কাছে ছিল একটি মেশিনগান। এর গানার ছিলেন তাঁর সহযোদ্ধা আতাউর রহমান। তিনি সেটি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হন। মেশিনগানের অবিরাম গুলিবর্ষণে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রাভিযান বারবার বাধাগ্রস্ত হয়। তখন পাকিস্তানি সেনারা মেশিনগান ধ্বংস করতে আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করে। হাসানউদ্দিন আহমেদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা বারবার অবস্থান বদল করে পাকিস্তানি সেনাদের ধোঁকা দেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ও মেশিনগানের অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে বহু পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। থেমে থেমে সেদিন ১৪-১৫ ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণের পরও তাঁরা তাঁদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন।

হাসানউদ্দিন আহমেদ ১৯৭১ সালে যশোর জেলার বেনাপোল সীমান্তে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা প্রতিরোধযুদ্ধে যোগ দেন। পরে ভোমরা সীমান্তে অবস্থান নেন। ভোমরা প্রতিরক্ষা অবস্থানের পতন হলে তাঁরা ভারতে চলে যান। সেখানে থাকার সময় তাঁদের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি পরে সিলেটের ধলই বিওপি (২৮ অক্টোবর) ও কানাইঘাট (২২ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর) আক্রমণে অংশ নেন।

১৯৮৪ সালে বিডিআরের চাকরি থেকে তিনি অবসর নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন আলী তালুকদার, বীর প্রতীক

গ্রাম চর দশসিকা, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।
বাবা সাবেরউদ্দীন তালুকদার, মা সাকেরা খাতুন।
স্ত্রী সুফিয়া বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭৮।

ডিসেম্বর মাসের কনকনে শীতের মধ্যে সিলেটের দিকে এগিয়ে চলেছেন হোসেন আলী তালুকদারসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য। কদিন ধরে প্রায় না খেয়ে আছেন। শীতবস্ত্রও তেমন নেই। তার পরও তাঁদের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁরা বুঝতে পারছেন, চূড়ান্ত বিজয় খুব কাছে। বিপুল উৎসাহে তিন দিন একটানা হেঁটে খাল-বিল-জলাভূমি অতিক্রম করে ১৪ ডিসেম্বর পৌঁছে গেলেন সিলেট এমসি কলেজ এলাকায়। পথে বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েকটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। সেগুলো তাঁরা এড়িয়ে গেলেন। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজে আছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত একটি ঘাঁটি। হোসেন আলী তালুকদার ও তাঁর সহযোদ্ধারা অবস্থান নিলেন ৫০০ গজ দূরে টিলার ওপরে। পাকিস্তানি সেনাদের নাকের ডগায় পরিখা খুঁড়ে তাঁরা অবস্থান নিতে থাকেন। এমসি কলেজের পাঁচ মাইল পেছনে খাদিমনগরে তখনো যুদ্ধ চলছে।

হোসেন আলী তালুকদার ও তাঁর সহযোদ্ধাদের পোশাক, হেলমেট ও অস্ত্রশস্ত্র দেখতে একদম পাকিস্তানি সেনাদের মতো। পাকিস্তানি সেনারা ভাবতেই পারেনি, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানি সেনারা চিৎকার করে কয়েকবার তাঁদের পরিচয় জানতে চেয়েছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা জবাব না দিয়ে চুপচাপ টিলার ওপর পরিখা খুঁড়তে থাকেন। এ সময় সেখানে মুক্তিবাহিনীর ডি কোম্পানির অবস্থানের সামনে এসে হাজির হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি আর্টিলারি গানবাহী গাড়ি ও দুটি জিপ। মুক্তিযোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে গোলাবর্ষণ করলেন। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল কামানবাহী গাড়ি ও জিপে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাকিস্তানি সেনারা দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। সে সুযোগে হোসেন আলী তালুকদার ও তাঁর সহযোদ্ধারা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে গুলি শুরু করলেন। তাঁদের গুলিতে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা রাস্তার ওপরই হতাহত হলো। পাকিস্তানি সেনাদের তখন বোধোদয় হয়েছে। দ্রুত তারা সর্বশক্তি দিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধারাও তা মোকাবিলা করতে থাকেন। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল শহরের ভেতরে মূল ঘাঁটিতে। সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শতাধিক নিহত ও ২৫-৩০ জন আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর ২০ জন শহীদ ও ২২-২৩ জন আহত হন।

হোসেন আলী তালুকদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তাঁদের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ২৯ মার্চ তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলে সেনানিবাস থেকে পালিয়ে ভারত সীমান্তে অবস্থান নেন। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিছুদিন খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর ভারতে যান। সেখানে পুনর্গঠন ও নতুন করে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তাঁদের জেড ব্রিগেডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৩১ জুলাই জামালপুর জেলার কামালপুরে প্রথম তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন। কামালপুর যুদ্ধে তাঁদের দলের মেশিনগান থেকে হঠাৎ গুলি ছোড়া বন্ধ হয়ে যায়। সেটি ছিল সামনে। অধিনায়কের নির্দেশে দুজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই মেশিনগান উদ্ধারে যান। তখন তাঁর দুই সহযোদ্ধার একজন শহীদ ও একজন আহত হন। কিন্তু তিনি মনোবল হারাননি। প্রচণ্ড গুলির মধ্যে ক্রল করে মেশিনগানের অবস্থানে গিয়ে তা উদ্ধার করে আনেন। হোসেন আলী তালুকদার সিলেটের কানাইঘাটসহ আরও কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকেতের ব্যাখ্যা

ইপিআর—ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)। বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

ইপিকাপ—ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স (EPCAF)। এ বাহিনীকে ইপিসিএএফ বলেও অভিহিত করা হতো।

একেএফ—আজাদ কাশ্মীর ফোর্স। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন।

এফইউপি—ফর্মি আপ প্লেস। আক্রমণ শুরু করার আগে যে স্থানে যোদ্ধারা সমবেত হন।

এফএফ—ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন।

ওপি—অবজারভেশন পোস্ট বা পাহারা চৌকি।

বিওপি—বর্ডার আউট পোস্ট বা সীমান্ত চৌকি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এইচ আওয়ার—চূড়ান্ত আক্রমণের সময়।

এস ফোর্স—নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। দ্বিতীয় ও একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল এস ফোর্সের অধীনে।

কাদেরিয়া বাহিনী—আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম ও আনোয়ারুল আলম শহীদ যৌথভাবে টাঙ্গাইল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। এটিই কাদেরিয়া বাহিনী নামে পরিচিত।

কিলো ফোর্স—কে ফোর্সের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ আহত হওয়ায় এর কাঠামোতে পরিবর্তন এনে কিলো ফোর্স নামে নতুন একটি বাহিনী গঠন করা হয়।

কিলো ফ্লাইট—মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর একটি বিমান উইং গঠন করা হয়। এর সাংকেতিক নাম ছিল কিলো ফ্লাইট।

কে ফোর্স—নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। কে ফোর্সের অধীনে ছিল চতুর্থ, নবম ও দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

জেড ফোর্স—নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। জেড ফোর্সের অধীনে ছিল নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

টসি ব্যাটালিয়ন—মুজাহিদ বাহিনীর অনুরূপ আধা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী।

ডিফেন্স—প্রতিরক্ষা অবস্থান।

তোচি স্কাউটস ও থাল স্কাউটস—পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী আধা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুটো আলাদা দল। মুক্তিযুদ্ধকালে এ দুই বাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আনা হয়।

প্রিএইচ আওয়ার—চূড়ান্ত আক্রমণের আগের সময়।

মুজাহিদ বাহিনী—১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তান সরকার এই অনিয়মিত বাহিনী গঠন করে। এ বাহিনী বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার যুবকদের নিয়ে গঠিত হয়। আধা সামরিক বাহিনীর মতো প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সেনা ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুজাহিদ বাহিনীর দলনেতাদের অনারারি ক্যাপ্টেন বলা হতো।

মুজিব ব্যাটারি—মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দল। এটি ছিল কে ফোর্সের অধীনে।

রওশন আরা ব্যাটারি—মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দল। এটি ছিল জেড ফোর্সের অধীনে।

লিসনিং পোস্ট—রণাঙ্গনে মূল ঘাঁটির অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র।

সেক্টর—মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুদ্ধ-তৎপরতা চালানোর সুবিধার্থে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সারা দেশকে ১১টি অঞ্চলে ভাগ করে। এ রকম প্রতিটি অঞ্চলকে সেক্টর বলা হতো। প্রতিটি সেক্টরের অধীনে সাব-সেক্টর, নিয়মিত সেনা ও গেরিলাযোদ্ধা এবং সেক্টর কমান্ডারদের নিয়োগ করা হয়।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জি

অপারেশন গোয়াইনঘাট, লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

অপারেশন রাধানগর, লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই, প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব, ঢাকা, অপরাজেয় সংঘ, ১৯৮৮।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, ঢাকা, অপরাজেয় সংঘ, ১৯৮৯।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর (দ্বিতীয় সংস্করণ), কর্নেল (অব.) সাফায়াত জামিল বীর বিক্রম, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০।

একাত্তরের যুদ্ধে বিমানবাহিনী, শ জামান, মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা, ২০১১।

কিংবদন্তীর মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার আবদুল ওয়াহাব (দ্বিতীয় সংস্করণ), লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০।

জীবনের যুদ্ধ যুদ্ধের জীবন, কর্নেল নূরুন্নবী খান, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

নরসিংদী জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনা সদর, শিক্ষা পরিদপ্তর।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : নারী প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ, ঢাকা, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৭।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র, নবম ও দশম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৪।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, ব্রিগেডভিত্তিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ২০০৬।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর ১-১১, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ২০০৬।

মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টর, বালিয়াডাঙ্গা যুদ্ধ, কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ বীর প্রতীক, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৬।

মুক্তিযুদ্ধে গাজীপুর, বিলু কবীর, স্মৃতিধারা, ঢাকা, ২০০৯।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ, মেজর জেনারেল (অব.) কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯।

মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী, সুকুমার বিশ্বাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

স্বাধীনতাযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, প্রথম খণ্ড, মো. আবদুল হান্নান, পূর্বা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪।

স্বাধীনতাযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, দ্বিতীয় খণ্ড, মো. আবদুল হান্নান, পূর্বা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সীতাকুণ্ড অঞ্চল।

পত্রিকা

দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ১৯৭২

মাসিক *সুরমা*, সিলেট

পোস্টার

নিতুন কুন্ডু, 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' (১৯৭১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা

তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি ও ছবি দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন

১. নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা, *প্রথম আলো*

আকমল হোসেন, মৌলভীবাজার
আজহারুল হক, নবাবগঞ্জ (ঢাকা)
আবদুর রব, লালমনিরহাট
আবদুল কুদ্দুস, কক্সবাজার
আবু তাহের, ফেনী
আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী
আমিনুল হক, ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা)
আয়শা সিদ্দিকা, শিবচর (মাদারীপুর)
আরিফুল হক, রংপুর
আল রাহমান, চট্টগ্রাম
আলম পলাশ, চাঁদপুর
আসাদুল ইসলাম, জয়পুরহাট
আসাদুল্লাহ সরকার, দিনাজপুর
আহাদ হায়দার, বাগেরহাট
ইকবাল গফুর, সখীপুর (টাঙ্গাইল)
উজ্জ্বল মেহেদী, সিলেট
এনামুল হক, সিরাজগঞ্জ
এ বি এম আতিকুর রহমান, দেবীদ্বার (কুমিল্লা)
এম এ কুদ্দুস, চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা)
এম জে আলম, লক্ষ্মীপুর
এম মনিরুল ইসলাম, বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
কল্যাণ প্রসূন, জুড়ী (মৌলভীবাজার)
কাজী আবদুল্লাহ, খুলনা অফিস
কামনাশীষ শেখর, টাঙ্গাইল
খলিল রহমান, সুনামগঞ্জ
খায়রুল আলম, কালকিনি (মাদারীপুর)
গাজীউল হক, কুমিল্লা
গৌরাঙ্গ দেবনাথ, নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
জামাল মো. আবু নাছের, মাধবপুর (হবিগঞ্জ)
জুয়েল খান, ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট)
তানভীর হাসান, গোপালগঞ্জ
তুহিন আরণ্য, মেহেরপুর
দিলীপ কুমার সাহা, নিকলী
দুলাল ঘোষ, আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
নেয়ামতউল্যাহ, ভোলা
পান্না বালা, ফরিদপুর
বদর উদ্দিন, সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
বিশ্বজ্যোতি চৌধুরী, শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার)
বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, বান্দরবান
মনিরুল ইসলাম, যশোর
মহিউদ্দিন আহমেদ, গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ)
মারুফ সামদানী, লোহাগড়া (নড়াইল)
মাহবুবুর রহমান, নোয়াখালী
মীর মোহাম্মদ আসলাম, রাউজান (চট্টগ্রাম)
মুজিবুর রহমান, লাকসাম (কুমিল্লা)
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, হাটহাজারী (চট্টগ্রাম)
মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম)
মো. কামরুজ্জামান, ময়মনসিংহ
মো. কামাল হোসেন, ঘাটাইল (টাঙ্গাইল)
মো. গোলাম মোস্তফা, পূর্বধলা (নেত্রকোনা)
মো. জসিম মাহমুদ, চাটখিল (নোয়াখালী)
মো. মোক্তার হোসেন, নাটোর
মোস্তফা মনজু, জামালপুর
লিটন কুমার চৌধুরী, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম)
সাহাবুল শাহীন, গাইবান্ধা
সফি খান, কুড়িগ্রাম
সাইফুর রহমান, বরিশাল
সাইফুল হক মোল্লা, কিশোরগঞ্জ
সুব্রত সাহা, গোপালগঞ্জ
সুমনকুমার দাশ, সিলেট
সুমন মোল্লা, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
সোহরাব হোসেন, কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

২. সদস্য : মুক্ত আসর, ঢাকা

আবু সাঈদ
আসাদুজ্জামান
ওমর ফারুক
কাজী নাসরিন সিদ্দিকা
তাসনুভা জাহান
নাশিদ মুস্তারী
মহিউদ্দীন শেখ
মামুন মোরশেদ
মুন্সি আবদুল কাদের
সিরাজ উদ্দিন
স্বর্ণময়ী সরকার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. যাঁরা ছবি দিয়েছেন

আনিস মাহমুদ
কৌশিক চাকমা
দিয়াব মাহমুদ
নাশিদ মুস্তারী
মহিউদ্দীন শেখ
রাশেদ মাহমুদ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

৪. অন্যান্য

আবদুল ওয়াহাব (শহীদ নোয়াব মিয়া বীর প্রতীকের বড় ভাই)
আবদুল মান্নান
আরিফুর রহমান (মো. আমানউল্লাহ বীর বিক্রমের নাতি)
এ এম আলমগীর (শহীদ খুররমের বড় ভাই)
কেয়া চৌধুরী, সদস্যসচিব, চেতনায় '৭১ হবিগঞ্জ
খালেকুজ্জামান খান (শহীদ মনিরুজ্জামান বীর বিক্রমের ছেলে, টাঙ্গাইল)
জহুরুল কাইয়ুম (গাইবান্ধা)
জাফরউল্লাহ ভূঁইয়া (শহীদ সহিদউল্লাহ বীর বিক্রমের ছেলে, নোয়াখালী)
জালাল আহমেদ (শহীদ আবদুল বাসেতের ভাই)
জাহাঙ্গীর করিম
জাহানারা আক্তার (আফজাল মিয়া বীর উত্তমের মেয়ে)
জাহিদ রহমান, প্রধান নির্বাহী, মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা গবেষণাকেন্দ্র
নিরুপমা খান (টাঙ্গাইল)
নীলুফার হুদা (খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রমের স্ত্রী)
নূরে আলম আকন্দ (আনিসুল হক বীর প্রতীকের ছেলে)
ফখরুল ইসলাম (নোয়াখালী), লেখক-গবেষক
ফজলুর রহমান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
ফরিদ হোসেন
ফেরদৌসী হ্যাপি (হারেছ উদ্দীন বীর প্রতীকের মেয়ে)
বিলকিস রহমান (শহীদ রেজাউল করিম মানিকের বোন)
মকবুল আহমদ (আবদুল জব্বার মিজি বীর প্রতীকের ছেলে)
মেজর (অব.) ওয়াকার হাসান বীর প্রতীক
মেজর জেনারেল (অব.) আমীন আহম্মেদ চৌধুরী বীর বিক্রম
মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক
মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল কাদির (গাইবান্ধা)
মো. আবদুস সামাদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
মোজাম্মেল হক (আফতাবুল কাদেরের সহপাঠী)
লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম
সাইফুল আলম, প্রভাষক, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ
সেহেলী চৌধুরী (ইয়ামীন চৌধুরী বীর বিক্রমের স্ত্রী)
হারুন হাবীব (সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা)
হাসান নাসির
হীরা পারভেজ (পরিচালক, আনসার-ভিডিপি)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~